

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ



সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেন্দ	: ভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচেন্দ	: বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেন্দ	: ধ্বনিতত্ত্ব	১৩
দ্বিতীয় পরিচেন্দ	: ধ্বনির পরিবর্তন	২৭
তৃতীয় পরিচেন্দ	: গ-ত্ত ও ষ-ত্ত বিধান	৩১
চতুর্থ পরিচেন্দ	: সঙ্গি	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়		
প্রথম পরিচেন্দ	: পুরুষ ও জীবাচক শব্দ	৪৫
দ্বিতীয় পরিচেন্দ	: দ্বিবৃক্ত শব্দ	৪৯
তৃতীয় পরিচেন্দ	: সংখ্যাবাচক শব্দ	৫৩
চতুর্থ পরিচেন্দ	: বচন	৫৬
পঞ্চম পরিচেন্দ	: পদান্তিত নির্দেশক	৫৯
ষষ্ঠ পরিচেন্দ	: সমাস	৬১
সপ্তম পরিচেন্দ	: উপসর্গ	৭২
অষ্টম পরিচেন্দ	: ধ্বনি	৭৯
নবম পরিচেন্দ	: কৃ-প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা	৮৩
দশম পরিচেন্দ	: তাঙ্কিত প্রত্যয়	৮৮
একাদশ পরিচেন্দ	: শব্দের শ্রেণিবিভাগ	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়		
প্রথম পরিচেন্দ	: পদ-প্রকরণ	৯৭
দ্বিতীয় পরিচেন্দ	: তিল্যাপদ	১১২
তৃতীয় পরিচেন্দ	: কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	১১৯
চতুর্থ পরিচেন্দ	: সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক তিল্যার প্রয়োগ	১২৫
পঞ্চম পরিচেন্দ	: বাংলা অনুজ্ঞা	১৩২
ষষ্ঠ পরিচেন্দ	: তিল্যা-বিভক্তি : সাধু ও চলিত	১৩৬
সপ্তম পরিচেন্দ	: কারক ও বিভক্তি এবং সংবক্ষ পদ ও সংস্থোধন পদ	১৪৭
অষ্টম পরিচেন্দ	: অনুসর্গ বা কর্মপ্রচলনীয় শব্দ	১৫৯
পঞ্চম অধ্যায়		
প্রথম পরিচেন্দ	: বাক্য প্রকরণ	১৬৩
দ্বিতীয় পরিচেন্দ	: শব্দের যোগ্যতার বিকাশ ও বাগধারা	১৭৭
তৃতীয় পরিচেন্দ	: বাচ এবং বাচ পরিবর্তন	১৯৫
চতুর্থ পরিচেন্দ	: উঙ্গি পরিবর্তন	১৯৯
পঞ্চম পরিচেন্দ	: যতি বা ছেদ-চিহ্নের লিখন কৌশল	২০৩
ষষ্ঠ পরিচেন্দ	: বাক্যের শ্রেণিবিভাগ	২০৮
সপ্তম পরিচেন্দ	: বাক্যে পদ-সংস্থাপনার তত্ত্ব	২১২

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাষা

ভাষার সংজ্ঞা

মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার জন্য কর্তৃধনি এবং হাত, পা, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইঞ্জিন করে থাকে। কর্তৃধনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি পরিমাণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, ইঙ্গিতের সাহায্যে ততটা পারে না। আর কর্তৃধনির সহায়তায় মানুষ মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবও প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। কর্তৃধনি বলতে মুখগহর, কষ্ট, নাক ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধ্বনিই ভাষার মূল উপাদান। এই ধ্বনির সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগ্যস্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কষ্ট, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদি বাক্ত প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগ্যস্ত্র। এই বাগ্যস্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

সকল মানুষের ভাষাই বাগ্যস্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি। তবুও একই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ হতে পারে। এ কারণে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আলাদা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের কঠিনিঃসৃত বাক্ত সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলা হয়। অর্থাৎ বাগ্যস্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা।

দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বক্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। সে ভাষাও আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে এসেছে। ফলে, এ শতকে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে, হাজার বছর আগেকার মানুষের ভাষা ঠিক এমনটি ছিল না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে বাংলা একটি ভাষা। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরাখণ্ড ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা বাংলা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের মুখের ভাষা বাংলা।

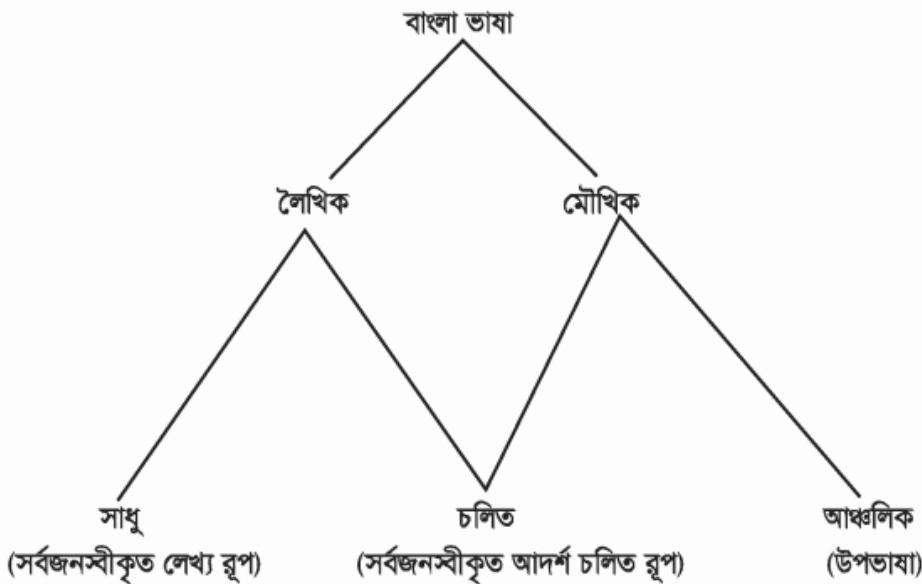
বাংলা ভাষারীতি

কথ্য, চলিত ও সাধু রীতি

বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্ষেত্রে অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে। এগুলো আঞ্চলিক কথ্য ভাষা বা উপভাষা। পৃথিবীর সব ভাষায়ই উপভাষা আছে। এক অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার সঙ্গে অপর অঞ্চলের জনগণের মুখের ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এমন হয় যে, এক অঞ্চলের ভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণের কথ্য ভাষা দিনাজপুর বা রংপুরের লোকের পক্ষে খুব সহজবোধ্য নয়। এ ধরনের আঞ্চলিক ভাষাকে বলার ও লেখার ভাষা হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া সুবিধাজনক নয়। কারণ, তাতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানে অন্তরায় দেখা দিতে পারে। সে কারণে, দেশের শিক্ষিত ও পঞ্জিতসমাজ একটি আদর্শ ভাষা ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণ এ আদর্শ ভাষাতেই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে থাকেন। বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষার কথ্য রীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত এই ভাষাই আদর্শ চলিত ভাষা।

বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। ভাষার মৌখিক রূপের আবার রয়েছে একাধিক রীতি : একটি চলিত কথ্য রীতি অপরটি আঞ্চলিক কথ্য রীতি। বাংলা ভাষার লৈখিক বা লেখ্য রূপেরও রয়েছে দুটি রীতি : একটি চলিত রীতি অপরটি সাধু রীতি।

বাংলা ভাষার এ প্রকারভেদ বা রীতিভেদ এভাবে দেখানো যায়



সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

১. সাধু রীতি

- (ক) বাল্লা লেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- (খ) এ রীতি গুরুগঙ্গার ও তৎসম শব্দবহুল।
- (গ) সাধু রীতি নাটকের সংজ্ঞাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।
- (ঘ) এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।

২. চলিত রীতি

- (ক) চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। একশ বছর আগে যে চলিত রীতি সে যুগের শিষ্ট ও ভদ্রজনের কথিত ভাষা বা মুখের বুলি হিসেবে প্রচলিত ছিল, কালের প্রবাহে বর্তমানে তা অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে।
- (খ) এ রীতি তত্ত্ব শব্দবহুল।
- (গ) চলিত রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এবং বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্যসংগ্রামের জন্য বেশি উপযোগী।
- (ঘ) সাধু রীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে। বহু বিশেষ্য ও বিশেষণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে।

৩. আঞ্চলিক কথ্য রীতি

সব ভাষারই আঞ্চলিক রূপের বৈচিত্র্য থাকে, বাল্লা ভাষারও তা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত রীতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; আবার কোথাও কোথাও কারো কারো উচ্চারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু, চলিত ও কথ্য রীতির উদাহরণ

ক. সাধু রীতি

পরদিন প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের প্রস্তুত সিস্ট অনুসারে যে তিনজন শিক্ষক সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহারা আটটার পুর্বেই ডাক-বাল্লায় উপস্থিত হইলেন। একটু পরে আবদুল্লাহ আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া একজন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন— আপনি যে? আপনার নাম তো হেডমাস্টার লিস্টে দেন নাই।

—কাজী ইমদাদুল হক

খ. চলিত রীতি

পুল পেরিয়ে সামনে একটা বাঁশ বাগান পড়ল। তারি মধ্য দিয়ে রাস্তা। মচমচ করে শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ডেঙে যেতে লাগল। পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ। সমস্ত ঝোপটার মাথাজুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে রয়েছে।

—বিভূতিভূষণ বন্দেয়াপাখ্যায়

ওপরের ‘ক’ ও ‘খ’ অনুচ্ছেদ দুটির ভাষার উপাদানে সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য নিচে দেখানো হলো—

পদ	সাধু	চলিত
বিশেষ্য	মস্তক	মাথা
বিশেষ্য	জুতা	জুতো
বিশেষ্য	তুলা	তুলো
বিশেষণ	শুষ্ক/শুকনা	শুকনো
বিশেষণ	বন্য	বুনো
সর্বনাম	তাঁহারা/উহারা	তাঁরা/উকে
সর্বনাম	তাহাকে/উহাকে	তাকে/ওকে
সর্বনাম	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ক্রিয়া	করিবার	করবার/করার
ক্রিয়া	পাইয়াছিলেন	পেয়েছিলেন
ক্রিয়া	হইলেন	হলেন
ক্রিয়া	আসিয়া	এসে
ক্রিয়া	হইল	হল/হলো
ক্রিয়া	দেখিয়া	দেখে
ক্রিয়া	করিলেন	করলেন
ক্রিয়া	দেন নাই	দেলনি
ক্রিয়া	পার হইয়া	পেরিয়ে
ক্রিয়া	পাঢ়িল	পড়ুল/পড়লো
ক্রিয়া	করিয়া	করে
ক্রিয়া	ভাঙ্গিয়া যাইতে সাগিল	ভেঙ্গে যেতে সাগল
ক্রিয়া	ফুটিয়া রাখিয়াছে	ফুটে রাখেছে
অব্যয়	পূর্বেই	আগেই
অব্যয়	সহিত	সঙ্গে/সাথে।

বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডার

বাংলা ভাষা গোড়াগতনের যুগে এবং সংখ্যক শব্দ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও নানা ভাষার সংস্পর্শে এসে এর শব্দ-সম্পর্ক বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে তুর্কি আগমন ও মুসলিম শাসন প্রভাবের সুযোগে ক্রমে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরপর এলো ইংরেজ। ইংরেজ শাসনামলেও তাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। বাংলা ভাষা এই সব ভাষার শব্দগুলোকে আপন করে নিয়েছে। এভাবে বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্পর্কের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পক্ষিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন –

১. তৎসম শব্দ

২. তৎব শব্দ

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব্দ

১. তৎসম শব্দ : যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+ সম (সমান)]=তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত। উদাহরণ : চন্দ্ৰ, সূর্য, নক্ষত্ৰ, ভৱন, ধৰ্ম, পাত্ৰ, অনুযায় ইত্যাদি।

২. তৎব শব্দ : যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎব শব্দ। তৎব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, ‘তৎ’ (তার) থেকে ‘ভব’ (উৎপন্ন)। যেমন – সংস্কৃত-হস্ত, প্রাকৃত-হথ, তৎব-হাত। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চম্পার, তৎব-চামার ইত্যাদি। এই তৎব শব্দগুলোকে খীটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত। উদাহরণ : জ্যোত্স্না, ছেৱান্দ, গিন্নী, বোক্তম, কুচ্ছিত- এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত জ্যোত্স্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, বৈষ্ণব, কুৎসিত শব্দ থেকে আগত।

৪. দেশি শব্দ : বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুংডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রাখিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হিসেব মেলে। যেমন-কুড়ি (বিশ)-কোলভাষা, পেট (উদর)-তামিল ভাষা, চুলা (উনুন)-মুংডারী ভাষা। এরূপ-কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপুর, ডাব, ডাগুর, টেকি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বিদেশি শব্দ : রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি- এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ : বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহানাম, তওবা, তসবি, জ্ঞাকাত, হজ, হাদিস, হারাম, হালাল ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাম্রাজ্যিক শব্দ : আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, বাকি, মহকুমা, মুস্কেফ, মোক্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ : বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

- (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ : খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।
- (২) প্রশাসনিক ও সাম্রাজ্যিক শব্দ : কারখানা, চশমা, জবানবণ্ডি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বাল্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।
- (৩) বিবিধ শব্দ : আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিল্দা, নমুনা, বদমাশ, রফতানি, হাঙ্গামা ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দ : ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়—

- (১) অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে : ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নডেল, নোট, পাউডার, পেপিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।
- (২) পরিবর্তিত উচ্চারণে : অফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইংরেজীয় ভাষার শব্দ

- (১) গৰ্জুগিজ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাত্রি, বালতি ইত্যাদি।
- (২) ফরাসি : কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেসেতারো ইত্যাদি।
- (৩) ওল্দাজ : ইস্কাপন, টেক্কা, ভুঁপ, ঝুইতন, হৱতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

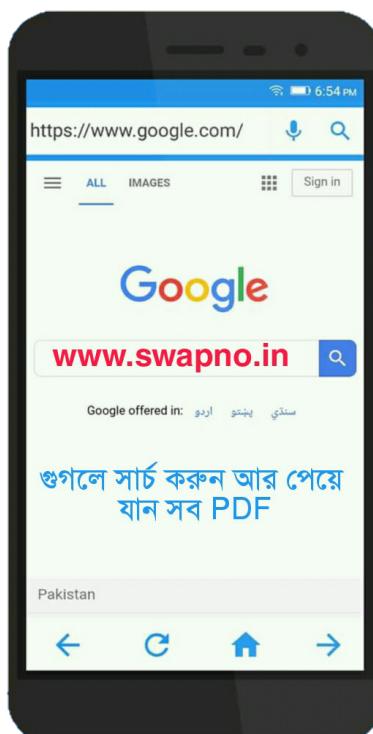
- (১) গুজরাটি : খদর, হরতাল ইত্যাদি।
- (২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।
- (৩) তুর্কি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা ইত্যাদি।
- (৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।
- (৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুঁজি, লুঁজি ইত্যাদি।
- (৬) জাপানি : রিঙ্গা, হারিকিরি ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দছৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন – রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি), হাট-বাজার (বাঙ্গা+ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম) খ্রিস্টান (ইংরেজি+তৎসম), ডাক্তার-খানা (ইংরেজি+ফারসি), পকেট-মার (ইংরেজি+বাঙ্গা), চৌ-হান্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ : বাঙ্গা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এর বেশিরভাগই এ কালের প্রয়োগ।

উদাহরণ : অক্সিজান—oxygen; উদ্যান—hydrogen; নথি—file; প্রশিক্ষণ—training; ব্যক্ষ্যাপক—manager; বেতার—radio; মহাব্যবস্থাপক—general manager; সচিব—secretary; স্নাতক—graduate; স্নাতকোত্তর—post graduate; সমাপ্তি—final; সাময়িকী—periodical; সমীকরণ—equation ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য : বাঙ্গা ভাষার শব্দসমূহের দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত— যে ভাষা থেকেই আসুক না কেন, এখন তা বাঙ্গা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। এগুলো বাঙ্গা ভাষার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, বাঙ্গা থেকে আলাদা করে এদের কথা চিন্তা করা যায় না। যেমন—টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, স্যাটেলাইট ইত্যাদি প্রচলিত শব্দের কঠিনতর বাঙ্গা পরিভাষা সৃষ্টি নিষ্পত্তিযোজন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ (= বি + আ + চৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা : যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা : ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও সেসবের সুস্থু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় শুল্কাশুল্ক নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ : যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠনপ্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুস্থু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন—

১. ধ্বনি (Sound)

২. শব্দ (Word)

৩. বাক্য (Sentence)

৪. অর্থ (Meaning)

সব ভাষার ব্যাকরণেই প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয় —

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২. শব্দতত্ত্ব বা বৃগতত্ত্ব ((Morphology)

৩. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax) এবং

৪. অর্থতত্ত্ব (Semantics)

এ ছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography) ছব্দ ও অলংকার প্রভৃতি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

১. ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনি : মানুষের বাক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ কঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, টোট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ‘ধ্বনি’ বলা হয়। বাক প্রত্যঙ্গাজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একককে (Unit) ধ্বনিমূল (Phoneme) বলা হয়।

বর্ণ : বাক প্রত্যঙ্গাজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন (Symbol) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এ প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। যেমন—বাংলায় ‘বক’ কথাটির প্রথম ধ্বনিটির প্রতীক ঝুপে ব্যবহার করা হয়েছে ‘ব’, ইংরেজিতে সে ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় B বা b (বি); আবার আরবি, ফারসি ও উর্দুতে একই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয় ܒ (বে)।

ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালী, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সম্বিধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, শব্দ ও ষড় বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

২. রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় রূপ (morpheme)। রূপ গঠন করে শব্দ। সেই জন্য শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব (Morphology) বলা হয়।

৩. বাক্যতত্ত্ব

মানুষের বাক্যপ্রক্রিয়াজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্টি অর্থবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য (Sentence)। বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্বিক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে শব্দ বা পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়। বাক্যের মধ্যে কোন পদের পর কোন পদ বসে, কোন পদের স্থান কোথায় বাক্যতত্ত্বে এসবের পূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। বাক্যতত্ত্বকে পদক্রমও বলা হয়।

৪. অর্থতত্ত্ব

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন—মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিগ্রহাতর্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ : বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পদ্ধতিরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরনের প্রয়োজনীয় কিছু পারিভাষিক শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্রাতিপদিক : বিভিন্নহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন— হাত, বই, কলম ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ : মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই সাধিত শব্দ বলে। যথা— হাতা, গরমিল, দম্পতি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ দুই প্রকার : নাম শব্দ ও ক্রিয়া। প্রত্যেকটি বা নামশব্দের ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়।

প্রকৃতি : যে শব্দকে বা কোনো শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি দুই প্রকার : নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

নাম প্রকৃতি : হাতল, ফুলেল, মুখর— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই – হাত + ল = হাতল (বাঁট), ফুল + লেল = ফুলেল (ফুলজাত) এবং মুখ + র = মুখর (বাচাল)। এখানে হাত, ফুল ও মুখ শব্দগুলোকে বলা হয় প্রকৃতি বা মূল অংশ। এগুলোর নাম প্রকৃতি।

ক্রিয়া প্রকৃতি : আবার চলন্ত, জমা ও লিখিত— এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই $\sqrt{\text{চল}} + \text{অন্ত} = \text{চলন্ত}$ (চলমান), $\sqrt{\text{জম}} + \text{আ} = \text{জমা} (\text{সঞ্চিত})$ এবং $\sqrt{\text{লিখ}} + \text{ইত} = \text{লিখিত}$ (যা লেখা হয়েছে)। এখানে চল, জম ও লিখ— এ তিনটি ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অর্থ। এগুলোকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু।

প্রত্যয় : শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে। কয়েকটি শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

নাম প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
হাত	+ ল	হাতল
ফুল	+ এল	ফুলেল
মুখ	+ র	মুখর
ক্রিয়া প্রকৃতি	প্রত্যয়	প্রত্যয়ান্ত শব্দ
$\sqrt{\text{চল}}$	+ অন্ত	চলন্ত
$\sqrt{\text{জম}}$	+ আ	জমা

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায় : ১. তদ্বিতীয় প্রত্যয় ও ২. কৃৎ প্রত্যয়।

১. তদ্বিতীয় প্রত্যয় : শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে তদ্বিতীয় প্রত্যয়। যেমন—হাতল, ফুলেল ও মুখর শব্দের যথাক্রমে ল, এল এবং র তদ্বিতীয় প্রত্যয়।

২. কৃৎ প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। উদাহরণে চলন্ত, জমা ও লিখিত শব্দের যথাক্রমে অন্ত, আ এবং ইত কৃৎ প্রত্যয়।

তদ্বিতীয় প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্বিতীয় শব্দ এবং কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদ্বিত শব্দ। যেমন— হাতল, ফুলেল ও মুখর তদ্বিতীয় শব্দ এবং চলন্ত, জমা ও লিখিত কৃদ্বিত শব্দ।

উপসর্গ : শব্দ বা ধাতুর পূর্বে কতিপয় সূনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ না ধাকলেও শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হলেই অর্থবাচকতা সূচিত হয়। যেমন— ‘পরা’ একটি উপসর্গ, এর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ‘জয়’ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে হলো ‘পরাজয়’। এটি জয়ের বিপরীতার্থক। সেইরূপ ‘দর্শন’ অর্থ দেখা। এর আগে ‘প্’ উপসর্গ যুক্ত হয়ে হলো ‘প্রদর্শন’ অর্থাৎ সম্যকরূপে দর্শন বা বিশেষভাবে দেখা।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের উপসর্গ দেখা যায় : ১. সংকৃত ২. বাংলা ৩. বিদেশি উপসর্গ।

১. সংকৃত উপসর্গ : প্, পরা, অপ—এরূপ বিশটি সংকৃত বা তৎসম উপসর্গ রয়েছে।

তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ‘পূর্ণ’ একটি তৎসম শব্দ। ‘পরি’ উপসর্গযোগে হয় ‘পরিপূর্ণ। ঘৃত (হর)+ঘঞ্চ = ‘হার’-এ কৃদন্ত শব্দের আগে উপসর্গ যোগ করলে কীরূপ অর্থের পরিবর্তন হলো লক্ষ কর : আ+হার = আহার (খাওয়া), বি + হার = বিহার (অমগ), উপ+হার=উপহার (পারিতোষিক), পরি+হার=পরিহার (বর্জন) ইত্যাদি।

২। বাংলা উপসর্গ : আ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাখণ্ড বাংলা উপসর্গ। যাটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো যুক্ত হয়। যেমন – অ+কাজ=অকাজ, অনা+ছিটি (সৃষ্টি শব্দজাত) = অনাছিটি ইত্যাদি।

৩। বিদেশি উপসর্গ : কিছু বিদেশি শব্দ বা শব্দাখণ্ড বাংলা উপসর্গসমূহে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। যথা : বেহেড, লাপান্তা, গরহাজির ইত্যাদি।

(পরে উপসর্গ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

অনুসর্গ : বাংলা ভাষায় দারা, দিয়া, কৃত্তৃ, চেয়ে, থেকে, উপরে, পরে, প্রতি, মাঝে, বই, বাতীত, অবধি, হেতু, জন্য, কারণ, মতো, তবে ইত্যাদি শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদবূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়; আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে। এগুলোকে অনুসর্গ বলা হয়। যেমন—কেবল আমার জন্য তোমার এ দুর্ভোগ। মনোযোগ দিয়ে শোন, শেষ পর্যন্ত সবার কাজে আসবে।

অনুশীলনী

- ১। ভাষা বলতে কী বোঝ ? বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
- ২। বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়টি পুছে বিভক্ত করা যায় ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ৩। নিচের শব্দগুলোকে গুচ্ছ অনুযায়ী সাজাও (তৎসম, তৎব ইত্যাদি শিরোনামের নিচে দেখ)।
রাখাল, সম্মাট, বাদশাহ, বেগম, গুরু, গৃহ, হাকিম, দা, হাসপাতাল, চেয়ার, সমুদ্র, কিতাব, ডিঙ্গি, টেকি, চিনি, কুঞ্জি, রিঙ্গা, দেবতা, খড়ম।
- ৪। ব্যাকরণ কাকে বলে। ব্যাকরণে কী কী বিষয় আলোচিত হয় ?
- ৫। নিচের বাকাঙ্গুলোকে আদর্শ চলিত রীতিতে পরিবর্তন কর।
 - ক. এখনও সে স্কুল হইতে ফিরে নাই।
 - খ. আমি তাহাকে চিঠি লিখিয়াছি।
 - গ. মে আসিবে বলিয়া ভরসা করিতে পরিতেছি না।
 - ঘ. আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়া লইয়াছি।
 - ঙ. স্কুল পালাইয়া রবীশুনাথ হইতে পারিবে না।
 - চ. বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

- ছ. সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া যাইও না, দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় ভুলিও না।
 জ. যাহাদের কথামতো অংসুর হইলাম শেষ পর্যন্ত তাহারাই আমাকে বিপদে ফেলিল।
 ঝ. দুই ক্ষু বনে ভ্রমণ করিতেছিল, এমন সময় এক ভালুক আসিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইল।
- ৬। ঠিকতে টিক () চিহ্ন দাও।
- ক. বাংলা লেখ্য ভাষার রীতি কয়টি? – একটি/ দুটি/ তিনটি/ চারটি
 খ. সাধু রীতির বাক্যবিন্যাস–অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দিষ্ট/ অনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট
 গ. চলিত রীতি– দুর্বোধ্য/ সহজবোধ্য/ বক্তৃতার অনুপযোগী
 ঘ. বাংলা ভাষার শব্দসমূহারকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? – তিন ভাগে/ পাঁচ ভাগে/ চার ভাগে
 ঙ. দেশি শব্দ– সংস্কৃত জাত/ তত্ত্ব জাত/ দেশজ
 চ. তৎসম শব্দ মানে– সংস্কৃত/ ফারাসি/ উর্দু
- ৭। ক. নিচের শব্দগুলো থেকে ইংরেজি শব্দ খুঁজে বের কর।
 কিতাব, হাকিম, আনারস, চাকর, পেঙ্গিল, কলম, টিন, স্কুল, শার্ট
 খ. নিচের শব্দগুলো থেকে আরবি–ফারাসি শব্দ খুঁজে বের কর এবং আরবি শব্দের ডানে ‘আ’ ও ফারাসি শব্দের ডানে ‘ফা’ লিখে দাও।
 রেসেতোরা, বোতাম, দারোগা, অফিস, আদালত, কলম, দোয়াত, খোদা, নামাজ, নবি, পয়গম্বর, ফুটবল, গুদাম, বালতি, ফেরেশতা, বেহেশত, ইমান, গোসল, মন্তব, মাওলানা।
 গ. নিচের শব্দগুলোর প্রতি গুচ্ছের পাশে ডান দিকে যে নাম লেখা আছে তা ভুল হলে ঠিক নামটি বসাও।
 ১. গুনাহ, ফেরেশতা, দোজখ, রোজা–আরবি
 ২. মাস্টার, লাইব্রেরি, ব্যাগ, কলেজ–ফারাসি
 ৩. চন্দ, সূর্য, পত্র, ধর্ম – পর্তুগিজ
 ৪. চুলা, কুলা, চোঙ্গা, ডিঙ্গি–ইংরেজি
 ৫. হাত, চামার, কামার, মাথা – দেশি
 ৬. আলপিন, আলমারি, পাউরুটি, চাবি–তৎসম
 ৭. চাকু, চাকর, দারোগা, তোপ–তত্ত্ব
 ৮. আগ্নাহ, ইসলাম, তসবি, উকিল–তুর্কি।
- ৮। নিচে ব্যাকরণের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো। যেটি ঠিক তার বাম পাশে টিক () চিহ্ন দাও।
১. যে শাস্ত্রে ভাষার বিভিন্ন উপাদান, তার গঠনপ্রকৃতি ও তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগবিধি আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলে।
 ২. যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষা শুন্ধরূপে পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বনিতত্ত্ব

বাংলা ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

কোনো ভাষার বাক প্রবাহকে সূজ্জতাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি (Sound) পাই। বাংলা ভাষাতেও কতগুলো মৌলিক ধ্বনি আছে।

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় : ১. স্বরধ্বনি ও ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।

১. স্বরধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন - অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২. ব্যঞ্জনধ্বনি : যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোথাও প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। যেমন - ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় স্বরবর্ণ। যেমন - অ, আ, ই, উ, উ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। যেমন - ক ইত্যাদি।

বর্ণমালা : যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন - ক + অ = ক, ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জনের নিচে 'হস্' বা 'হল' চিহ্ন (.) দিয়ে লিখিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচাত্ত্বিশটি (৩৯)টি।

১. স্বরবর্ণ	:	অ আ ই ঈ উ ঔ এ ঐ ও ঔ	১১টি
২. ব্যঞ্জনবর্ণ	:	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি
		চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি

ট ঠ চ ছ	৫টি
ত থ দ থ ন	৫টি
প ফ ব ত ম	৫টি
য র ল	৩টি
শ ষ স হ	৪টি
ড ঢ য ঃ	৪টি
ঁ ঁ ঁ *	৩টি
মোট ৫০টি	

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ঐ, ঔ - এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন - অ + ই = ঐ , অ + উ = ঔ

স্বর ও ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

কার ও ফলা

কার : স্বরবর্ণের এবং কতগুলো ব্যঙ্গনবর্ণের দুটি রূপ রয়েছে। স্বরবর্ণ যখন নিরপেক্ষ বা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না, তখন এর পূর্ণরূপ লেখা হয়। একে বলা হয় প্রাথমিক বা পূর্ণরূপ। যেমন - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঝ, এ, ঐ, ও, ঔ।

এই রূপ বা form শব্দের আদি, মধ্য, অন্ত - যে কোনো অবস্থানে বসতে পারে। স্বরধ্বনি যখন ব্যঙ্গনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়, তখন সে স্বরধ্বনিটির বর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা 'কার'। যেমন - 'আ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ (।)। 'ম'-এর সঙ্গে 'আ'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ '।' যুক্ত হয়ে হয় 'মা'। বানান করার সময় বলা হয় ম এ আ-কার (মা)। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন - আ-কার (।), ই-কার (ঁ), ঈ-কার (ঁ), উ-কার (ু), ঔ-কার (ু), ঝ-কার (ঁ), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার (০-), ঔ-কার (০-।)। অ-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নেই।

আ-কার (।) এবং ই-কার (ঁ) ব্যঙ্গনবর্ণের পরে যুক্ত হয়। ই-কার (ঁ), এ-কার (ে) এবং ঐ-কার (ৈ) ব্যঙ্গনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়। উ-কার (ু), ঔ-কার (০-) এবং ঝ-কার (ঁ) ব্যঙ্গনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়। ও-কার (০-) এবং ঔ-কার (০-।) ব্যঙ্গনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়।

উদাহরণ : মা, মী, মি, মে, মৈ, মু, মু, মো, মৌ।

ফলা : স্বরবর্ণ যেমন ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয়, তেমনি কোনো কোনো ব্যঙ্গনবর্ণও কোনো কোনো স্বর কিংবা অন্য ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। যেমন-ম্য, ম্ব, ইত্যাদি। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন 'কার' বলা হয়, তেমনি ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় 'ফলা'। এভাবে যে ব্যঙ্গনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ করা হয়। যেমন- ম-এ ঘ-ফলা = ম্য, ম- এ র-ফলা = ম্ব, ম-এ ল- ফলা = ইত্যাদি; ম-এ ব-ফলা = স্ব। র-ফলা ব্যঙ্গনবর্ণের পরে হলে লিখতে হয় নিচে। 'ম্ব'; আবার 'র' যদি ম-এর আগে উচ্চারিত হয়, যেমন-

ম-এ রেফ 'র' তবে লেখা হয় ওপরে, ব্যঙ্গনটির মাথায় রেফ (') দিয়ে। 'ফলা' যুক্ত হলে যেমন, তেমনি 'কার' যুক্ত হলেও বর্ণের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন — হ-এ উ-কার=হু, গ-এ উ-কার = গু, শ-এ উ-কার = শু, স-এ উ-কার=সু, র-এ উ-কার = রু, র-এ উ-কার = রু, হ-এ ঝ-কার=হু।

ক থেকে ম পর্যন্ত শীঁচশটি স্পর্শধ্বনি (Plosive)কে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে শীঁচটি গুচ্ছে বা বর্ণে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় এই বর্ণায় ধ্বনি। বর্গভুক্ত বলে এ ধ্বনির চিহ্ন গুলোকেও এই বর্ণায় নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	ধ্বনি	হিসেবে এগুলো	কষ্ট্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে 'ক'	বর্ণায়	বর্ণ
চ	ছ	জ	ঝ	ঝঁ	"	"	তালব্য	"	"	'চ'	"	"
ট	ঠ	ড	ঢ	ঢঁ	"	"	মূর্ধন্য	"	"	'ট'	"	"
ত	থ	দ	ঢ	ন	"	"	দস্ত্য	"	"	'ত'	"	"
প	ফ	ব	ঢ	ম	"	"	ওষ্ঠ্য	"	"	'প'	"	"

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঙ্গনধ্বনির বিভাগ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কষ্ট্য বা জিহবামূল, অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাত দস্তমূল, দস্ত্য বা অগ্র দস্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি।

উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঙ্গনধ্বনিগুলোকে শীঁচ ভাগে ভাগ করা হয় : ১. কষ্ট্য বা জিহবামূলীয় ২. তালব্য বা অগ্রতালুজুত, ৩. মূর্ধন্য বা পশ্চাত দস্তমূলীয়, ৪. দস্ত্য বা অগ্র দস্তমূলীয় এবং ৫. ওষ্ঠ্য।

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যক্ষ গুলো ব্যবহৃত হয় :

- ১ - টোট (ওষ্ঠ ও অধর)
- ২ - দাঁতের পাটি
- ৩ - দস্তমূল, অগ্র দস্তমূল
- ৪ - অগ্রতালু, শক্ত তালু
- ৫ - পশ্চাতালু, নরম তালু, মূর্ধা
- ৬ - আলজিত
- ৭ - জিহবাষ্ঠ
- ৮ - সম্মুখ জিহবা
- ৯ - পশ্চাদজিহবা, জিহবামূল
- ১০ - নাসা-গহবর
- ১১ - স্বর-পল্লব, স্বরতত্ত্বী
- ১২ - ফুসফুস

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা ব্যঙ্গনথনির বিভাজন দেখানো হলো :

উচ্চারণ স্থান	ব্যঙ্গনথনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহবামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কঠ্য বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রাত্মু	চ ছ জ ঝ শ য	তালব্য বর্ণ
পশ্চাত্মমূল	ট ঠ ড ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাত্মমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ত ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

মুক্তব্য : খট-ত (ঃ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস-চিহ্ন মুক্ত (ঃ)-এর বৃপ্তভেদ মাত্র।

ঁ ঁ ঁ - এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।

ঙ এঁ ঁ ন ম-এ পাচটি বর্ণ এবং ঁ ঁ ঁ যে বর্ণের সঙ্গে লিখিত হয় সে বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস নিঃস্ত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারক্ষ দিয়ে বের হয়; অর্থাৎ এগুলোর উচ্চারণে নাসিকার সাহায্য প্রয়োজন হয়। তাই এগুলোকে বলে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। আর এগুলোর বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।

স্বরধ্বনির ত্রুট্যতা ও দীর্ঘতা : স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে ত্রুট্য বা দীর্ঘ হয়। যেমন- ইঁইরেজি full-পূর্ণ এবং foo] বোকা। শব্দ দুটোর প্রথমটির উচ্চারণ ত্রুট্য ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ দীর্ঘ। ত্রুট্য বর্ণের উচ্চারণ যে দীর্ঘ হয় এবং দীর্ঘ বর্ণের উচ্চারণ যে ত্রুট্য হয়, কয়েকটি উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে। যেমন-ইঁগিশ, তিরিশ, উচিত, নতুন-লিখিত হয়েছে, ত্রুট্য ই-কার ও ত্রুট্য - উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে দীর্ঘ। আবার দীন, দীনুল ফিরে, ভূমি-লিখিত হয়েছে দীর্ঘ ই-কার এবং দীর্ঘ উ-কার দিয়ে; কিন্তু উচ্চারণে ত্রুট্য হয়ে যাচ্ছে। একটিমাত্র ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণ সবসময় দীর্ঘ হয়। যেমন-দিন, তিল, পুর ইত্যাদি।

যৌগিক স্বর : পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দুটি উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি বৃপ্তে উচ্চারিত হয়। এবৃপ্তে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন-অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয়, (বয়, ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।

আ + ই = আই (যাই, ভাই); আ + উ = আউ (লাউ); আ + এ = আয় (যায়, খায়); আ + ও = আও (যাও, খাও); ই + ই = ইই (দিই); ই + উ = ইউ (শিউলি); ই + এ = ইয়ে (বিয়ে); ই + ও = ইও (নিও, দিও); উ + ই = উই (উই, শুই); উ + আ = উয়া (কুয়া); এ + আ=এয়া (কেয়া, দেয়া); এ + ই = এই (সেই, নেই); এ + ও = এও (খেও); ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্মালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে: ঐ এবং ঔ। উদাহরণ : কৈ, মৌ। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

ବ୍ୟାଙ୍ଗନଧବନିର ବିଭାଗ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ନାମ

ଆଗେ ଆମରା ଦେଖେଛି ଯେ, ପୀଟଟି ବର୍ଗ ବା ଗୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ରିତେ ପୀଟଟି ବର୍ଗ ପାପ୍ୟା ଯାଏ । ଏଗୁଲୋ ସୃଷ୍ଟି ଧବନିଜ୍ଞାପକ । କ ଥେକେ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୀଟଟି ବ୍ୟାଙ୍ଗନକେ ସର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍ଗନ ବା ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍ଗନଧବନି ବଲେ ।

ଉଚ୍ଚାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବ ବ୍ୟାଙ୍ଗନଧବନିଗୁଲୋକେ ପ୍ରଥମତ ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଏ : ୧. ଅଧୋସ ଏବଂ ୨. ଦୋସ ।

୧. ଯେ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ସମୟ ସରତତ୍ତ୍ଵୀ ଅନୁରାଗିତ ହୁଏ ନା, ତାକେ ବଳା ହୁଏ ଅଧୋସ ଧବନି । ଯେମନ- କ, ଖ, ଚ, ଛ ଇତ୍ୟାଦି ।

୨. ଯେ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ସମୟ ସରତତ୍ତ୍ଵୀ ଅନୁରାଗିତ ହୁଏ, ତାକେ ବଲେ ଦୋସ ଧବନି । ଯେମନ- ଗ, ଘ, ଜ, ଝ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଗୁଲୋକେ ଆବାର ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଏ : କ. ଅଜପ୍ରାପ ଏବଂ ଖ. ମହାପ୍ରାପ ।

କ. ଯେ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ସମୟ ବାତାଦେର ଚାପେର ସବଲତା ଥାକେ, ତାକେ ବଳା ହୁଏ ଅଜପ୍ରାପ ଧବନି । ଯେମନ- କ, ଗ, ଚ, ଜ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଘ. ଯେ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ସମୟ ବାତାଦେର ଚାପେର ଆଧିକ୍ୟ ଥାକେ, ତାକେ ବଳା ହୁଏ ମହାପ୍ରାପ ଧବନି । ଯେମନ- ଖ, ଘ, ଛ, ଝ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉୟକ୍ଷଧବନି : ଶ, ସ, ହ - ଏ ଚାରଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟୋତିତ ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ସମୟ ଆମରା ଶ୍ଵାସ ଯତକ୍ଷଣ ଥୁଣି ରାଖତେ ପାରି । ଏଗୁଲୋକେ ବଳା ହୁଏ ଉୟକ୍ଷଧବନି ବା ଶିଶ୍କଧବନି । ଏ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଲୋକେ ବଳା ହୁଏ ଉୟବର୍ଣ୍ଣ ।

ଶ ସ ସ - ଏ ତିନଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟୋତିତ ଧବନି ଅଧୋସ ଅଜପ୍ରାପ, ଆର ‘ହ’ ଦୋସ ମହାପ୍ରାପ ଧବନି ।

ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଧବନି : ଯ୍ (Y) ଏବଂ ବ୍ (W) ଏ ଦୁଟୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟୋତିତ ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ମ୍ୟାନ ସର୍ବ ଓ ଉୟଧବନିର ମାବାମାବି । ଏଜନ୍ୟ ଏଦେର ବଳା ହୁଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଧବନି ।

ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି

ସବରଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣ

ଇ ଏବଂ ଈ-ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବା ଏଗିଯେ ଆସେ ଏବଂ ଉଚେ ଅଗ୍ରତାଲୁର କଠିନାହିଁର କାହାକାହି ଶୌଛେ । ଏ ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବାର ଅବସ୍ଥାନ ଈ-ଧବନିର ମତୋ ସମ୍ମୁଦ୍ରିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକାଟୁ ନିଚେ ଏବଂ ଆ-ଧବନିର ବେଳାୟ ଆରା ନିଚେ । ଈ ଈ ଏ (ଅ) ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବା ଏଗିଯେ ସମ୍ମୁଦ୍ରାଗେ ଦ୍ଵାରା ଦିକେ ଆସେ ବଲେ ଏଗୁଲୋକେ ବଳା ହୁଏ ସମ୍ମୁଦ୍ର ଧବନି । ଈ ଏବଂ ଈ-ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ବେଳାୟ ଜିହବା ଉଚେ ଥାକେ । ତାଇ ଏଗୁଲୋ ଉଚ୍ଚସମ୍ମୁଦ୍ର ସବରଧବନି । ଏ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥିତ ସମ୍ମୁଦ୍ର ସବରଧବନି ଏବଂ ଅ ନିମ୍ନାବସ୍ଥିତ ସମ୍ମୁଦ୍ର ସବରଧବନି ।

ଉ ଏବଂ ଉ-ଧବନି ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବା ପିଛିଯେ ଆସେ ଏବଂ ପଚାଟ ତାଲୁର କୋମଳ ଅନ୍ଧଶେର କାହାକାହି ଉଠେ । ଉ-ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବା ଆରା ଏକାଟୁ ନିଚେ ଆସେ । ଅ-ଧବନିର ବେଳାୟ ତାର ଚେଯେଓ ନିଚେ ଆସେ । ଉ ଉ ଓ ଅ-ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣେ ଜିହବା ପିଛିଯେ ଆସେ ବଲେ ଏଗୁଲୋକେ ପଚାଟ ସବରଧବନି ବଳା ହୁଏ । ଉ ଓ ଉ-ଧବନିର ଉଚ୍ଚାରଣକାଳେ ଜିହବା ଉଚେ ଥାକେ ବଲେ ଏଦେର ବଳା ହୁଏ ଉଚ୍ଚ ପଚାଟ ସବରଧବନି ଓ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥିତ ପଚାଟ ସବରଧବନି ଏବଂ ଅ-ନିମ୍ନାବସ୍ଥିତ ପଚାଟ ସବରଧବନି ।

বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহবা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কষ্টের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সমুখ ও পশ্চাত অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো

	সমুখ, উষ্ঠাধর প্রস্তুত	কেন্দ্রীয়, উষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাত, উষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ই		উ উ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

শব্দে অবস্থানভেদে অ দুইভাবে পিষিত হয়

১. স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন—অমর, অনেক।
২. শব্দের মধ্যে অন্য বর্ণের সঙ্গে বিলীনভাবে ব্যবহৃত অ। যেমন— কর, বল। এখানে ক এবং র আর ব এবং ল বর্ণের সঙ্গে অ বিলীন হয়ে আছে। (ক + অ + র + অ; ব+ অ + ল + অ)।

শব্দের অ-ধ্বনির দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায়

১. বিবৃত বা স্বাভাবিক উচ্চারণ। যেমন— অমল, অনেক, কত।
 ২. সংবৃত বা ও-ধ্বনির মতো উচ্চারণ। যথা— অধীর, অতুল, মন। এ উচ্চারণগুলোতে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো (ওধীর, ওতুল, মোন)।
৩. ‘অ’-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ
 - (ক) শব্দের আদিতে
 ১. শব্দের আদিতে না-বোধক ‘অ’ যেমন — অটল, অনাচার।
 ২. ‘অ’ কিহবা ‘আ’-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন — অমানিশা, কথা।
 - (খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে
 ১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসজ্ঞাতির কারণে বিবৃত ‘অ’। যেমন — কলম, বৈধতা, যত, শ্রেষ্ঠ।
 ২. ঝ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি, ঐ-ধ্বনি এবং ঔ-ধ্বনির পরবর্তী ‘অ’ প্রায়ই বিবৃত হয়। যেমন — তৃণ, দেব, ধৈর্য, নৌক, মৌন ইত্যাদি।
 ৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন — গঠিত, মিত, জনিত ইত্যাদি।

২. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ

অ-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণে চোয়াল বেশি ফাঁক হয়। টোট তত বাঁকা বা গোল হয় না। কিন্তু সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও টোট গোলাকৃত হয়ে ‘ও’-এর মতো উচ্চারিত হয়। সংবৃত উচ্চারণকে ‘বিকৃত’, ‘অপ্রকৃত’ বা ‘অস্বাভাবিক’ উচ্চারণ বলা ঠিক নয়। সংবৃত উচ্চারণও ‘স্বাভাবিক’, ‘আবিকৃত’ ও ‘প্রকৃত’ উচ্চারণ।

(ক) শব্দের আদিতে

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন— অতি (ওতি), করুণ (কোরুণ), করে (অসমাপিকা ‘কোরে’)। কিন্তু সমাপিকা ‘করে’ শব্দের ‘অ’ বিবৃত।
২. পরবর্তী ই, উ – ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ববর্তী র-ফলাযুক্ত ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু আ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব ‘অ’ বিবৃত হয়। যেমন—প্রতাত, প্রত্যয়, প্রণাম ইত্যাদি।

(খ) শব্দের মধ্যে ও অন্তে

১. তর, তম, তন প্রত্যয়যুক্ত বিশ্লেষণ পদের অন্ত্য স্বর ‘অ’ সংবৃত হয়। যেমন – প্রিয়তম (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।
২. ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য ‘অ’ সংবৃত। যেমন – পিয় (পিয়ো), যাবতীয় (যাবতীয়ো) ইত্যাদি।
আ : বালায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ ত্রুট্য ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (calm) শব্দের আ (a)-এর মতো। যেমন– আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি।

বালায় একাক্ষর (Monosyllabic) শব্দে আ দীর্ঘ হয়। যেমন— কাজ শব্দের আ দীর্ঘ এবং কাল শব্দের আ ত্রুট্য। এরূপ— যা, পান, ধান, সাজ, চল, টান, বাঁশ।

- ই-ঈ : বালায় সাধারণত ত্রুট্য ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ – দুটোই দীর্ঘ হয়। যেমন— বিষ, বিশ, দীন, দিন, শীত।
- উ উ : বালায় উ এবং উ ধ্বনির উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ই-ঈ-ধ্বনির মতো একাক্ষর শব্দে এবং বহু অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের বস্ত্রাক্ষরে বা প্রাণিক যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ সামান্য দীর্ঘ হয়। যেমন— চুল (দীর্ঘ), চুলা (ত্রুট্য), ভূত, মুক্ত, তুলভূলে, ভুক্তান, বহু, অজু, করুণ।

ঝ : স্মাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঝ-এর উচ্চারণ রি অথবা রী-এর মতো হয়। আর ব্যঙ্গন ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা+ ই-কার এর মতো হয়। যেমন— ঝগ, ঝাতু, (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষ্টি (ক্রিস্টি)।

দ্রষ্টব্য : বালায় ঝ-ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলে না। সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রাঙ্কিত হয়েছে।

এ : এ-ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম : সংবৃত ও বিবৃত। যেমন – মেঘ, সংবৃত/বিবৃত, খেলা-(খ্যালা), বিবৃত।

১. সংবৃত

- ক) পদের অন্তে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে, আসে ইত্যাদি।
- খ) তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঙ্গনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন— দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।
- গ) একাক্ষর সর্বনাম পদের ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— কে, সে, যে।
- ঘ) ‘হ’ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— দেহ, কেহ, কেষ্ট।
- ঙ) ‘ই’ বা ‘উ’-কার পরে থাকলে ‘এ’ সংবৃত হয়। যেমন— দেখি, রেণু, বেশুন।

২. বিবৃত : ‘এ’ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এর ‘এ’ (a)-এর মতো। যেমন— দেখ (দ্যাখ), একা (এ্যাকা) ইত্যাদি।

এ-ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

- ক) দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে— যেমন : এত, হেল, কেন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম— থেথা, সেথা, হেথা।
- খ) অনুস্বার ও চন্দ্ৰকিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগের এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন— খেড়া, চেড়া, স্যাতসেতে, গৌজেল।
- গ) ঝাঁটি বাংলা শব্দে : যেমন— খেপটা, চেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।
- ঘ) এক, এগার, তের — এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, ‘এক’ যুক্ত শব্দেও : যেমন— একচোট, একতলা, একঘরে ইত্যাদি।
- ঙ) ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায়, তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষের বৃপ্তে; যেমন— দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), খেল (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

ঐ : এ ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ঔ + ই = অই, ঔই। অ এবং ই- এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন — ক + অ + ই = কই, কৈ; ব + ই + থ = বৈথ ইত্যাদি। এরূপ — বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

ও : বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন— গো, জোর, রোগ, ভোর, কোন, বোন ইত্যাদি। অন্তর্সাধারণত দ্রুত হয়। যেমন— সোনা, কারো, পুরোভাগ। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

ব্যঙ্গনথবনির উচারণ

ক—বর্গীয় ধ্বনি : ক থ গ ঘ ঙ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পচাঃ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কষ্ট্য স্পর্শধ্বনি।

চ—বর্গীয় ধ্বনি : চ ছ জ বা ঝ—এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

ট—বর্গীয় ধ্বনি : ট ঠ ড চ ণ— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচারণে জিহ্বা উন্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।

ত—বর্গীয় ধ্বনি : ত থ দ ধ ন— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

প—বর্গীয় ধ্বনি : প ফ ব ত ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ষষ্ঠ্যধ্বনি বলে।

জ্ঞাতব্য

(১) ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্ণে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগ্যাশ্বের কোনো কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে; অর্থাৎ এদের উচারণে বাক্প্রত্যক্ষের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে স্পর্শ ধ্বনি।

(২) ঙ ঝ ণ ন ম— এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।

(৩) * চন্দ্ৰবিদু চিহ্ন বা প্রতীকটি পৱবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক ধ্বনি এবং প্রতীকটিকে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ বলে। যেমন— আঁকা, টাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শীস ইত্যাদি।

(৪) বাল্লায় ঙ এবং ৎ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমন—ৱঙ / ৱং, অহংকার / অহঙ্কার ইত্যাদি।

(৫) ঝ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা ‘ইয়’—এর উচারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমন— জ্বেঁগা (জ্বেঁইয়া)।

(৬) চ—বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঝ—এর উচারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন— জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।

(৭) বাল্লায় ৎ এবং ন—বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট—বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ৎ—এর মূর্ধন্য উচারণ পাওয়া যায়। যেমন— ঘণ্টা, লঠ্ঠন ইত্যাদি।

- (৮) ঙ ৎ এঁ ণ – এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন— সঙ্গ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, কুঁঠা, কণ ইত্যাদি।
- (৯) ন-বর্ণ দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন— নাম, বানান, বন ইত্যাদি।

অঞ্চলিক ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনিগুলোকে উচ্চারণযীতির দিক থেকে অঞ্চলিক ও মহাপ্রাণ, অঘোষ ও ঘোষ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়।

অঞ্চলিক ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঞ্চলিক ধ্বনি (Unaspirated)। যেমন—ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস জোরে সংযোজিত হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated)। যেমন— খ, ঘ ইত্যাদি।

অঘোষ ধ্বনি : কোনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হয় না। তখন ধ্বনিটির উচ্চারণ গান্ধীর্ঘহীন ও মৃদু হয়। এরূপ ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি (Unvoiced)। যেমন— ক, খ ইত্যাদি।

ঘোষ ধ্বনি : ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতত্ত্বী অনুরণিত হলে ঘোষ ধ্বনি (Voiced) হয়। যেমন— গ, ঘ ইত্যাদি।

অঞ্চলিক ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলোকে নিচের ছকে দেখানো হলো—

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (Voiceless)		ঘোষ (Voiced)		
	(১) অঞ্চলিক (Unaspirated)	(২) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৩) অঞ্চলিক (Unaspirated)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspirated)	(৫) নাসিক্য
কষ্ট	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঝঁ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ট	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি : স্পর্শ বা উচ্চ ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব—এ ধ্বনিগুলোকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

ঘ : ঘ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি সাধারণত সম্মুখ তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এজন্য এ ধ্বনিটিকে বলা হয় তালব্য ধ্বনি। শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হলে বালায় এর উচ্চারণ ‘জ’—এর মতো। যেমন — যখন, যাবেন, যুদ্ধ, যম ইত্যাদি। শব্দের মধ্যে বা অন্তে (সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী) ব্যবহৃত হলে ‘ঝ’ উচ্চারিত হয়। যেমন — বি + যোগ = বিয়োগ।

ঢ : ঢ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তদারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাভাগকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজ্ঞাত ধ্বনি বলা হয়। উদাহরণ — রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

ঞ : ঞ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার দুই পাশ দিয়ে মূখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেয়া হয়। দুই পাশ দিয়ে বায়ু নিঃস্ত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়। যেমন — লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

ঝ : বালা বর্ণমালায় বর্গীয়—ব এবং অন্তঃস্থ—ব—এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ—এ দুই রকমের ব—এর সেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে অন্তঃস্থ—ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃস্থ ‘ঝ’ ও অন্তঃস্থ ‘ব’— এ দুটো অর্ধব্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মতো। যেমন — নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।

উচ্চধ্বনি : যে বাঙ্গনের উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা না পেয়ে কেবল ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং শিশধ্বনির সৃষ্টি করে, সেটি উচ্চধ্বনি। যেমন— আশীর, শিশি, শিশু ইত্যাদি। শিশ দেয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে বলে একে শিশধ্বনিও বলা হয়।

শ, ষ, স – তিনটি উচ্চ বর্ণ। শ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান পচাঃ দন্তমূল। ষ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান মূর্ধা এবং স—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান দন্ত।

লক্ষণীয় : স—এর সঙ্গে খ র ত থ কিন্বা ন যুক্ত হলে স—এর দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যেমন — স্থলন, স্মর্তা, আস্ত, স্থাপন, স্নেহ ইত্যাদি। আবার বানানে (সেখায়) শ থাকলেও উচ্চারণ দন্ত্য—স হয়। যেমন — শ্রমিক (শ্রমিক), শৃঙ্খল (সৃঙ্খল), প্রশ্ন (প্রন্ন)।

অঘোষ অঘ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্যধ্বনি (ট ও ঠ)—এর আগে এলে স—এর উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন— কষ্ট, কাষ্ট ইত্যাদি।

হ : হ—বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কঠনালীতে উৎপন্ন মূল উচ্চ ঘোষধ্বনি। এ উচ্চধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্নত কঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন — হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

঑ (অনুন্ধার) : ঑ এর উচ্চারণ ঔ—এর উচ্চারণের মতো। যেমন — রং (রঙ), বালা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ঑—এর বদলে ঔ এবং ঔ—এর বদলে ঑—এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।

৪ (বিসর্গ) : বিসর্গ হলো অঘোষ ‘হ’-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ৪ এর উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা— আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্ছারিত থাকে। যেমন — বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঙ্গন হিত্ত হয়। যেমন — দুঃখ (দুঃখ), প্রাতঃকাল (প্রাতঃকাল)।

ড় ও ঢ় : ড় ও ঢ়-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্ধাং উল্টো পিঠের দ্বারা উপরের দস্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্ছারিত হয়। এদের বলা হয় তাড়নজ্ঞাত ধ্বনি। ড়—এর উচ্চারণ ড এবং র—এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ—এর উচ্চারণ ড় এবং হ—এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মুক্ত মিলিত ধ্বনি। যেমন — বড়, গাঢ়, রাঢ়, ইত্যাদি।

সংযুক্ত ব্যঙ্গনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণ

দুটি বা তার চেয়ে বেশি ব্যঙ্গনধ্বনির মধ্যে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঙ্গনধ্বনি দুটি বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্ছারিত হয়। এরূপ যুক্তব্যঙ্গনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটি বা অধিক ব্যঙ্গনবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ (ligature) গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঙ্গনবর্ণের মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন — তত্ত্ব (ত + অ + ক + ত + আ = তত্ত্ব)। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত-এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে ক্ষেত্রে হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঙ্গন গঠিত হতে পারে। যথা :

ক. কার সহযোগে

খ. ফলা সহযোগে

গ. ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে ব্যঙ্গনবর্ণ (ফলা ব্যতীত) সহযোগে।

ক. কার সহযোগে ৪ স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঙ্গনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে ‘কার’। অ-তিনু অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার দশটি। এগুলো যথাক্রমে :

আ-কার (।) — বাৰা, মা, চাকা; ঝ-কার (ঁ) কৃতী, গৃহ, ঘৃত;

ই-কার (ঁ) — পাখি, বাঢ়ি, চিনি; এ-কার (ঁ) ছেলে, মেয়ে, ধেয়ে;

ঈ-কার (ী) — নীতি, শীত, স্তৰী; ঔ-কার (ঁ) বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য;

উ-কার (ু) — খুকু, বুৰু, ফুফু; শু-কার (ঁ) দোলা, তোতা, খোকা;

উ-কার (ু) — মূল্য, চূর্ণ, পূজা; ষু-কার (ঁ) ষৌষ, ষৌতম, কৌতুক।

খ.১. ফলা সহযোগে : ব্যঙ্গনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঙ্গনবর্ণের ফলা ছয়টি। যেমন—

গ/ ন-ফলা (গ/ ন/)- চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাহু, অপরাহ্ন, বিশু, কৃষ্ণ। চিহ্ন-র + এবং কৃষ্ণ-র ৪

ব- ফলা (ব)- বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব।

ମ— ଫଳା (ମ) — ତନ୍ମାୟ, ପର୍ମ, ଆଆ ।

ସ— ଫଳା (ଜ) — ସହ୍ୟ, ଅଭ୍ୟନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ।

ର— ଫଳା (ର) — ଗ୍ରେ, ବ୍ରତ, ମ୍ରଷ୍ଟା ।

(‘ରେଫ) — ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ତର୍କ, ଥର୍ବ ।

ଲ— ଫଳା (ଲ) — କ୍ଲାନ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନ, ଉଲ୍ଲାସ ।

ଖ. ୨. ବାଲୀ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍ଗେଓ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ସଥା— ଏୟାପୋଲୋ, ଏୟାଟିମ, ଏୟାଟିର୍ନି, ଏୟାଲାର୍ମ ଧନି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଖ. ୩. ବାଲୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଜନେର ସାଥେଓ କାର ଏବଂ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ହେଯେ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ । ଯେମନ — ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁନ୍ଦିଲି, ସମ୍ବଧ୍ୟା, ଇତ୍ୟାଦି ।

କତିପଯ ସଂୟୁକ୍ତ ବ୍ୟାଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ।

ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁକ୍ତି :

କ୍ର = କ୍+କ । ଯେମନ— ପାକ୍କା, ଛକ୍କା, ଚକ୍ର ।

କ୍ରୁ = କ୍+ତ । ଯେମନ— ରକ୍ତ, ଶକ୍ତ, ଡକ୍ତ ।

କ୍ଷ= କ୍+ଷ । (ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ର +ଖ—ଏର ମତୋ) ଯେମନ— ଶିକ୍ଷା, ବକ୍ଷ, ରକ୍ଷା ।

କ୍ଷୁ= କ୍+ସ । ବାକ୍ଷ ।

କ୍ଷକ୍= କ୍ଷ+କ । ଯେମନ— ଅକ୍ଷକ, କଞ୍ଜକାଳ, ଲକ୍ଷକା ।

କ୍ଷଖ= କ୍ଷ+ଖ । ଯେମନ— ଶୃଙ୍ଖଲା, ଶଙ୍ଖ ।

କ୍ଷଙ୍ଗ= କ୍ଷ+ଗ । ଯେମନ— ଅଙ୍ଗା, ମଙ୍ଗାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ।

କ୍ଷଯ= କ୍ଷ+ସ । ଯେମନ— ସଙ୍ଗ୍ୟ, ଲଙ୍ଘନ ।

କ୍ଷଚ= କ୍ଷ+ଚ । ଯେମନ— ଉଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଚ୍ଚକିତ ।

କ୍ଷଛ= କ୍ଷ+ଛ । ଯେମନ— ଉଚ୍ଛଳ, ଉଚ୍ଛୁର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଛେଦ ।

କ୍ଷଙ୍ଗ= କ୍ଷ+ଙ୍ଗ । ଯେମନ— ଉଙ୍ଗୀବନ, ଉଙ୍ଗୀବିତ ।

କ୍ଷଙ୍କ= କ୍ଷ+ଙ୍କ । ଯେମନ— କୁଙ୍କଟିକା ।

କ୍ଷଙ୍ଗ୍ୟ= କ୍ଷ+ଙ୍ଗ୍ୟ । ଯେମନ— ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ଗ୍ରେଂ୍ୟ’— ଏର ମତୋ) ଯେମନ— ଜାନ, ସଂଜା, ବିଜାନ ।

କ୍ଷଙ୍ଗ୍ୟ (କ୍ଷଙ୍ଗ)= କ୍ଷ+ଚ୍ୟ । ଯେମନ— ଅକ୍ଷଙ୍ଗ, ସଂକ୍ଷୟ, ପକ୍ଷଙ୍ଗ ।

କ୍ଷଙ୍ଗ୍ୟ= ଏଂ +ଛ । ଯେମନ— ବାଙ୍ଗିତ, ବାଙ୍ଗନୀୟ, ବାଙ୍ଗା ।

କ୍ଷଙ୍ଗ୍ୟ= ଏଂ +ଜ । ଯେମନ— ଗଙ୍ଗ, ରଙ୍ଗନ, କୁଙ୍ଗ ।

କ୍ଷଙ୍ଗ୍ୟ = ଏଂ+ବା । ଯେମନ— ବାଙ୍ଗା, ବାଙ୍ଗାଟ ।

[ବି. ଦ୍ର. ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରଟି ସଂୟୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ‘ନ’ ହୁଲେ ଓ ଲେଖାର ସମୟ କଥନୋ ନ୍ଚ (ଅନ୍ତଳ), ନ୍ ଛ (ବାନ୍ତଛ), ନ୍ଜ (ଗନ୍ତଜ), ନ୍ବା (ବାନ୍ତବା) ରୂପେ ଲେଖା ଠିକ ନାହିଁ ।]

ট= ট + ট। যেমন- অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম।

ড= ড + ড। যেমন- গড্ডালিকা, উড়টীন, উড়ড়য়ন।

ণ= ণ + ট। যেমন- ঘণ্টা, বণ্টন।

ত= ত + ত। যেমন- উত্তম, বিত্ত, চিত্ত।

থ= ত + থ। যেমন- উথান, উথিত, অনুথান।

দ= দ + দ। যেমন- উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য।

ধ= দ + ধ। যেমন- উদ্ধৃত, উদ্ধৃত, পদ্ধতি।

ঙ= দ + ত। যেমন- উঙ্গুব, উঙ্গট, উঙ্গিদ।

ন্ত= ন + ত। যেমন- অন্ত, দন্ত, কান্ত।

ন্দ= ন + দ। যেমন- আনন্দ, সন্দেশ, কন্দী।

ন্থ= ন + থ। যেমন- বন্ধন, রন্ধন, সন্থান।

ন্ম= ন + ম। যেমন- অন্ম, ছিন্ম, তিন্ম।

ন্মা= ন + ম। যেমন- জন্মা, আজন্ম।

ণ্ত= প + ত। যেমন- রণ্ত, ব্যাণ্ত, শিণ্ত।

ণ্প= প + প। যেমন- পাণ্পা, পাণ্পু, ধাণ্পা।

ণ্স= প + স। যেমন- লিঙ্গা, অভীঙ্গা।

ণ্দ= ব + দ। যেমন- অণ্দ, জণ্দ, শণ্দ।

ণ্ক= ল + ক। যেমন- উঞ্কা, বঙ্কল।

ণ্গ= ল + গ। যেমন- ফালুন।

ণ্ট= ল + ট। যেমন- উঞ্টা।

ণ্ক= ম + ক। যেমন- শুণ্ক, পরিষ্কার, বহিষ্কার।

ণ্ক= স + ক। যেমন- স্কুল, স্কুল।

ণ্খ= স + খ। যেমন- স্থল।

ণ্ট= স + ট। যেমন- আগণ্ট, স্টেশন।

ণ্ত= স + ত। যেমন- অস্ত, সস্তা, স্তৰ্ক।

ণ্প= স + প। যেমন- স্পষ্ট, স্পন্দন, স্পর্ধা।

ণ্ফ= স + ফ। যেমন- সফটিক, প্রস্ফুটিত।

ণ্ম= হ + ম। যেমন- ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় দুইয়ের অধিক বর্ণ সংযোগেও কিছু সত্যুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সূক্ষ্ম শব্দে এই বর্ণ= ক + ষ+ম- ফলা ; স্বাতন্ত্র্য শব্দের জ্য=ন+ত+র-ফলা (্য) +ষ-ফলা (ঝ) ইত্যাদি।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେଦ ଧବନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧବନିର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସାଥେ ସମ୍ମୁକ୍ତ । ଧବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାନା ପ୍ରକିଯାଯା ସମ୍ପଲ୍ଲ ହୁଏ । ନିମ୍ନେ ତା ଉତ୍କ୍ଳେଖ କରାଇଲୁ ।

୧. ଆଦି ସରାଗମ (Prothesis) : ଉଚାରଣେର ସୁବିଧାର ଜନ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ କାରଣେ ଶଦେର ଆଦିତେ ସରଧବନି ଏବେ ତାକେ ବଲେ ଆଦି ସରାଗମ (Prothesis) । ଯେମନ – ଶ୍କୁଲ > ଇଂଶ୍କୁଲ, ସେଟ୍ଶନ > ଇଂଶ୍ଟିଶନ । ଏବୁପ – ଆସ୍ତାବଳ, ଆସ୍ତପର୍ଦା ।

୨. ମଧ୍ୟ ସରାଗମ, ବିଶ୍ଵର୍କର୍ମ ବା ସରଭକ୍ତି (Anaptyxis) : ସମୟ ସମୟ ଉଚାରଣେର ସୁବିଧାର ଜନ୍ୟ ସମ୍ମୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ-ଧବନିର ମାଧ୍ୟାଖାନେ ସରଧବନି ଆସେ । ଏକେ ବଲା ହୁଏ ମଧ୍ୟ ସରାଗମ ବା ବିଶ୍ଵର୍କର୍ମ ବା ସରଭକ୍ତି । ଯେମନ-

ଅ – ରତ୍ନ > ରତନ, ଧର୍ମ > ଧରମ, ସମ୍ପ୍ର > ସମ୍ପନ, ହର୍ଦ > ହରୟ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଇ – ଗ୍ରୀତି > ପିଗ୍ରୀତି, କ୍ଲିପ > କିଲିପ, ଫିଲ୍ମ > ଫିଲିମ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଉ – ମୁକ୍ତା > ମୁକୁତା, ତୁର୍କ > ତୁରୁକ, ତୃ > ତୁରୁ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏ – ହାମ > ଗେରାମ, ପ୍ରେକ > ପେରେକ, ଦ୍ରେଫ > ଦେରେଫ ଇତ୍ୟାଦି ।

ଓ – ଶ୍ଲୋକ > ମୁରାଗ > ମୁରୋଗ > ମୋରଗ ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ଅନ୍ୟସରାଗମ (Apothesis) : କୋନୋ କୋନୋ ସମୟ ଶଦେର ଶେଷେ ଅତିରିକ୍ତ ସରଧବନି ଆସେ । ଏବୁପ ସରାଗମକେ ବଲା ହୁଏ ଅନ୍ୟସରାଗମ । ଯେମନ – ଦିଶ > ଦିଶା, ପୋଖତ > ପୋକ୍ତ, ବେଞ୍ଚ > ବେଞ୍ଚି, ସତ୍ୟ > ସତି ଇତ୍ୟାଦି ।

୪. ଅପିନିହିତି (Apenthesis) : ପରେର ଇ-କାର ଆଗେ ଉଚାରିତ ହୁଲେ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନଧବନିର ଆଗେ ଇ-କାର ବା ଉ-କାର ଉଚାରିତ ହୁଲେ ତାକେ ଅପିନିହିତି ବଲେ । ଯେମନ – ଆଜି > ଆଇଜ, ସାଧୁ > ସାଉଥ, ରାଖିଯା > ରାଇଖ୍ୟା, ବାକ୍ୟ > ବାଇକ୍ୟ, ସତ୍ୟ > ସଇତ୍ୟ, ଚାରି > ଚାଇର, ମାରି > ମାଇର ଇତ୍ୟାଦି ।

୫. ଅସମୀକରଣ (Dissimilation) : ଏକଇ ସରେର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦୂର କରାର ଜନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାଖାନେ ସଥନ ସରଧବନି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତଥନ ତାକେ ବଲେ ଅସମୀକରଣ । ଯେମନ – ଧପ + ଧପ > ଧପାଧପ, ଟପ + ଟପ > ଟପାଟପ ଇତ୍ୟାଦି ।

୬. ସରସଙ୍ଗତି (Vowel harmony) : ଏକଟି ସରଧବନିର ପ୍ରଭାବେ ଶଦେ ଅପର ସରେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତାକେ ସରସଙ୍ଗତି ବଲେ । ଯେମନ – ଦେଶି > ଦିଶି, ବିଲାତି > ବିଲିତି, ମୁଲା > ମୁଲୋ ଇତ୍ୟାଦି ।

କ. ପ୍ରଗତ (Progressive) : ଆଦିସର ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟସର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଲେ ପ୍ରଗତ ସରସଙ୍ଗତି ହୁଏ । ଯେମନ – ମୁଲା > ମୁଲୋ, ଶିକା > ଶିକେ, ତୁଳା > ତୁଲୋ ।

ଘ. ପରାଗତ (Regressive) : ଅନ୍ୟସରେ କାରଣେ ଆଦିସର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଲେ ପରାଗତ ସରସଙ୍ଗତି ହୁଏ । ଯେମନ – ଆଖୋ > ଆଖୁଯା > ଏଖୋ, ଦେଶି > ଦିଶି ।

- গ. মধ্যগত (Mutual) : আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসম্ভাবিত হয়। যেমন – বিলাতি > বিলিতি।
- ঘ. অন্যোন্য (Reciprocal) : আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসম্ভাবিত হয়। যেমন – মোজা > মুজো।
- ঙ. চলিত বাংলায় স্বরসম্ভাবিতি : গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে, ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমন – মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি। বিশেষ নিয়মে – উডুনি > উড়ুনি, এখনি > এখুনি হয়।
৭. সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ : মৃত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন – বসতি > বসতি, জানালা > জান্লা ইত্যাদি।
- ক. আদিস্বরলোপ (Aphesis) : যেমন – অলাবু > লাবু > লাউ, উন্ধার > উধার > ধার।
- খ. মধ্যস্বর লোপ (Syncope) : অগুরু > অগু, সুর্বণ > সৰ্বণ।
- গ. অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সম্র্থ্যা > সঞ্চৰ্বা > সীৰ্ব। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)
৮. ধ্বনি বিপর্যয় : শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন – ইঁরেজি বাক্স > বাংলা বাসুক, জাপানি রিক্সা > বাংলা রিস্কা ইত্যাদি। অনুযুগ – পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।
৯. সমীক্ষিত বন (Assimilation) : শব্দমধ্যস্বর দুটি তিনি ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অঙ্গ-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীক্ষিত বন। যেমন – জন্ম > জন্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।
- ক. প্রগত (Progressive) সমীক্ষিত বন : পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। অর্ধাং পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীক্ষিত বন। যেমন – চক্র > চক্ক, পক্ত > পক্ক, পঞ্চ > পদ্ম, লঘু > লংগ ইত্যাদি।
- খ. পরাগত (Regressive) সমীক্ষিত বন : পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, একে বলে পরাগত সমীক্ষিত বন। যেমন – তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তথিত, উৎ + মুখ > উনুখ ইত্যাদি।
- গ. অন্যোন্য (Mutual) সমীক্ষিত বন : যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীক্ষিত বন। যেমন – সংকৃত সত্য > প্রাকৃত সচ। সংকৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্ঞা ইত্যাদি।
১০. বিষমীক্ষিত বন (Dissimilation) : দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীক্ষিত বন। যেমন – শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।
১১. দ্বিতীয় ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্তা : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিতীয় ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্তা। যেমন – পাকা > পাকা, সকাল > সকাল ইত্যাদি।

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতি : শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন – কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

১৩. ব্যঞ্জনচূড়ি : পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচূড়ি বা ব্যঞ্জনচূড়ি। যেমন – বটদিদি > বটদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

১৪. অন্তর্হাতি : শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হাতি। যেমন – ফালুন > ফাগুন, ফজাহার > ফজার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

১৫. অভিশুভি (Umlaut) : বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদন্তমারে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশুভি। যেমন – করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে ‘কইরিয়া’ কিংবা বিপর্যয়ের ফলে ‘কইরা’ থেকে অভিশুভিজাত ‘করে’। এরূপ – শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

১৬. র-কার লোপ : আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্তী হয়। যেমন – তর্ক > তক, করতে > কন্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কলাম।

১৭. হ-কার লোপ : আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন— পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আরবি আল্লাহ > বাংলা আল্লা, ফারসি শাহু > বাংলা শা ইত্যাদি।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (Euphonic glides) : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি হি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ ‘য়’ (Y) বা অন্তঃস্থ ‘ব’ (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন – মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) যা = যাওয়া। এরূপ – নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহযোগে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।
 - ২। উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা স্বর ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে কী কী ভাবে ভাগ করা যায়?
 - ৩। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা যৌগিক স্বরগুলোর গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।
 - ৪। উদাহরণসহ নিচের বর্ণগুলোর ধ্বনি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ঙ, এও, ণ, ন, শ, ষ, স, ৎ, ৬, ঢ।

- ৫। নিচের শব্দগুলোর ঠিক উচ্চারণ পাশে লিখে দাও।
 ধীতীয়, আতীয়, অবজ্ঞা, বিশ্ব, বিময়, সত্য, সহ্য।
 (নমুনা : ঝঁঝঁ – ঝনঝা, কটক– কণ্টক)।
- ৬। সজ্জা লেখ ও উদাহরণ দাও : সমীতবন, বিপ্রকর্ষ, স্বরসজ্ঞাতি, অন্তর্হিতি, অপিনিহিতি, অভিশৃতি।
- ৭। ধ্বনি পরিবর্তনের যে যে বিধানে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।
 কপাট, জেলে, বৌদি, আলাদা।
- ৮। কৃধনীর মধ্য থেকে ঠিক সূত্রটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
 (অপিনিহিতি, ধ্বনি-বিপর্যয়, স্বরধ্বনি লোপ, স্বরাগম, অভিশৃতি, স্বরসজ্ঞাতি, অসমীকরণ, বর্ণিতা)
- (ক) একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য ‘আ’ যুক্ত হলে তাকে বলে.....।
- (খ) শব্দের মধ্যে ই বা উ যথাস্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে বলে.....বলে।
- (গ) শব্দের মধ্যে দুটি সমধ্বনির একটি লোপ হলে তাকে বলে.....।
- (ঘ) জোর দেয়ার জন্য যখন শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির দিক্ত উচ্চারণ হয় তখন তাকে.....বলা হয়।
- (ঙ) সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে.....বলে।
- ৯। নিচের বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির নাম ডান পার্শ্বে লেখ (যেমন – ঘোষ, মহাপ্রাণ, কঠ্য ব্যঞ্জন)।
 ব, শ, ম, দ, খ, প, ঠ, হ, ক্ষ
- ১০। ঠিক উভয়ে টিক (✓) দাও।
 ট – কঠ্যবর্ণ, ম – উষ্ট্যবর্ণ, গ – ঘোষবর্ণ, চ – দন্ত্যবর্ণ, ঘ – অঞ্জপ্রাণ কঠ্যবর্ণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ গৃহ ও ষষ্ঠি বিধান

১. গৃহ বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তত্ত্ব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং সঙ্গ্য-ন-এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রাখিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই গৃহ বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সব সময় মূর্ধন্য ‘ণ’ যুক্ত হয়। যেমন— ঘণ্টা, লঞ্চ, কাণ্ড ইত্যাদি।
২. ঝ, র, ষ- এর পরে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন— ঝণ, তৃণ, বর্ণনা, কারণ, মরণ, ব্যাকরণ, তীরণ, ভাষণ, উষণ ইত্যাদি।
৩. ঝ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি, য য ব হ এবং ক-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী ন মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়। যেমন— কৃপণ (ঝ-কারের পরে পু, তার পরে ণ), হরিপ (র-এর পরে ই, তার পরে ণ, অর্পণ (ঝ + প. + অ+ণ), লক্ষণ (ক + ষ + অ + ণ)। এবুপ— রুম্ভীণী, ব্রাঙ্গণ ইত্যাদি।

৪. কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই ণ হয়

চাণক্য মাণিক্য গণ

বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

কল্যাণ শোণিত মণি

স্থানু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী

নিপুণ তণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।

চিকণ নিকণ তৃণ

কফণি (কলুই) বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত ণ-ত্ত বিধান থাটে না। এবুপ ক্ষেত্রে ন হয়। যেমন— ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্মীতি, দুর্নাম, দুর্নির্বার, পরনিল্বদা, অগ্রনায়ক। ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন কথনো ণ হয় না, ন হয়। যেমন— অন্ত, প্রান্ত, ক্রমদন।

২. ষ-ত্তি বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তত্ত্বব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যে-সব তৎসম শব্দে ‘ষ’ রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ‘ষ’-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষত্তি বিধান বলে।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

১. অ, আ ডিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন— ভবিষ্যৎ (ভ + অ + ষ + ই +) এখানে ষ-এর পরে ই-এর ব্যবধান), মুর্মু, চক্রুচান, টিকীরা ইত্যাদি।
২. ই-কারান্ত এবং ট-কারান্ত উপসর্গের পর কতগুলো ধাতুতে ‘ষ’ হয়। যেমন— অভিসেক > অভিষেক, সুসুন্ত > সুমুন্ত, অনুসঞ্জা > অনুষঞ্জা, প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, প্রতিস্থান > প্রতিষ্ঠান, অনুস্থান > অনুষ্ঠান, বিসম > বিষম, সুসমা > সুষমা ইত্যাদি।
৩. ‘ঝ’ কারের পর ‘ষ’ হয়। যেমন— ঝাষি, কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি।
৪. তৎসম শব্দে ‘র’-এর পর ‘ষ’ হয়। যেমন— বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।
৫. র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ডিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে ‘ষ’ হয়। যথা : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যথা পুরস্কার।
৬. ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে ‘ষ’ যুক্ত হয়। যথা : কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ট, ওষ্ট ইত্যাদি।
৭. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই ‘ষ’ হয়। যেমন— ষড়ুঞ্জু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, উষা, গৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ষষ্ঠি, ষড়ুঞ্জু, ভূষণ, দেষ ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

- ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে ষ হয় না। এ সম্বলেখ সতর্ক হতে হবে। যেমন— জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট ইত্যাদি।
- খ. সংস্কৃত ‘সাং’ প্রত্যয়যুক্ত পদেও ষ হয় না। যেমন— অগ্নিসাং, ধূলিসাং, ভূমিসাং ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। গত্ত বিধান ও যত্ত বিধান বলতে কী বোঝ ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ২। সমাসবদ্ধ পদে গত্ত বিধানের নিয়ম খাটে না, এমন শাচটি উদাহরণ দাও।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :
 (ক) ট, ঠ, ড এবং ঢ বর্ণের পূর্বে ‘ন’ যুক্ত হলে সর্বদাই ন হয়।
 যেমন.....(৫টি)
 (খ) অ, আ ভিন্ন স্বরধ্বনি এবং ক ও র—এর পরে প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।
 যেমন.....(৫টি)
 (গ) বিদেশি ও দেশি শব্দের বানানে ষ হয় না।
 যেমন.....(৫টি)
- ৪। নিচের শব্দগুলো শুন্ধ করে লেখ :
 লবন, নশ্ট, পুরষকার, সুসম, আনুসঞ্জিক, ষ্টেশন, পোষাক, জার্মাণ, কুরআণ, দুর্ণাম।
- ৫। যে বানানটি ঠিক তার নিচে দাগ দাও :
 (ক) কৃপণ, তৃন, ঘটা, বর্ণ, হারিন, লাবণ্য, কনিকা, বণিক, কৃশক, উৎকৃষ্ট, কাষ্ট, শুশমা, অনুসঙ্গ,
 বিষ, সরিয়া, পোষ্ট।
- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (খ) আবার / আবাঢ় / আশাঢ়
পাশান্ত / পাষান্ত, পাস্ত
তোষণ / তোশন / তোসণ
প্রতিষ্ঠান / প্রতিষ্ঠাণ / প্রতিষ্ঠান
মিলন / মিলণ | কণিকা / কনিকা
লবণ / লবন
দৰ্গন / দৰ্গণ
কল্যাণ / কল্যান
গুণী / গুনী |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্বিধি

সংজ্ঞা

সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সম্বিধি। যেমন— আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (।) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (।) হয়েছে। আবার, তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে, এখানে ত + ম = ন্ম হয়েছে।

সম্বিধির উদ্দেশ্য

(ক) সম্বিধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং (খ) ধ্বনিগত মাধ্যম সম্পাদন। যেমন— ‘আশা’ ও ‘অতীত’ উচ্চারণে যে আয়াস প্রয়োজন, ‘আশাতীত’ তার চেয়ে অল্প আয়াসে উচ্চারিত হয়। সেরূপ ‘হিম আলয়’ বলতে যেরূপ শোনা যায়, ‘হিমালয়’ তার চেয়ে সহজে উচ্চারিত এবং শুভিমধুর। তাই যে ক্ষেত্রে আয়াসের লাঘব হয় কিন্তু ধ্বনি-মাধ্যম রক্ষিত হয় না, সে ক্ষেত্রে সম্বিধি করার নিয়ম নেই। যেমন— কচু + আদা + আলু = কচাদালু হয় না। অথবা কচু + আলু + আদা = কচাদাদা হয় না।

আমরা প্রথমে খাঁটি বালা শব্দের সম্বিধি ও পরে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের সম্বিধি সম্বলেখ আলোচনা করব। উক্তেখ্য, তৎসম সম্বিধি মূলত বর্ণ সংযোগের নিয়ম।

বালা শব্দের সম্বিধি

বালা সম্বিধি দুই রকমের : স্বরসম্বিধি ও বাঞ্জনসম্বিধি।

১. স্বরসম্বিধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সম্বিধি হয় তাকে স্বরসম্বিধি বলে।

১. সম্বিধিতে দুটি সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন—

(ক) অ + এ = এ (অ লোপ), যেমন — শত + এক = শতেক। এরূপ — কতেক।

(খ) আ + আ = আ (একটি আ লোপ)। যেমন — শীর্খা + আরি = শীর্খারি। এরূপ — রূপা + আলি = রূপালি।

(গ) আ + উ = উ (আ লোপ)। যেমন — মিথ্যা + উক = মিথ্যক। এরূপ — হিংসুক, নিষ্ঠুক ইত্যাদি।

(ঘ) ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন — কুড়ি + এক = কুড়িক। এরূপ — ধনিক, গুটিক ইত্যাদি।

আশি + এর = আশির (এ লোপ)। এরূপ — নদীর (নদী + এর)।

২. কোনো কোনো স্থলে পাশাপাশি দুটি স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন — যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই।

এখানে (আ+ই) এর মধ্যে ই লোপ পেয়েছে।

২। ব্যঞ্জন সম্বিধ

স্বরে আর ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সম্বিধ হয় তাকে ব্যঞ্জন সম্বিধ বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জন সম্বিধ সমীক্ষণ (Assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্যরীতিতে সীমাবদ্ধ।

১. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটি মিলে ঘোষ ধ্বনি দিত্ব হয়। অর্থাৎ সম্বিধতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি ও ঘোষ হয়। যেমন – ছেট + দা = ছোড়দা।
২. হলস্ত রং (বল্দ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে রং লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দিত্ব হয়। যেমন – আর + না = আন্না, চার + টি = চাটি, ধূর + না = ধূনা, দুর + ছাই = দুছাই ইত্যাদি।
৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দিত্ব হয়। যেমন – নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত + জ. = জ্জ), বদ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাছানি ইত্যাদি।
৪. ‘প’-এর পরে ‘চ’ এবং ‘স’-এর পরে ‘ত’ এলে চ ও ত এর স্থলে শ হয়। যেমন – পীচ + শ = পীশ্ৰ। সাত + শ = সাশ্ৰ, পীচ + সিকা = পীশুশিকা।
৫. হলস্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি মুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন – বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক।
৬. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন – কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সম্বিধ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এসব শব্দই তৎসম (তৎ = তার + সম = সমান)। তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। এ শ্রেণির শব্দের সম্বিধ সংস্কৃত ভাষার নিয়মেই সম্পাদিত হয়ে এসেছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সম্বিধ তিনি প্রকার : (১) স্বরসম্বিধ (২) ব্যঞ্জন সম্বিধ (৩) বিসর্গ সম্বিধ।

১. স্বরসম্বিধ

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসম্বিধ।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে মুক্ত হয়। যেমন-

অ + অ = আ নর+ অধম = নরাধম। এরূপ-হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ হিম + আলয় = হিমালয়। এরূপ - দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

আ + অ = আ যথা + অর্থ = যথাৰ্থ। এরূপ - আশাতীত, কথামৃত, মহার্থ ইত্যাদি।

আ + আ = আ বিদ্যা+ আলয় = বিদ্যালয়। এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

২. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + ই = এ শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।

আ + ই = এ যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।

অ + ঈ = এ পরম + ঈশ = পরমেশ।

আ + ঈ = এ মহা + ঈশ = মহেশ।

এরূপ—পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, দ্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + উ = ও সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও গজ্জা + ঊর্মি = গজ্জোর্মি।

এরূপ—নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঝ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং তা রেফ (‘) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন—

অ + ঝ = অর দেব + ঝাপি = দেবার্পি।

আ + ঝ = অর মহা + ঝাপি = মহার্পি।

এরূপ—অধর্মৰ্ণ, উত্তমৰ্ণ, সম্মতৰ্মি, রাজ্ঞৰ্মি ইত্যাদি।

৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ‘ঝাত’-শব্দ থাকলে (অ, আ+ঝ) উভয় মিলে ‘আর’ হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন—

অ + ঝাত = আর শীত + ঝাত = শীতার্ত।

আ + ঝাত = আর তৃষ্ণা + ঝাত = তৃষ্ণার্ত।

এরূপ—ভয়ার্ত, ক্ষুধার্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

অ + এ = ঐ জন + এক = জনৈক।

আ + এ = ঐ সদা + এব = সদৈব।

অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মৌলক্য।

আ + ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

এরূপ—হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে উ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ও = উ	বন + ওষধি = বনৌষধি।
আ + ও = উ	মহা + ওষধি = মহৌষধি।
অ + উ = উ	পরম + উষধ = পরামৌষধ।
আ + উ = উ	মহা + উষধ = মহৌষধ।

৮. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ই-কার হয়। দীর্ঘ ই-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ	অতি + ইতি = অতীত
ই + ঈ = ঈ	পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
ঈ + ঈ = ঈ	সতী + ঈশ্বর = সতীশ্বর।
ঈ + ঈ = ঈ	সতী + ঈশ = সতীশ।

এরূপ— গিরীশ্বর, ক্ষিতীশ, মহীশুর, শ্রীশ, পৃথীশ, অতীব, প্রতীক্ষা, প্রতীত, রবীশ্বর, দিল্লীশ্বর ইত্যাদি।

৯. ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ স্থানে ‘য’ বা য(j) ফলা হয়। য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সাথে লেখা হয়। যেমন—

ই + অ = য + অ	অতি + অন্ত = অত্যান্ত।
ই + আ = য + আ	ইতি + আদি = ইত্যাদি।
ই + উ = য + উ	অতি + উক্তি = অত্যুক্তি।
ই + ট = য + ট	প্রতি + উষ = প্রত্যুষ।
ঈ + আ = য + আ	মসী + আধার = মস্যাধার।
ঈ + এ = য + এ	প্রতি + এক = প্রত্যেক।
ঈ + অ = য + অ	নদী + অশ্ব = নদ্যশ্ব।

এরূপ— প্রত্যহ, অত্যধিক, গত্যগত, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, অভ্যাস, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যপকার ইত্যাদি।

১০. উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে উ-কার হয়; উ-কার পূর্ববর্তী ব্যঙ্গন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন—

উ + উ = উ	মরু + উদ্যান = মরুদ্যান।
উ + উ = উ	বহু + উর্ধ্ব = বহুর্ধ্ব।
উ + উ = উ	বধু + উৎসব = বধুৎসব।
উ + উ = উ	ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার ও উ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা উ স্থানে ব-ফলা হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-

উ + অ = ব + অ	সু + অঞ্জ = স্বঞ্জ ।
উ + আ = ব + আ	সু + আগত = স্বাগত ।
উ + ই = ব + ই	অনু + ইত = অন্বিত ।
উ + ঈ = ব + ঈ	তনু + ঈত = তন্বী ।
উ + এ = ব + এ	অনু + এষণ = অন্বেষণ ।

এরূপ- পশ্চিম, পশ্চাত্তর, অব্যয়, মৃত্তুর ইত্যাদি।

১২. ঝ-কারের পর ঝি ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ‘ঝ’ স্থানে ‘র’ হয় এবং তা র-ফলা রূপে পূর্ববর্তী ব্যঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন - পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, উ-কারের পর এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, উ স্থানে যথাক্রমে অব্য ও আব্য হয়। যেমন-

এ + অ = অয় + অ	নে + অন = নয়ন । শে + অন = শয়ন ।
ঐ + অ = আয় + অ	নৈ + অক = নায়ক । গৈ + অক = গায়ক ।
ও + অ = অব্য + অ	পো + অন = পবন । লো + অন = লবণ ।
উ + অ = আব্য + অ	পৌ + অক = পাবক ।
ও + আ = অব্য + আ	গো + আদি = গবাদি ।
ও + এ = অব্য + এ	গো + এষণা = গবেষণা ।
ও + ই = অব্য + ই	পো + ইত্র = পবিত্র ।
উ + ই = আব্য + ই	নৌ + ইক = নাবিক ।
উ + উ = আব্য + উ	তৌ + উক = ভাবুক ।

১৪. কতগুলো সমিখ কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যথা - কুল + অটা = কুলাটা (কুলাটা নয়), গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়), প্র + উচ্চ = প্রৌচ্ছ (প্রৌচ্ছ নয়), অন্য + অন্য = অন্যান্য, মার্ত + অঙ্গ = মার্তঙ্গ, শুল্দ + উদন = শুল্দোদন।

২. ব্যঙ্গনসমিখ

স্বরে-ব্যঙ্গনে, ব্যঙ্গনে-স্বরে ও ব্যঙ্গনে-ব্যঙ্গনে যে সমিখ হয় তাকে ব্যঙ্গন সমিখ বলে। এদিক থেকে ব্যঙ্গন সমিখকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. ব্যঙ্গনধ্বনি + স্বরধ্বনি ২. স্বরধ্বনি + ব্যঙ্গনধ্বনি ৩. ব্যঙ্গনধ্বনি + ব্যঙ্গনধ্বনি।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক, চ, ট, ত্, প্-এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্ (ড়), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন—

ক + অ = গ	দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।
চ + অ = জ	গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত।
ট্ + আ = ড্	ষট্ + আনন = ষড়ানন।
ত্ + অ = দ	তৎ + অবধি = তদবধি।
প্ + অ = ব	সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদানন্দ, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদিন্দ্র ইত্যাদি।

২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দিত্ব (ছ) হয়। যথা—

অ + ছ = ছ	এক + ছত্র = একছত্র।
আ + ছ = ছ	কথা + ছলে = কথাছলে।
ই + ছ = ছ	পরি + ছদ = পরিছদ।

এরূপ — মুখছবি, বিছেদ, পরিছেদ, বিছিন্ন, অজাছেদ, আলোকছটা, প্রতিছবি, প্রছদ, আজ্বাদন, বৃক্ষছায়া, ব্রহ্মছদে, অনুছেদ ইত্যাদি।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

(ক) ১. ত্ ও দ্-এর পর চ্ ও ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যেমন—

ত্ + চ = ক্	সৎ + চিত্তা = সচিত্তা।
ত্ + ছ = ক্	উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্ + চ = ক্	বিপদ + চয় = বিপচয়।
দ্ + ছ = ক্	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।

এরূপ — উচ্চারণ, শরচন্দ্র, সচরিত্র, তচ্ছবি ইত্যাদি।

২. ত্ ও দ্-এরপর জ্ ও ব্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে জ্ হয়। যেমন—

ত্ + জ = জ্	সৎ + জন = সজ্জন।
দ্ + জ = জ্	বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
ত্ + ব্ = ব্	কৃৎ + বাটিকা = কুঞ্জিকা।

এরূপ — উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

৩. ত্ ও দ্-এরপর শ্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে চ এবং শ্-এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন-

ত্ + শ = চ + ছ = ছ
উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস
এরূপ - চলছত্তি, উচ্ছুল ইত্যাদি।

৪. ত্ ও দ্-এর পর ড থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড হয়। যেমন-

ত্ + ড = ডড
উৎ + ডীন = উড়ীন।
এরূপ - বৃহড়চৰা।

৫. ত্ ও দ্ এর পর হ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থলে দ এবং হ এর স্থলে ধ হয়। যেমন-

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ
উৎ + হার = উদ্ধার।
দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ
পদ্ + হতি = পদ্ধতি।
এরূপ - উদ্ধৃত, উদ্ধৃত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৬. ত্ ও দ্ এর পর ল থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন-

ত্ + ল = ল্ল
উৎ + লাস = উল্লাস।
এরূপ - উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লজ্জন ইত্যাদি।

(খ) ১. ব্যঙ্গন ধ্বনিসমূহের যে কোনো বর্গের অযোগ্য ধ্বনির পর যে কোনো বর্গের ঘোষ অয়প্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কিংবা ঘোষ অয়প্রাণ তালব্য ধ্বনি, (য > জ), ঘোষ অয়প্রাণ ওষ্ঠ ধ্বনি (ব), ঘোষ কশ্চনজাত দস্তমূলীয় ধ্বনি (র) কিংবা ঘোষ অয়প্রাণ ওষ্ঠ্য ব্যঙ্গনধ্বনি (ব) থাকলে প্রথম অযোগ্য অয়প্রাণ ধ্বনি ঘোষ অয়প্রাণরূপে উচ্চারিত হয়। যথা :

ক্ + দ = গ্ + দ	বাক্ + দান = বাগদান।
ট্ + য = ড্ + য	ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।
ত্ + ঘ = দ্ + ঘ	উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন।
ত্ + য = দ্ + য	উৎ + যোগ = উদ্যোগ।
ত্ + ব = দ্ + ব	উৎ + বন্ধন = উদ্বন্ধন।
ত্ + র = দ্ + র	তৎ + রূপ = তদ্রূপ।

এরূপ - দিঙ্গিজয়, উদ্যম, উদ্গার, উদ্গিরণ, উদ্বৰ, বাগজাল, সদ্গুরু, বাগদেবী ইত্যাদি।

২. ঙ, এও, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অযোগ্য অয়প্রাণ স্পর্শধ্বনি সেই কৰ্ণায় ঘোষ স্পর্শধ্বনি কিংবা নাসিকাধ্বনি হয়। যথা :

ক্ + ন = গঙ + ন	দিক্ + নির্ণয় = দিগ্নির্ণয় বা দিঙ্গনির্ণয়।
ত্ + ম = দ/ন+ ম	তৎ + মধ্যে = তদ্মধ্যে বা তন্মধ্যে।

৩. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, কৰ্ণীয় ঘোষ অঞ্চলাগ ও ঘোষ মহাপ্রাণ নাসিক্যধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ-এর সম্বিধ হলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন-

নিঃ + আকার = নিরাকার, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ, দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ – নিরাকারণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লভ, দুরণ্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম : ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের সঙ্গে 'র' এর সম্বিধ হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী ত্রুট্য স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন – নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

৪. বিসর্গের পর অঘোষ অঞ্চলাগ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অঞ্চলাগ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি হয়, অঘোষ অঞ্চলাগ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি হয়। যেমন-

ঃ + চ / ছ = শ + চ / ছ

নিঃ + চয় = নিচয়, শিরঃ + ছেদ = শিরশেদ।

ঃ + ট / ঠ = ষ + ট / ঠ

ধনুঃ + টজ্জ্বার = ধনুষ্টজ্জ্বার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।

ঃ + ত / থ = স + ত / থ

দুঃ + তর = দুস্তর, দুঃ + থ = দুষ্থ।

৫. অঘোষ অঞ্চলাগ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কষ্ট্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = সু + ক

নমঃ + কার = নমস্কার।

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + থ = সু + থ

পদঃ + খলন = পদমখলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক

নিঃ + কর = নিষ্ঠকর।

উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = ষ + ক

দুঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ – পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্কল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

৬. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্বিধ বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল, মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

৭. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তথ = নিঃস্তথ কিংবা নিস্তথ। দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুষ্থ। নিঃ + স্পদ = নিঃস্পদ কিংবা নিস্পদ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সম্বিধ উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি, ভাঃ + কর = ভাস্কর, অহঃ + নিশ = অহর্নিশ, অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অনুশীলনী

- ১। সম্মিলিত কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় সম্মিলিত প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ কর।
- ২। সম্মিলিত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের একটি করে উদাহরণ দাও।
- ৩। নিচের সূত্রগুলো অনুসরণে তিনটি করে উদাহরণ দাও।
 - (ক) মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।
 - (খ) চ ও ঝ-এর পরে নাসিকাধ্বনি তালব্য এও হয়।
 - (গ) অ-কার তিনি অন্য স্বর পরে থাকলে বিসর্গের স্থলে র হয়।
- ৪। সম্মিলিত কর

উদ্ধত, বনস্পতি, বারেক, আদ্যত, সম্মাট, ভবন, নয়ন, উজ্জ্বল, অব্রেষণ, সন্তান, নীরোগ, প্রাতরাশ
- ৫। সম্মিলিত কর

অতি + উদয়, নিঃ + চিহ্ন, চলৎ + শক্তি, যাবৎ + জীবন, ষষ্ঠি + থ, চিৎ + ময়, খানি + এক, অতঃ + এব, দিক্ + মডল।
- ৬। কোনটি শুধু নির্দেশ কর
 - ক. স্বরে স্বরে যে সম্মিলিত হয় তাকে ব্যঞ্জনসম্মিলিত বলে / স্বরে আর ব্যঞ্জনে যে সম্মিলিত হয় তাকে স্বরসম্মিলিত বলে/ ব্যঞ্জনে আর স্বরে যে সম্মিলিত হয় তাকে ব্যঞ্জন সম্মিলিত বলে।
 - খ. ব্যঞ্জন সম্মিলিত এক / দুই/ তিন রকমের।
 - গ. স্বরসম্মিলিত ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনে হয় / স্বরে স্বরে হয়।

লক্ষণীয় : এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঙ্গনই বেশি প্রচলিত। যেমন – বাক্ত + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এরূপ-উম্মমন, উন্মুত, চিন্ময় ইত্যাদি।

৩. ম-এর পর যে কোনো বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম- ধ্বনিটি সেই বর্গের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন—

ম + ক = ঙ + ক শম + কা = শঙ্কা।

ম + চ = এঞ্চ + চ সম + চয় = সঞ্চয়।

ম + ত = ন + ত সম + তাপ = সন্তাপ।

এরূপ – কিম্ভৃত, সম্মর্দন, কিলুর, সম্মান, সম্মুখান, সম্ম্যাস ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : আধুনিক বাংলায় ম-এর পর কঠ্য-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে ম স্থানে প্রায়ই ঙ না হয়ে অনুস্বার (ঁ) হয়।

যেমন— সম + গত = সংগত, অহম + কার = অহকার, সম + খ্যা = সংখ্যা।

এরূপ – সংকীর্ণ, সংগীত, সংগঠন, সংস্থাত ইত্যাদি।

৪. ম-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিলো শ, ষ, স, হ থাকলে, ম স্থলে অনুস্বার (ঁ) হয়। যেমন—

সম + যম = সহ্যম, সম + বাদ = সংবাদ, সম + রঞ্জণ = সংরঞ্জণ,

সম + জাপ = সংজ্ঞাপ সম + শয় = সংশয় সম + সার = সংসার,

সম + হার = সংহার।

এরূপ – বারবার, কিলো, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বসেহা, স্বয়ংবরো। **ব্যতিক্রম :** সন্মাট (সম + রাট)।

৫. চ ও জ-এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন –

চ + ন = চ + এঞ্চ, যাচ + না = যাচ্চেঞ্চা, রাজ + নী = রাজ্জী।

জ + ন = জ + এঞ্চ, যজ্ঞ + ন = যজ্ঞ,

৬. দ্য ও ধ-এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, থাকলে দ্য ও ধ স্থলে অঘোষ অরূপাণ ধ্বনি হয়।

যেমন—

দ্য > ত তদ্য + কাল = তৎকাল

ধ > ত ক্ষুধ + পিপাসা = ক্ষুধুপিপাসা।

এরূপ – হৃৎক্রম্প, তৎপর, তন্ম ইত্যাদি।

৭. দ্য কিলো ধ-এর পরে স্ব থাকলে, দ্য ও ধ স্থলে অঘোষ অরূপাণ ধ্বনি হয়। যেমন—

বিপদ্য + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ – তৎসম।

৮. ম-এর পরে ত্ব বা ধ থাকলে, যথাক্রমে ত্ব ও ধ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন—

কৃষ্ণ + তি = কৃষ্টি, যম + ধ = যষ্ট।

৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সম্বিধি

উৎ + স্থান = উথান সম্ + কার = সংস্কার,
সম্ + কৃত = সংস্কৃত, পরি + কার = পরিস্কার।

এরূপ - সংস্কৃতি, পরিস্কৃত ইত্যাদি।

১০. কতগুলো সম্বিধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়

আ+ চর্য = আচর্য,	গো + পদ = গোপদ,	বন + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি,	তৎ + কর = তস্কর,	পর + পর = পরস্পর,
মনস্ত + ঈষা = মনীষা,	ষট্ট + দশ = ষোড়শ	এক + দশ = একাদশ,
পতৎ + অজ্ঞলি = পতঞ্জলি ইত্যাদি।		

৩. বিসর্গ সম্বিধি

সংস্কৃত সম্বিধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত রং ও সূ অনেক ক্ষেত্রে অধোয় উদ্ধৰণি অর্থাৎ হ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ(ঃ) রূপে লেখা হয়। রং ও সূ বিসর্গ ব্যঞ্জনধ্বনিমালার অঙ্গর্গত। সে কারণে বিসর্গ সম্বিধি ব্যঞ্জন সম্বিধির অঙ্গর্গত। বস্তুত বিসর্গ রং এবং সূ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. রং - জাত বিসর্গ ও ২. সূ-জাত বিসর্গ।

১. রং - জাত বিসর্গ : র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র - জাত বিসর্গ। যেমন : অন্তর - অন্তঃ, প্রাতঃ, পুনর - পুনঃ ইত্যাদি।

২. সূ-জাত বিসর্গ : সূ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে সূ-জাত বিসর্গ। যেমন : নমস্ত - নমঃ, পূরস্ত - পূরঃ, শিরস্ত - শিরঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ রং ও সূ-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সম্বিধি হয় তাকে বিসর্গ সম্বিধি বলে। বিসর্গ সম্বিধি দুইভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সম্বিধি

অ-ধ্বনির পরস্থিত (অধোয় উদ্ধৰণি) বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ + ঃ + অ - এ তিনে মিলে ও-কার হয়। যেমন - ততঃ + অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সম্বিধি

১. অ-কারের পরস্থিত সূ-জাত বিসর্গের পর ঘোষ অঞ্চলাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তর্হ য, অন্তর্থ ব, র, ল, হ থাকলে অ-কার ও সূ-জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও-কার হয়। যেমন - তিরঃ + ধান = তিরোধান, মনঃ + রম = মনোরম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

২. অ-কারের পরস্থিত রং-জাত বিসর্গের পর উপর্যুক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। যেমন - অন্তঃ + গত = অন্তর্গত, অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান, পুনঃ + আয় = পুনরায়, পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত, অহঃ + অহ = অহরহ।

এরূপ - পুনর্জন্ম, পুনর্বার, প্রাতৰুথান, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তবর্তী ইত্যাদি।

২. ঈ-প্রত্যয় যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রঞ্জক-রঞ্জকী, কিশোর-কিশোরী, সুদর-সুদরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, মোড়শ-মোড়শী ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা প্রেরিতক : সিংহ-সিংহী, ত্রাঙ্গণ-ত্রাঙ্গণী, মানব-মানবী, বৈষণব-বৈষণবী, কুমার-কুমারী, মহূর-মহূরী ইত্যাদি।

৩. ইকা-প্রত্যয় যোগে

(ক) যেসব শব্দের শেষে ‘অক’ রয়েছে সেসব শব্দে ‘অক’ স্থলে ‘ইকা’ হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রঞ্জক-রঞ্জকী (বাণিয়া) রঞ্জিনী।

(খ) ক্ষন্দার্থে ইকা যোগ হয়। যেমন : নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, শীত-শীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষন্দার্থক প্রত্যয়।)

৪। আনী-যোগ করে : ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতৃল-মাতৃলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ : শূন্ত-শূন্তী (শূন্ত জাতীয় স্ত্রীলোক), শূন্তানী (শূন্তের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

আনী-প্রত্যয় যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন-অরণ্য-অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (জমানো বরফ)।

৫. ঈনী, নী, যোগে : মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহিনী, যোগী-যোগিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দৃঢ়ী-দৃঢ়়খিনী ইত্যাদি।

৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

(ক) যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ‘ত্রী’ হয়। যেমন- নেতৃ-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্তা, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

(খ) পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান, মান, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যথা : সৎ-সতী, মহৎ-মহতী, গুণবান-গুণবতী, বৃপবান-বৃপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী।

(গ) কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন- সম্ভাট-সম্ভাজী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতী, শুশুর-শাশুড়ি, নর-নারী, কম্বু-বাল্বুবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ : খান-খানম, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা।

নিয়ত স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতীন, অর্ধাজিনী, কুলাটা, বিধবা, অসূর্যমশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপ্তন্তী ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য

- (ক) কতগুলো বাংলা শব্দে পুরুষ ও স্ত্রী দু-ই বোঝায়। যেমন— জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু ইত্যাদি।
- (খ) কতগুলো শব্দে কেবল পুরুষ বোঝায়। যেমন—কবিরাজ, চাকী, কৃতদার, অকৃতদার ইত্যাদি।
- (গ) কতগুলো শব্দ শুধু স্ত্রীবাচক হয়। যেমন— সতীন, সত্মা, সধবা ইত্যাদি।
- (ঘ) কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যথা— দেবর-নন্দ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং ভাবী (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষিয়ত্বী (শিক্ষিকা) (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকগত্তী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুগত্তী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী)।
- (ঙ) বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ-সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে-সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো-মেজ খুড়ি ইত্যাদি।
- (চ) বিধেয় বিশেষণ অর্থাত বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন— মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে (পাগল হয়ে গেছে হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির (অস্থিরা হবে না)।
- (ছ) কুল-উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ) ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (গত্তী অর্থে)।

অনুশীলনী

- ১। পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝ ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
 - ২। বাংলা শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
 - ৩। বাংলায় আগত তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায় ?
 - ৪। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের পাঁচটি উদাহরণ দাও।
 - ৫। শুল্ক কর : বিধবা স্ত্রী, বেগমা
 - ৬। পার্থক্য নির্ধারণ কর
দিদি-বৌদি, শিক্ষিকা-শিক্ষিয়ত্বী, আচার্য-আচার্যানী, শূদ্রা-শূদ্রানী
 - ৭। ঠিক উভয়ে টিক (✓) দাও।
- (ক) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ— মা, কন্যা, ছাত্রী, বালিকা, বোন/বিমাতা, বিধবা, বন্ধ্যা, ডাইনী;
- (খ) নিত্য পুরুষবাচক শব্দ— বাবা, দাদা, হরিণ, পতি, শিশু/চাকী, কবিরাজ, কৃতদার;
- (গ) সংস্কৃত নী প্রত্যয়— মাতুলানী/ইনি প্রত্যয়—মায়াবিনী।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচেদ
শব্দ প্রকরণ
পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

সব ভাষায় লিঙ্গাত্ত্বে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে।

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনোটিতে পুরুষ ও কোনোটিতে স্ত্রী বোঝায়। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষবাচক শব্দ আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমন : বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে- কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে পুরুষবাচক শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ। তৎসম পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে পুরুষবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত এবং স্ত্রীবাচক বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। যেমন – বিদ্যান লোক এবং বিদ্যুষী নারী। এখানে ‘লোক’ পুরুষবাচক বিশেষ্য এবং ‘নারী’ স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। ‘বিদ্যান’ পুরুষবাচক বিশেষণ এবং ‘বিদ্যুষী’ স্ত্রীবাচক বিশেষণ। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সংকৃত ব্যাকরণের এ নিয়ম মানা হয় না। যেমন- সংকৃতে ‘সুন্দর বালক ও সুন্দরী বালিকা’ বাংলায় ‘সুন্দর বালক ও সুন্দর বালিকা’।

বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

- ১। বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত
১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে এবং ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীজাতীয় অর্থে।
১. পতি ও পত্নীবাচক অর্থে : আবা-আমা, চাচা-চাচী, কাকা-কাকী, জেঠা-জেঠী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, নন্দাই-নন্দ, দেওর-জা, ভাই-ভাবী/বৈদি, বাবা-মা, মামা-মামী ইত্যাদি।
২. সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে : খোকা-খুকী, পাগল-পাগলী, বামন-বামনী, তেড়া-তেড়ী, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা, দেওর-নন্দ।

২। বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ই, নি, নী, আনী, ইনী, ন।

১. ই-প্রত্যয় : বেঞ্জমা-বেঞ্জমী, ভাগনা/ভাগনে-ভাগনী।
২. নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনী, জেলে-জেলেনী, কুমার-কুমারনী, ধোপা-ধোপানী, মঙ্গুর-মঙ্গুরনী ইত্যাদি।
৩. পুরুষবাচক শব্দের শেষে ই থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী হয় এবং আগের ই ই হয়। যেমন : ডিখারি-ডিখারিনী, অভিসারী-অভিসারিনী।

৪. আনী-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরানী, নাপিত-নাপিতানী, মেথর-মেথরানী, চাকর-চাকরানী ইত্যাদি।

৫. ইনী-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনী, গোয়ালা-গোয়ালিনী, বাঘ-বাঘিনী ইত্যাদি।

উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরুন / ঠাকুরানী।

আইন-প্রত্যয় : নতুন নতুন প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন : ঠাকুর-ঠাকুরাইন।

দ্রষ্টব্য : বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের পরে আবার স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—অভাগা-অভাগী/অভাগিনী, ননদাই-ননদিনী/ননদী ইত্যাদি।

৩। নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ

কতগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন— সতীন, সত্মা, এয়ো, দাই, সধবা ইত্যাদি।

৪। কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদী, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন— নর / মদ্দা / ঝুলো বিড়ুল-মেনি বিড়ুল; মদ্দা হাস-মাদী হাস; মদ্দা ঘোড়া-মাদী ঘোড়া; পুরুষ লোক-মেয়েলোক / স্ত্রীলোক; বেটাছেলে-মেয়েছেলে; পুরুষ কয়েদী-স্ত্রী / মেয়ে কয়েদী; এড়ে বাছুর-বকনা বাছুর; বলদ গুৱু-গাই গুৱু ইত্যাদি।

৫। কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ প্রয়োগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন— কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার-মহিলা ডাক্তার, সভ্য-মহিলা সভ্য, কর্মী-মহিলা কর্মী, শিল্পী-মহিলা বা নারী শিল্পী, সৈন্য-নারী / মহিলা সৈন্য, পুলিশ-মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

৬। কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোন-পো-বোন-ঝি, ঠাকুর-পো-ঠাকুর-ঝি, ঠাকুর দাদা / ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, গয়লা-গয়লা-বউ, জেলে-জেলে বউ ইত্যাদি।

৭। অনেক সময় আলাদা আলাদা শব্দে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক বোঝায়। যেমন : বাবা-মা, ভাই-বোন, কর্তা-গিনী, ছেলে-মেয়ে, সাহেব-বিবি, জামাই-মেয়ে, বর-কনে, দুলহা-দুলহিন/দুলহিন, বেয়াই-বেয়াইন, তাঁ-মাঁ, বাদশা-বেগম, শুক-সারী ইত্যাদি।

সংকৃত স্ত্রী প্রত্যয়

তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ই, আনী, নী, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন—

১. আ-যোগে

(ক) সাধারণ অর্থে : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃন্দ-বৃন্দা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মঙ্গিন-মঙ্গিনা ইত্যাদি।

(খ) জাতি বা শ্রেণিবাচক : অজ-অজা, কেৱিল-কেৱিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূন্য-শূন্যা ইত্যাদি।

ଦିତୀୟ ପରିଚେଦ

ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ

ଦିରୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଦୁଇର ଉକ୍ତ ହେଲେ ଏମନ । ବାହା ଭାଷାଯ କୋଣୋ କୋଣୋ ଶବ୍ଦ, ପଦ ବା ଅନୁକାର ଶବ୍ଦ, ଏକବାର ବ୍ୟବହାର କରଲେ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଗୁଲୋ ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାର କରଲେ ଅନ୍ୟ କୋଣୋ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏ ଧରନେର ଶବ୍ଦର ପରିପର ଦୁଇବାର ପ୍ରଯୋଗେଇ ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ । ଯେମନ— ‘ଆମାର ଜ୍ଵର ଜ୍ଵର ଲାଗଛେ ।’ ଅର୍ଥାଂ ଠିକ ଜ୍ଵର ନାହିଁ, ଜ୍ଵରର ଭାବ ଅର୍ଥେ ଏହି ପ୍ରଯୋଗ ।

ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ନାନା ରକମ ହାତେ ପାରେ :

(କ) ଶବ୍ଦର ଦିରୁକ୍ତି

1. ଏକଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇବାର ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଦୁଟି ଅବିକୃତ ଥାକେ । ସଥା— ତାଳୋ ତାଳୋ ଫଳ, ଫୌଟା ଫୌଟା ପାନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଇତ୍ୟାଦି ।
2. ଏକଇ ଶବ୍ଦର ସଙ୍ଗେ ସମାର୍ଥକ ଆର ଏକଟି ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସଥା— ଧନ-ମୌଳିତ, ଖେଳ-ଖୁଲା, ଲାଲନ-ପାଲନ, ବଳା-କୁଳା, ଘୋଜ-ଖବର ଇତ୍ୟାଦି ।
3. ଦିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ-ଜୋଡ଼ାର ଦିତୀୟ ଶବ୍ଦଟିର ଆଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଯେମନ— ମିଟ-ମାଟ, ଫିଟ-ଫାଟ, ବକା-ବକା, ତୋଡ଼-ଜୋଡ଼, ଗର୍ଭ-ସଙ୍ଗ, ରକମ-ସକମ ଇତ୍ୟାଦି ।
4. ସମାର୍ଥକ ବା ବିପରীତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ । ଯେମନ— ଲେନ-ଦେନ, ଦେନା-ପାଓନା, ଟାକା-ପଯସା, ଧନୀ-ଗରିବ, ଆସା-ଯାଓଯା ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଘ) ପଦେର ଦିରୁକ୍ତି

1. ଦୁଟି ପଦେ ଏକଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୋଗ କରା ହୁଏ, ଶବ୍ଦ ଦୁଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାକେ । ଯେମନ— ଘରେ ଘରେ ଲେଖାପଡ଼ା ହେବେ । ଦେଶେ ଦେଶେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତେ ଲାଗଲ । ମନେ ମନେ ଆମିଓ ଏ କଥାଇ ଭେବେଛି ।
2. ଦିତୀୟ ପଦେର ଆଧିକ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ପଦ-ବିଭିନ୍ନ ଅବିକୃତ ଥାକେ । ଯେମନ— ଚୋର ହାତେ ନାତେ ଧରା ପଡ଼େଛେ । ଆମାର ସଞ୍ଜାନ ଯେନ ଥାକେ ଦୂର୍ଧ୍ଵ ଭାତେ ।

ପଦେର ଦିରୁକ୍ତିର ପ୍ରଯୋଗ

(କ) ବିଶେଷ ଶବ୍ଦଯୁଗଳେର ବିଶେଷଗ୍ରୂପେ ବ୍ୟବହାର

1. ଆଧିକ୍ୟ ବୋକାତେ : ରାଶି ରାଶି ଧନ, ଧାମା ଧାମା ଧାନ ।
2. ସାମାନ୍ୟ ବୋକାତେ : ଆମି ଆଜ ଜ୍ଵର ଜ୍ଵର ବୋଧ କରାଇ ।
3. ପରିସରତା ବା ଧାରାବାହିକତା ବୋକାତେ : ଭୂମି ଦିନ ଦିନ ରୋଗା ହେଲେ ଯାଇଁ । ଭୂମି ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହେଟେ ଚାନ୍ଦା ତୁଲେଛ ।
4. କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣ : ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ, ଫିରେ ଫିରେ ଚାଯ ।
5. ଅନୁରୂପ କିନ୍ତୁ ବୋକାତେ : ତାର ସଜ୍ଜୀ ସାଧୀ କେଉ ନେଇ ।
6. ଆଗର ବୋକାତେ : ଓ ଦାଦା ଦାଦା ବଲେ କୌଦାରେ ।

(খ) বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার

১. অধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
২. তীক্ষ্ণতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।
৩. সামান্যতা বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব; কালো কালো চেহারা।

(গ) সর্বনাম শব্দ

- বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এলো? কেউ কেউ বলে।

(ঘ) ক্রিয়াবচক শব্দ

১. বিশেষণ রূপে : এদিকে রোপীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
২. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।
৩. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। যুমিয়ে যুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
৪. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

(ঙ) অব্যয়ের দ্বিতীয়

১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গঞ্জে উঠল।
৩. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা : কির কির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

যুগ্মারীতিতে দ্বিতীয় শব্দের গঠন

একই শব্দ ইষৎ পরিবর্তন করে দ্বিতীয় শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মারীতি। যুগ্মারীতিতে দ্বিতীয় গঠনের কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। যেমন—

১. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিঙ্গুরি।
২. শব্দের অন্তস্বরের পরিবর্তন করে : মারামারি, হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।
৩. দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ, ভাতটাত।
৪. সমার্থক বা একার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।
৫. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।
৬. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : ছোট-বড়, আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

পদাত্মক বিবৃতি

বিভিন্নিযুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে পদাত্মক বিবৃতি বলা হয়। এগুলো দুই রকমে গঠিত হয়। যেমন—

১. একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুইবার ব্যবহার। যথা— ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ।
২. যুগ্মীভিত্তে গঠিত দ্বিতীয় পদের ব্যবহার। যথা— হাতে নাতে, আকাশে—বাতাসে, কাপড়—চোপড়, দলে—বলে ইত্যাদি।

বিশিষ্টার্থক বাগধারায় বিবৃতি শব্দের প্রয়োগ

ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ফুলগুলো তুই আনের বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

ঝাচার ঝাঁকে ঝাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে যায়।

ধ্বন্যাত্মক বিবৃতি

কোনো কিছুর স্বাভাবিক বা কাজনিক অনুকূলিতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুইবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক বিবৃতি। ধ্বন্যাত্মক বিবৃতি দ্বারা বহুত, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়। ধ্বন্যাত্মক দ্বিতীয় শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়। যেমন—

১. মানুষের ধ্বনির অনুকার : ভেট ভেট — মানুষের উচ্চস্বরের কানুর ধ্বনি। এরূপ —ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
২. জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার : ঘেট ঘেট (কুকুরের ধ্বনি)। এরূপ—মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুকু কুকু (কোকিলের ডাক), কা কা (কাকের ডাক) ইত্যাদি।
৩. বস্তুর ধ্বনির অনুকার : ঘাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এরূপ—মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) বামবাম (বৃক্ষ পড়ার শব্দ), কু কু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।
৪. অনুভূতিজ্ঞাত কাজনিক ধ্বনির অনুকার : খিকিমিকি (ওজ্জ্বল্য)। এরূপ—ঠা ঠা (রোদের তীক্ষ্ণতা), কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি)। অনুরূপভাবে— মিন মিন, পিট পিট, বি বি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বিবৃতি গঠন

১. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ : ধক ধক, বান বান, পট পট।
২. প্রথম শব্দটির শেষে আ যোগ করে : গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।
৩. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে ই যোগ করে : ধরাধরি, বামবামি, বনবানি।

৪. যুগ্মীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিটির মিটির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃক্ষ পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোঁথাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।
৫. আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিক্ষেত্রে গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখলে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

বিভিন্ন পদবূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্রের ব্যবহার

১. বিশেষ্য : বৃক্ষির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।
২. বিশেষণ : ‘নামিল নতে বাদল ছলছল বেদনায়।’
৩. ক্রিয়া : ফলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
৪. ক্রিয়া বিশেষণ : ‘চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।’

অনুশীলনী

- ১। দ্বিক্ষেত্র বলতে কী বোঝায়? বাংলা ভাষায় দ্বিক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?
- ২। বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে দ্বিক্ষেত্র সাধিত হয়?
- ৩। দ্বিক্ষেত্রের সাধনের তিনটি উপায় উদাহরণসহ লেখ।
- ৪। পাঁচটি করে উদাহরণ দাও
 - (ক) বিপরীতার্থক যুগ্মীতি
 - (খ) সহচর যুগ্মীতি
 - (গ) ধ্বন্যাত্মক যুগ্মীতি
- ৫। অর্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও

কানে কানে, ধনে জনে, আকারে প্রকারে, দেশে বিদেশে, রাতে দিনে, তেলে বেগুনে, ঘর সংসার, ধ্যান ধারণা, চলনে বলনে।
- ৬। সঠিক উত্তরটি লিখে দাও

ক. অনুভূতিজ্ঞাত ধন্যাত্মক দ্বিক্ষেত্র	: ঝমঝম/বিমবিম
খ. অনুকার অব্যয়ের দ্বিক্ষেত্র	: হয় না/হয়
গ. বিশেষ্য দ্বিক্ষেত্র	: ভালোয় ভালোয়/উঁচায় নিচায়
ঘ. ক্রিয়া দ্বিক্ষেত্র	: যায় যায়/ইঁচি ইঁচি
ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিক্ষেত্র	: ধীরে ধীরে/উড়ু উড়ু

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা সংখ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক ‘এক’। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার

১. অঙ্কবাচক, ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক, ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক।

১. অঙ্কবাচক সংখ্যা

‘তিন টাকা’ বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। আমাদের একক হলো ‘এক’। সুতরাং এক + এক + এক = তিন।

এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে বলা হয় দশ গুগোন্তর পদ্ধতি।

এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুগোন্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের প্রতিটি ‘দশ’কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চাঁচিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সপ্তাশ (৭০), আশি (৮০), নববই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)।

এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক = এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলে বলি দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক = একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ - তিন দশ + এক = একত্রিশ, চার দশ + এক = একচাঁচিশ ইত্যাদি।

২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা

একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন— সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) = সপ্তাহ। এখানে দিন একটি একক। এরূপ—সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ।

পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ = এক। যেমন— একেকে এক (অর্থাৎ $1 \times 1 = 1$), এরকম—দুয়েকে দুই, সাতেকে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ = দ্বিগুণ বা দুগুণ। যেমন— দুই দু গুণে চার ($2 \times 2 = 4$)।

অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ ($5 \times 2 = 10$), সাত দু গুণে চৌদ্দ ($7 \times 2 = 14$)। তিন গুণ = তিরিকে। যেমন—
তিন তিরিকে নয় ($3 \times 3 = 9$)।

চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন— তিন চারে বা চৌকা বার ($3 \times 4 = 12$)

পাঁচ গুণ = পাঁচা। যেমন— পাঁচ শীঢ়া পীচিশ ($5 \times 5 = 25$)।

ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন— তিন ছয়ে আঠার ($3 \times 6 = 18$)।

সাত গুণ = সাতা। যেমন— তিন সাতা একুশ ($3 \times 7 = 21$)

আট গুণ = আটা। যেমন— তিন আটা (বা তে আটা) চারিশ ($3 \times 8 = 24$)।

নয় গুণ = নং বা নয়। যেমন— তিন নং (বা তিন নয়) সাতাশ ($3 \times 9 = 27$)।

দশ গুণ = দশৎ বা দশ। যেমন— তিন দশৎ (বা তিন দশে) ত্রিশ ($3 \times 10 = 30$)।

বিশ গুণ = বিশৎ বা বিশ। যেমন— তিন বিশৎ (বা তিন বিশ) ষাট ($3 \times 20 = 60$)।

ত্রিশ গুণ = ত্রিশৎ বা ত্রিশ। যেমন— তিন ত্রিশৎ (বা তিন ত্রিশ) নববই ($3 \times 30 = 90$)।

এরূপ— চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সম্ভৱ, আশি, নববই, বা শ’—এর পূর্ণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক ‘সংখ্যা শব্দ’

(ক) ন্যূন

এক এককের চার ভাগের এক ভাগ ($\frac{1}{4}$) = চৌথা, সিকি বা পোয়া।

” ” তিন ভাগের ” ” ($\frac{1}{3}$) = তেহাই।

” ” দুই ভাগের ” ” ($\frac{1}{2}$) = অর্ধ বা আধা।

” ” আট ভাগের ” ” ($\frac{1}{8}$) = আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাশ।

তেমনি— এক পঞ্চাশ ($\frac{1}{5}$), এক দশমাশ ($\frac{1}{10}$) ইত্যাদি। এ সবের আরও ভাঙতি হলে, যেমন— চার ভাগের তিন ($\frac{3}{4}$) = তিন চতুর্থাশ। আট ভাগের তিন ($\frac{3}{8}$) = তিন অষ্টমাশ ইত্যাদি। এক এককের ($\frac{3}{8}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। যেমন— পৌনে তিন = ($2 \frac{3}{8}$), পৌনে ছয় = ($5 \frac{3}{8}$) ইত্যাদি।

পৌনে অর্ধ পোয়া অশ্ব বা এক চতুর্থাশ ($\frac{1}{8}$) কম। অর্ধাং পৌনে = ($1 - \frac{1}{8}$) = $\frac{7}{8}$ ।

সওয়া = $1 \frac{1}{8}$ (সওয়া বা সোয়া এক)

দেড় = $1 \frac{1}{2}$ = $\frac{3}{2}$ কম ২।

আড়াই = $2 \frac{1}{2}$ = $\frac{5}{2}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বত্র ‘সাড়ে’ বলা হয়। যেমন— $3 \frac{1}{2}$ = সাড়ে তিন, $4 \frac{1}{2}$ = সাড়ে চার ইত্যাদি।

৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা প্রণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূর্ণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন— দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় ‘প্রথম’ এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এরূপ— তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন—পঞ্চা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো।

<u>অঙ্ক বা সংখ্যা</u>	<u>গণনাবাচক</u>	<u>পূরণবাচক</u>	<u>তারিখবাচক</u>
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিনি	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চোরা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠি	ছটই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগার	একাদশ	এগারই
১২	বার	দ্বাদশ	বারই
১৩	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
১৯	উনিশ	উনবিংশ	উনিশে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে

অনুশীলনী

- অঙ্কবাচক ও ক্রমবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
 - ১ থেকে ২০ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক রূপ দেখাও।
 - নিচের শব্দগুলোকে সংখ্যা শব্দে দেখাও:
- চৌথা, নবম, ত্রয়োদশ, ষোড়শ, আড়াই, পৌনে চার, সওয়া তিনি, একবিংশ, উনবিংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বচন

‘বচন’ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বলে বচন। বাল্লা ভাষায় বচন দুই প্রকার : একবচন ও বহুবচন।

একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে। যেমন – সে এগো। মেয়েটি স্কুলে যাইয়নি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন : তারা গেল। মেয়েরা এখনও আসেনি।

কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গুরুটা, বাছুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি।

বাল্লায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রতৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, কৃদ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রতৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন-

(ক) রা-কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা’ বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- ছাত্রো খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।

যে ধরনের শব্দে ‘রা’ যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় ‘এরা’ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মেয়েরা বিয়েরা একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন – ‘পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিসায় পিপীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়।’ কাকেরা এক বিরাট সভা করল।

(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – অতগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে? আমগুলো টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। ময়ূরগুলো পুছ নাড়িয়ে নাচছে।

(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

গণ	-	দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি।
কৃদ	-	সুধীকৃদ, ভক্তকৃদ, শিক্ষককৃদ ইত্যাদি।
মন্তব্লী	-	শিক্ষকমন্তব্লী, সম্পাদকমন্তব্লী ইত্যাদি।
বর্গ	-	পদ্ধিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।

(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ

- | | | |
|------|---|----------------------------------------------|
| কূল | - | কবিকূল, পঞ্চিকূল, মাতৃকূল, বৃক্ষকূল ইত্যাদি। |
| সকল | - | পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি। |
| সব | - | ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি। |
| সমূহ | - | বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি। |

(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ

আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঁজি, মালা, রাজি, রাশি। যেমন—গ্রন্থাগারে রঞ্জিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘকুঁজ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : পাল ও যুথ শব্দ দুটি কেবল জন্মুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন — রাখাল গুরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
হাতিযুথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।

বহুবচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

- (ক) বিশেষ শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন — সিংহ বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বোঝায়)। পোকার আকৃমণে ফসল নষ্ট হয় (বহুবচন)। বাজারে লোক জমেছে (বহুবচন)। বাগানে ফুল ফুটেছে (বহুবচন)।
- (খ) একবচনাত্মক বিশেষের আগে অজন্ত, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, চের ইত্যাদি বহুবোধক শব্দ বিশেষ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন— অজন্ত লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা, বহু মেহমান, নানা কথা, চের খরচ, অল্পে টাকা পয়সা ইত্যাদি।
- (গ) অনেক সময় বিশেষ ও বিশেষ পদের দ্বি- প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন — হাড়ি হাড়ি সদেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। শাল শাল ফুল।
- (ঘ) বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ — মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না। সকলে সব জানে না।

- (ঙ) কতিপয় বিদেশি শব্দে, সে ভাষার অনুসরণে বহুবচন হয়। যেমন — আন যোগে : বুজুর্গ-বুজুর্গান, সাহেব-সাহেবান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাত সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাটি বালা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের — এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব — এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

একইসঙ্গে দুইবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন — সব মানুষই অথবা মানুষ অথবা মানুষেরা মরণশীল (শুল্ক)। সকল মানুষেরাই মরণশীল (ভুল)।

অনুশীলনী

- ১। বচন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় বচন কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। বাংলা ভাষায় বহুবচন প্রকাশের উপায় কী কী? দশটি বহুবচনবোধক শব্দের উদাহরণ দিয়ে তোমার বক্তব্য পরিষ্কার কর।
- ৩। প্রাপ্তিবাচক, অপ্রাপ্তিবাচক ও উন্নত প্রাপ্তিবাচক শব্দে যেসব বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ ও প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তার তিনটি করে উদাহরণ দাও।
- ৪। বিশেষ নিয়মে বহুবচন গঠনের কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ কর।
- ৫। ভুল থাকলে শুন্ধ কর।
আমাদের স্কুলের সকল ছাত্ররাই আজ সভায় উপস্থিত। সব গবুজগেরা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে।
প্রতিটি গ্রামে গ্রামে এ খবর দিয়ে দাও। ভাইগণ, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন।
- ৬। ক. ডান দিক থেকে যথাযোগ্য শব্দটি এনে বাঁ দিকের শিরোনামের ডানে বসাও।
একবচন – ছাত্র, মা, তোমরা, পাখিগুলো, গুরু, দেশ
বহুবচন – শোকেরা, তাদের, ধনী, গরিব, বেড়াল।
খ. ডান দিক থেকে বহুবচনবোধক শব্দ / শব্দাংশ নিয়ে বাঁ দিকের শব্দে যোগ কর
কৃম, ফল, ভাই, দোকান, সাধু | গুলা, রা, এরা
কলম, স্যার, মাথা, কাপড়, বই

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদাশ্রিত নির্দেশক

কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। বালায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The'-এর স্থানীয়। বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।

- (ক) একবচনে – টা, টি, খানা, খানি, গাছ, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন – টাকাটা, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, লাঠিগাছ, চুড়িগাছি ইত্যাদি।
- (খ) বহুবচনে – গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন – মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

১. (ক) 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি, যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- তিনটি টাকা, দশটি বছর।
- (খ) নির্বর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন-সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ।
- (গ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন – খটি যেন কার তৈরি? এটা নয় শটা আন। সেইচেই ছিল আমার শ্রিয় কলম।
২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন- গোটা দেশই ছারখার হয়ে গেছে। গোটাদুই কমলালেৰু আছে (অনির্দিষ্ট)। দুখানা কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। গোটাসাতেক আম এনো। একখানা বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।
কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।'
৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন - পোয়াটাক দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। সবচুক্র ওষুধই খেয়ে ফেলো (নির্দিষ্টতা)।
৪. বিশেষ অর্থে, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ : তা, পাটি ইত্যাদি। যেমন-
তা : দশ তা কাগজ দাও।
পাটি : আমার একপাটি জুতো ছিড়ে গেছে।

অনুশীলনী

- ১। পদান্তিরিত নির্দেশক কাকে বলে? বচনভেদে পদান্তিরিত নির্দেশকদের কী রূপভেদ হয়?
- ২। টি, টা, খানা, খানি – এ চারটি পদান্তিরিত নির্দেশকের প্রয়োগ দোখিয়ে বাক্য রচনা কর।
- ৩। শূন্যস্থান পূরণ কর
..... পাঠেক,
..... টি,
মুখ
দুধ
- ৪। শুন্ধ কর
দুখানি নয় চারখানি নয়, একগোটা ছেলে আমার। মুখ কিতা টুকুকুকে লাল। দেশখানির নামটুকুন কী?
দশগোটা বেজেছে।
- ৫। ভুল থাকলে শুন্ধ করে লেখ
(ক) টা, টি, খানা, খানি - বহু বচনে ব্যবহৃত হয়।
(খ) রা, এরা, গুলি, গুলা - এক বচনে ব্যবহৃত হয়।
(গ) টুকু, টুকুন - স্বত্ত্বাতে ব্যবহৃত হয়।
(ঘ) তা, পাঠি - শব্দের আগে বসে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাস

সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ। অর্থসম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। যেমন : দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। সমাসের রীতি সহকৃত থেকে বালায় এসেছে। তবে খাটি বালা সমাসের দৃষ্টান্তও প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলোতে সহকৃতের নিয়ম খাটে না।

সমাসের প্রক্রিয়ায় সমাসবদ্ধ বা সমাসনিষ্কা঳্প পদটির নাম সমস্ত পদ।

সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটির অন্তর্গত পদগুলোকে সমস্যমান পদ বলে।

সমাসযুক্ত পদের প্রথম অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় পূর্বপদ এবং পরবর্তী অংশ (শব্দ)-কে বলা হয় উত্তরপদ বা পরপদ।

সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয়, তার নাম সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিশ্ববাক্য। উদাহরণ-বিলাত-ফেরত রাজকুমার সিংহাসনে বসলেন। এখানে বিলাত-ফেরত, রাজকুমার ও সিংহাসন – এ তিনটিই সমাসবদ্ধ পদ। এগুলোর গঠন প্রক্রিয়া ও রকম – বিলাত হতে ফেরত, রাজা-কুমার, সিংহ চিহ্নিত আসন – এগুলো হচ্ছে ব্যাসবাক্য। এসব ব্যাসবাক্যে ‘বিলাত’, ‘ফেরত’, ‘রাজা’, ‘কুমার’, ‘সিংহ’, ‘আসন’ হচ্ছে এক একটি সমস্যমান পদ। আর বিলাত-ফেরত, রাজকুমার এবং সিংহাসন সমস্ত পদ। বিলাত, রাজা ও সিংহ হচ্ছে পূর্বপদ এবং ফেরত, কুমার ও আসন হচ্ছে পরপদ।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার : দ্঵ন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরূষ, বহুবীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস।

[দ্বিগু সমাসকে অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ কর্মধারয়কেও তৎপুরূষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছেন। এদিক থেকে সমাস মূলত চারটি : দ্বন্দ্ব, তৎপুরূষ, বহুবীহি, অব্যয়ীভাব। কিন্তু সাধারণভাবে ছয়টি সমাসেরই আলোচনা করা গেল। এছাড়া, প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলোরও আলোচনা করা হয়েছে।]

১. দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন – তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রাখিত হয়েছে।

দৃষ্টি সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্মত বোঝানোর জন্য ব্যাসবাকেয়ে এবং , ও, আর – এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন – মাতা ও পিতা = মাতাপিতা।

দৃষ্টি সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, ছিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, মাথা-মুঞ্চ, নাক-মুখ ইত্যাদি।
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতের, উনিশ-বিশ ইত্যাদি।
৬. সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোঢ়া-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর ইত্যাদি।
৮. দুটি সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে ইত্যাদি।
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া ইত্যাদি।
১০. দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঞ্জিতে ইত্যাদি।
১১. দুটি বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া ইত্যাদি।

অঙ্গুক দৃষ্টি : যে দৃষ্টি সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অঙ্গুক দৃষ্টি বলে। যেমন – দুধে-ভাতে, জলে-স্তলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

* তিনি বা বহু পদে দৃষ্টি সমাস হলে তাকে বহুপদী দৃষ্টি সমাস বলে। যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

২. কর্মধারয় সমাস

যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন – নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম। শান্ত অথচ শিষ্ট = শান্তশিষ্ট। কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

১. দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালো। যেমন – যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর।
২. দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা ক্ষতুকে বোঝালো। যেমন – যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

৩. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃত্তি বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন – আগে ধোয়া
পরে মোছা= ধোয়ামোছা।
৪. পূর্বপদে সঞ্চারাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষ বাচক হয়। যেমন – সুন্দরী যে
লতা = সুন্দরলতা, মহাতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি।
৫. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, ‘মহৎ’ ও ‘মহান’ স্থানে ‘মহা’ হয়। যেমন – মহৎ
যে জ্ঞান= মহাজ্ঞান, মহান যে নবি = মহানবি।
৬. পূর্বপদে ‘কু’ বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে ‘কু’ স্থানে ‘কৎ’ হয়। যেমন
– কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার।
৭. পরপদে ‘রাজা’ শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে ‘রাজ’ হয়। যেমন – মহান যে রাজা = মহারাজ।
৮. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে
যায়। যেমন – সিদ্ধ যে আঙু = আঙুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাধম।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

- কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকার – মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত ও বৃপক কর্মধারয় সমাস।
১. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী
কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, সাহিত্য বিষয়ক সভা= সাহিত্যসভা, মৃতি
রক্ষার্থে সৌধ= মৃতিসৌধ।
 ২. উপমান কর্মধারয় : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে
প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও
উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমন – ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে ভ্রমর উপমান
এবং কেশ উপমেয়। কৃষ্ণ হলো সাধারণ ধর্ম। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়,
তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যথা – তুষারের ন্যায় শূভ্র = তুষারশূভ্র, অরুণের ন্যায় রাঙ্গা = অরুণরাঙ্গা।
 ৩. উপমিত কর্মধারয় : সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে
উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে (এ ক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়) এ সমাসে উপমেয় পদটি
পূর্বে বসে। যেমন – মুখ চন্দের ন্যায় = চন্দ্রমুখ। পুরুষ সিংহের ন্যায় = সিংহপুরুষ।
 ৪. বৃপক কর্মধারয় : উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা করনা করা হলে বৃপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে
উপমেয় পদ পূর্বে বসে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে ‘বৃপ’ অথবা ‘ই’ যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন
করা হয়। যেমন- ক্রোধ বৃপ অনল =ক্রোধানল, বিষাদ বৃপ সিদ্ধু = বিষাদসিদ্ধু, মন বৃপ মাবি= মনমাবি।
 - আরও কয়েক ধরনের কর্মধারয় সমাস রয়েছে। কখনো কখনো সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উপসর্গ আগে
বসে পরপদের সাথে কর্মধারয় সমাস গঠন করতে পারে। যেমন – অব্যায় : কুকৰ্ম, যথাযোগ্য। সর্বনাম :
সেকাল, একাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : একজন, দোতলা। উপসর্গ : বিকাল, সকাল, বিদেশ, বেসুর।

৩. তৎপুরুষ সমাস

পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।

তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদে দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত যে কোনো বিভক্তি থাকতে পারে; আর পূর্বপদের বিভক্তি অনুসারে এদের নামকরণ হয়। যেমন – বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি ‘কে’ লোপ পেয়েছে বলে এর নাম দ্বিতীয়া তৎপুরুষ।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ্চ, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস।

১. দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, ক্র) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, পরলোকে গত = পরলোকগত।

ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুরী = চিরসুরী। এরকম : গা-ঢাকা, রথদেখা, বীজবোনা, ভাতরাধা, ছেলে-ভুলানো (ছড়া), নভেল-পড়া ইত্যাদি।

২. তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (ঘারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, শ্রম ঘারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ, মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা।

উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উভরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : এক ঘারা উন = একোন, বিদ্যা ঘারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান ঘারা শূন্য = জ্ঞানশূন্য, পৌঁছ ঘারা কম = পৌঁছ কম।

উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা : স্বর্ণ ঘারা মণিত = স্বর্ণমণিত। এবুগ-হীরকখচিত, চন্দনচর্চিত, রত্নশোভিত ইত্যাদি।

৩. চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা – গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি, আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা, বসতের নিমিত্ত বাড়ি= বসতবাড়ি, বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা ইত্যাদি। এবুগ-ছাত্রাবাস, ডাকমাশুল, চোষকাগজ, শিশুমজল, মুসাফিরখানা, হস্তযাত্রা, মালগুদাম, রান্নাঘর, মাপকাঠি, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

৪. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে ইত্যাদি) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা – খাচা থেকে ছাড়া = খাচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত ইত্যাদি।

সাধারণত চৃত, আগত, তীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উন্নীর্ণ, পালানো, অষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে মুক্ত হলে পদ্ধতিমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো, জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত ইত্যাদি। এ রকম জেলখালাস, বৌটাখসা, আগাগোড়া, শাপমুক্ত, ঝঁঁগমুক্ত ইত্যাদি।

কোনো কোনো সময় পদ্ধতিমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাকে এর ‘চেয়ে’ ইত্যাদি অনুসর্ণের ব্যবহার হয়। যথা— পরাণের চেয়ে প্রিয় = পরাণপ্রিয়।

৫. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে যষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা : চায়ের বাগান = চাবাগান, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।

অনুরূপভাবে – ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, ঘোড়দৌড়, খুশুরবাড়ি, বিড়লছানা ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য

১. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ‘রাজা’ স্থলে ‘রাজ’, পিতা, মাতা, আতা স্থলে যথাক্রমে ‘পিতৃ’, ‘মাতৃ’, ‘আতৃ’ হয়। যেমন গজনীর রাজা = গজনীরাজ, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, আতার রেহ = আতৃরেহ, পুত্রের বধু=পুত্রবধু ইত্যাদি।
 ২. পরপদে সহ, তুল্য, নিত, প্রায়, সহ, প্রতিম – এসব শব্দ থাকলেও যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন – পত্নীর সহ=পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম / সোদরপ্রতিম ইত্যাদি।
 ৩. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যথা— অহের (দিনের) পূর্বতাগ = পূর্বাহ।
 ৪. পরপদে রাজি, গ্রাম, কৃদ, গণ, যুথ প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা— ছাত্রের কৃদ =ছাত্রকৃদ, গুণের গ্রাম=গুণগ্রাম, হস্তীর যুথ = হস্তীযুথ ইত্যাদি।
 ৫. অর্ধ শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন – পথের অর্ধ= অর্ধগথ, দিনের অর্ধ=অর্ধদিন।
 ৬. শিশু, দুর্গ ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পূর্বপদ পুরুষবাচক হয়। যেমন – মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুর্গ = ছাগদুর্গ ইত্যাদি।
 ৭. ব্যাসবাকে ‘রাজা’ শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন – পথের রাজা = রাজপথ, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস।
- অল্পক যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, হাতের পাঁচ, মামার বাড়ি, সাপের পা, মনের মানুষ, কলের গান ইত্যাদি। বিক্রি, আতার পুত্র = আতুক্ষুত্র (নিপাতনে সিদ্ধ)।
৬. সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সম্মতমী বিভক্তি (এ, য, তে) লোপ হয়ে যে সমাস হয় তাকে সম্মতমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গাছে পাকা = গাছপাকা, দিবায় নিন্দা = দিবানিন্দা। এবং – বাকপটু, গোলাভরা, তালকানা, অকালমৃত্যু, বিশ্ববিদ্যালয়, তোজনপটু, দানবীর, বাঙ্গবন্দি, বস্তাপচা, রাতকানা, মনমরা ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাকে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন – পূর্বে
ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে অশুত = অশুতপূর্ব, পূর্বে অদ্যষ্ট = অদ্যষ্টপূর্ব।

৭. নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস : না বাচক নঞ্চ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা— ন আচার = অনাচার, ন কাতর = অকাতর। এরূপ – অনাদৰ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, অভাব, বেতাল ইত্যাদি।

ঈটি বাংলায় অ, আ, না কিন্বা অনা হয়। যেমন – ন কাল = অকাল বা আকাল। তদূপ- আধোয়া, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, অচেনা, আলুনি, নাছোড়, অনাবাদী, নাবালক ইত্যাদি।

না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ অর্থে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে। যথা—

অভাব	-	ন	বিশ্বাস	=	অবিশ্বাস (বিশ্বাসের অভাব)।
তিন্মতা	-	ন	লৌকিক	=	অলৌকিক।
অল্পতা	-	ন	কেশা	=	অকেশা।
বিরোধ	-	ন	সুর	=	অসুর।
অপ্রশস্ত	-	ন	কাল	=	অকাল
মন্দ	-	ন	ঘাট	=	অঘাট।

এরূপ – অমানুষ, অসঙ্গত, অস্ত্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।

৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাস : যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ-প্রত্যয় যুক্ত হয় সে পদকে উপপদ
বলে। কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন – জলে
চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ, পক্ষে জন্মে যা = পক্ষজ্ঞ। এরূপ – গৃহস্থ, সত্যবাদী, ইন্দ্রজিৎ,
ছেলেধরা, ধারাধরা, পকেটমার, পাতাচাটা, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা,
গলাকাটা, পা-চাটা, পাঢ়াবেড়ানি, ছা-পোষা ইত্যাদি।

৯. অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক
তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া। এরূপ-ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান, গুরু
গাঢ়ি ইত্যাদি।

প্রক্ষেপ্য : গায়ে-হলুদ, হাতেখড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা
খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুবীহি সমাস।

৪. বহুবীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুবীহি সমাস
বলে। যথা— বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুবীহি। এখানে ‘বহু’ কিন্বা ‘ব্রীহি’ কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য
নেই, যার বহু ধান আছে এমন গোককে বোঝাচ্ছে।

বহুবীহি সমাসে সাধারণত যার, যাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যাসবাক্যগুলো ব্যবহৃত হয়। যথা : আয়ত লোচন যার = আয়তলোচন (স্ত্রী), মহান আআ যার = মহাআ, স্বচ্ছ সঙ্গিন যার = স্বচ্ছসঙ্গিনা, নীল বসন যার = নীলবসনা, স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ধীর বৃদ্ধি যার = ধীরবৃদ্ধি।

‘সহ’ কিংবা ‘সহিত’ শব্দের সঙ্গে অন্য পদের বহুবীহি সমাস হলে ‘সহ’ ও ‘সহিত’ এর স্থলে ‘স’ হয়। যেমন : বাস্তবসহ বর্তমান = সবাস্তব, সহ উদর যার = সহোদর > সোদর। এরূপ – সজল, সফল, সদর্প, সলজ্জ, সকল্যাণ ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে পরপদে মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে ‘ক’ যুক্ত হয়। যেমন : নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক, বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক। এরূপ – সম্মৌক, অপুত্রক ইত্যাদি।

বহুবীহি সমাসে সমস্ত পদে ‘অক্ষ’ শব্দের স্থলে ‘অক্ষ’ এবং ‘নান্তি’ শব্দ স্থলে ‘নান্ত’ হয়। যেমন : কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ, পদ্ম নান্তিতে যার = পদ্মনান্ত। এরূপ – উর্ণনান্ত।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘জায়া’ শব্দ স্থানে ‘জানি’ হয় এবং পূর্বপদের কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন : যুবতী জায়া যার = যুবজানি (যুবতী স্থলে ‘যুব’ এবং ‘জায়া’ স্থলে জানি হয়েছে)।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘চূড়া’ শব্দ সমস্ত পদে ‘চূড়’ এবং ‘কর্ম’ শব্দ সমস্ত পদে ‘কর্মা’ হয়। যেমন : চন্দ্ৰ চূড়া যার = চন্দ্ৰচূড়, বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা।

বহুবীহি সমাসে ‘সমান’ শব্দের স্থানে ‘স’ এবং ‘সহ’ হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর।

বহুবীহি সমাসে পরপদে ‘গুরু’ শব্দ স্থানে ‘গুল্ম’ বা ‘গুৰু’ হয়। যথা : সুগুল্ম যার = সুগুল্ম, পদ্মের ন্যায় গুরু যার = পদ্মগুল্মিক, মৎস্যের ন্যায় গুরু যার = মৎস্যগুল্ম।

বহুবীহি সমাসের প্রকারভেদ

বহুবীহি সমাস আট প্রকার : সমানাধিকরণ, ব্যাধিকরণ, ব্যতিহার, নঞ্চ, মধ্যপদগোপী, প্রত্যয়ান্ত, অঙ্গু ও সংখ্যাবাচক বহুবীহি।

১. সমানাধিকরণ বহুবীহি

পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : হত হয়েছে শ্রী যার = হতশ্রী, খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ। এরকম : হৃতসর্বব, উচ্চশির, পীতাম্বর, নীলকণ্ঠ, জবরদস্তি, সুশীল, সুশ্রী, বদবৃত্ত, কমবৃত্ত ইত্যাদি।

২. ব্যাধিকরণ বহুবীহি

বহুবীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তবে তাকে বলে ব্যাধিকরণ বহুবীহি। যথা : আশীতে (দীতে) বিষ যার = আশীবিষ, কথা সর্বব যার = কথাসর্বব।

পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যাধিকরণ বহুবীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দু কানকাটা, বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা। অনুরূপভাবে – ছা-পোষা, পা-চাটা, পাতা-চাটা, পাতাছেড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।

৩. ব্যতিহার বহুবীহি

ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুবীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উভরপদে ‘ই’ মুক্ত হয়। যথা : হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা = কানাকানি। এমনি তাবে –চুলাচুলি, কাঢ়াকড়ি, গালাগালি, দেখাদেখি, কোলাকুলি, লাঠালাঠি, হাসাহাসি, গুটাগুটি, ঘৃষাঘৃষি ইত্যাদি।

৪. নঞ্চ বহুবীহি

বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্চ (না অর্থবোধক) অব্যয় যোগ করে বহুবীহি সমাস করা হলে তাকে নঞ্চ বহুবীহি বলে। নঞ্চ বহুবীহি সমাসে সাধিত পদটি বিশেষণ হয়। যেমন : ন (নাই) জান যার = অজ্ঞান, বে (নাই) হেড যার = বেহেড, না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার। নি (নাই) ভুল যার = নির্ভুল, না (নয়) জানা যা = নাজানা, অজানা ইত্যাদি। এরকম–নাহক, নিরূপায়, নির্বিপ্রাট, অবুঝ, অকেজো, বে-পরোয়া, বেঁশ, অনস্ত, বেতার ইত্যাদি।

৫. মধ্যপদলোগী বহুবীহি

বহুবীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোগ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোগী বহুবীহি বলে। যেমন : বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর = বিড়ালচোখী, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। এমনি তাবে – গায়ে হলুদ, মেনিমুখো ইত্যাদি।

৬. প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি

যে বহুবীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় মুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুবীহি। যথা— এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখ (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও), নিঃ (নেই) খরচ যার = নি–খরচে (খরচ+এ)। এরকম –দোটানা, দোমনা, একগুয়ে, অকেজো, একঘরে, দোলা, দোতলা, উন্পৌজুরে ইত্যাদি।

৭. অলুক বহুবীহি

যে বহুবীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুবীহি বলে। অলুক বহুবীহি সমাসে সমস্ত পদটি বিশেষণ হয়। যথা : মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি, গলায় গামছা যার = গলায়গামছা (গোকটি)। এরূপ – হাতে–ছড়ি, কানে–কলম, গায়ে–পড়া, হাতে–বেড়ি, মাথায়–ছাতা, মুখে–ভাত, কানে–খাটো ইত্যাদি।

৮. সংখ্যাবাচক বহুবীহি

পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুবীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে ‘আ’, ‘ই’ বা ‘ঈ’ মুক্ত হয়। যথা – দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি, চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা। এরূপ –চারহাতি, তেপায়া ইত্যাদি।

কিস্ত, সে (তিনি) তার (যে যষ্টের) = সেতার (বিশেষ্য)।

৯. নিপাতনে সিঞ্চ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রাহ্মি

দু দিকে অপ যার = দীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্ত, পঞ্চিত হয়েও যে মৃত্যু = পঞ্চিতমৃত্যু ইত্যাদি।

৫. ছিগু সমাস

সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে ছিগু সমাস বলে। ছিগু সমাসে সমাসনিষ্পত্তি পদটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন : তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌরাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = ত্রিমাথা, শত অদ্বৈত সমাহার-শতাঙ্গী, পঞ্চবটোর সমাহার-পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার-ত্রিপদী ইত্যাদি। এরূপ-অস্তথাতু, চতুর্ভুজ, চতুরঙ্গা, ত্রিমোহিনী, তেরনদী, পঞ্চভূত, সাতসমূহ ইত্যাদি।

৬. অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পত্তি সমাসে যদি অব্যয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যবস্বাক্ষটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত শম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় ‘আ’) = আজানুলশ্মিত (বাতু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ।

সামীক্ষ্য (নেকটা), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রত্তি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাসের অব্যয় পদটি কৃত্বনীর মধ্যে দেখানো হলো।

১. সামীক্ষ্য (উপ) : কঠের সমীক্ষ্য = উপকঠ, কুলের সমীক্ষ্য = উপকুল।
২. বিপ্সা (অনু, প্রতি) : দিন দিন = প্রতি দিন, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণে, ক্ষণ ক্ষণ = অনুক্ষণ।
৩. অভাব (নিঃ = নির) : আমিষের অভাব = নিরামিষ, ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা, জলের অভাব=নির্জল, উৎসাহের অভাব = নিরুৎসাহ।
৪. পর্যন্ত (আ) : সমূদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক।
৫. সাদৃশ্য (উপ) : শহরের সদৃশ = উপশহর, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ, বনের সদৃশ = উপবন।
৬. অনতিক্রম্যতা (যথা) : যথাতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, যথায়কে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। এরূপ-যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
৭. অতিক্রান্ত (উৎ) : বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল, শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল।
৮. বিরুদ্ধ (প্রতি) : বিরুদ্ধ বাদ = প্রতিবাদ, বিরুদ্ধ কূল = প্রতিকূল।
৯. পশ্চাত (অনু) : পশ্চাত গমন = অনুগমন, পশ্চাত ধাবন = অনুধাবন।

১০. ইয়ৎ (আ) : ইয়ৎ নত = আনত, ইয়ৎ রক্তিম = আয়ত্তিম।
১১. ক্ষুদ্র অর্থে (উপ) : উপগ্রহ, উপনন্দী।
১২. পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে : পরিপূর্ণ, সমস্পূর্ণ।
(পরি বা সম)
১৩. দূরবর্তী অর্থে (প্ৰ, পৱ) : অক্ষিৰ অগোচৰে = পৱোক্ষ। এৰূপ -প্ৰগতিমহ।
১৪. প্ৰতিনিধি অর্থে (প্ৰতি) : প্ৰতিচ্ছায়া, প্ৰতিচ্ছবি, প্ৰতিবিম্ব।
১৫. প্ৰতিশৃঙ্খলী অর্থে (প্ৰতি) : প্ৰতিপক্ষ, প্ৰতুল্লতৱ।
- উল্লিখিত প্ৰধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্ৰাদি, নিত্য, উপগ্রহ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা কৰা হলো। এসব সমাসেৱ প্ৰচুৱ উদাহৱণ পাওয়া যায় না। এজন্য এগুলোকে অপ্রধান মনে কৰা হয়।
১. প্ৰাদি সমাস : প্ৰ, প্ৰতি, অনু প্ৰভৃতি অব্যয়েৱ সঙ্গে যদি কৃৎ প্ৰত্যয় সাধিত বিশেষ্যেৱ সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্ৰাদি সমাস। যথা : প্ৰ (প্ৰকৃষ্ট) যে বচন = প্ৰবচন। এৰূপ -পৱি (চৰ্তুৰ্দিকে) যে ভৱণ = পৱিভৱণ, অনুত্তে (পচাতে) যে ভাপ = অনুত্তাপ, প্ৰ (প্ৰকৃষ্ট বৃপে) ভাত (আলোকিত) = প্ৰভাত, প্ৰ (প্ৰকৃষ্ট বৃপে) গতি = প্ৰগতি ইত্যাদি।
 ২. নিত্যসমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবন্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যেৱ দৱকার হয় না, তাকে নিত্যসমাস বলে। তদৰ্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোৱ অৰ্থ বিশদ কৰতে হয়। যেমন : অন্য গ্ৰাম = গ্ৰামান্তৰ, কেবল দৰ্শন = দৰ্শনমাত্ৰ, অন্য গৃহ = গৃহান্তৰ, (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বৰ্ণেৱ নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমৱা, দুই এবং নৰবই = বিৱানবই।

অনুশীলনী

১. সমাসেৱ সাহায্যে কীভাৱে নতুন শব্দ গঠিত হয় উদাহৱণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদেৱ এবং বিশেষণ ও বিশেষ্য পদেৱ যে কৰ্মধাৱয় সমাস হয়, উদাহৱণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।
৩. ‘ধৃগু সমাস প্ৰকৃত প্ৰস্তাৱে আলাদা সমাস নয়, এটি কৰ্মধাৱয় সমাসেৱই অনুৰূপ’—আলোচনা কৰে বুঝিয়ে দাও।
৪. উপমান, উপমিত ও বৃপক কৰ্মধাৱয় সমাসেৱ সংজ্ঞা ও উদাহৱণ দাও।
৫. তৎপুৰুষ সমাস কয় প্ৰকাৱ ও কী কী? উদাহৱণ দিয়ে সবগুলো তৎপুৰুষ সমাসেৱ নাম কৰ।
৬. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নিৰ্ণয় কৰ : দৰ্শন, ধানক্ষেত, প্ৰগতি, বেতাৱ, সহশিক্ষা।
৭. মধ্যপদলোগী কৰ্মধাৱয় ও মধ্যপদলোগী বহুবৰ্তীহি সমাস কাকে বলে? উদাহৱণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৮. উদাহরণ দাও

সংখ্যাবাচক শব্দ আগে বসে যে সমাস হয়, অলুক তৎপুরুষ, বহুবীহি সমাসের ‘সহ’ স্থলে ‘স’ হয়, অব্যয় পদ আগে বসে যে সমাস হয়, উপমেয়ের সাথে উপমানের যে সমাস হয়।

৯. ঠিক উন্নৱিতে টিক (✓) দাও

ক. তৎপুরুষ সমাস হয় – পূর্বপদে ছিতীয়াদি বিভক্তি লোপে যে সমাস হয়, সমান বিভক্তি বিশিষ্ট একাধিক বিশেষ্যপদে যে সমাস হয়, পূর্বপদে অব্যয় যোগে যে সমাস হয়।

খ. সমাহার অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সে সমাস হয় তাকে বলে – দৃশ্য / বহুবীহি / অলুক / দ্বিগু সমাস।

গ. উপমান–উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে বলে – নিত্যসমাস / প্রাদি সমাস / কর্মধারয় সমাস।

১০. সমাসবস্থ শব্দ লেখ এবং তান দিক থেকে ঠিক সমাসের নামটি পাশে লেখ—

কাঁচা অথচ মিঠা	: তৎপুরুষ	মা মরেছে যার	: অব্যয়ীভাব
মহান যে নবি	: কর্মধারয়	দশ হাত পরিমাণ যার	: বহুবীহি
দুধে ভাতে	: দৃশ্য	তিন ফলের সমাহার	: দ্বিগু।
বিলাত থেকে ফেরত		 তৎপুরুষ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় এমন কঙগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। এর প্রভাবে শব্দটির কয়েক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন-

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে। এবং
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

ভাষায় ব্যবহৃত এসব অব্যয়সূচক শব্দাংশেরই নাম উপসর্গ। যেমন – ‘কাজ’ একটি শব্দ। এর আগে ‘অ’ অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় ‘অকাজ’ – যার অর্থ নিষ্ঠনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

‘পূর্ণ’ (ভো) শব্দের আগে ‘পরি’ যোগ করায় ‘পরিপূর্ণ’ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ (অর্থে ও আকৃতিতে)। ‘হার’ শব্দের পূর্বে ‘আ’ যুক্ত করে ‘আহার’ (খাওয়া), ‘প্র’ যুক্ত করে ‘প্রহার’ (মারা), ‘বি’ যুক্ত করে ‘বিহার’ (ত্রমণ), ‘পরি’ যোগ করে ‘পরিহার’ (ত্যাগ), ‘উপ’ যোগ করে ‘উপহার’ (পুরস্কার), ‘সম’ যোগ করে ‘সহার’ (বিনাশ) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

এ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা বা নতুন শব্দ সৃজনের ক্ষমতা থাকে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে : বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) এবং বিদেশি উপসর্গ।

১. বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি : অ, অঘা, অঞ্জ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভৱ, রাম, স, সা, সু, হা।

নিচে এদের প্রয়োগ দেখানো হলো।

উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা		উদাহরণ
১. অ	নিষ্ঠিত	অর্থে	অকেজো, অচেনা, অপয়া
-	অভাব	"	অচিন, অজানা, অঈথে
-	ক্রমাগত	"	অবোর, অবোরে

উপসর্গ	অর্থদেয়াতকতা		উদাহরণ
২.	অঘা	বোকা	অর্থে অঘারাম, অঘাচষ্টা
৩.	অজ	নিতান্ত (মন্দ)	অজগাড়াগী, অজমূর্ধ, অজপুরু
৪.	অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি, অনাদর
	—	ছাড়া	অনাছিষ্টি, অনচার
	—	অশুভ	অনামুখো
৫.	আ	অভাব	আকাড়া, আধোয়া, আলুনি
	—	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা, আগাছা
৬.	আড়	বক্তু	আড়চোখে, আড়নয়নে
	—	আধা, প্রায়	আক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা
	—	বিশিষ্ট	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবর), আড়কাঠি
৭.	আন	না	আনকেরা
	—	বিক্ষিপ্ত	আনচান, আনমনা
৮.	আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া, আবডাল
৯.	ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	—	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
১০.	উন (উনা)	কম	উনগাঙ্গুরে, উনিশ
১১.	কদ্	নিষিদ্ধ	কদবেল, কদর্য, কদাকার
১২.	কু	কুৎসিত/অপকর্ম	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসজ্ঞ
১৩.	নি	নাই/নেতি	নিখুত, নিখোঝ, নিলাজ, নিতাজ, নিরেট
১৪.	পাতি	ক্ষম্য	পাতিহাস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকয়ো
১৫.	বি	ভিন্নতা/নাই বা নিন্দনীয়	বির্তুই, বিফল, বিপথ
১৬.	ভর	পূর্ণতা	ভরপেট, ভরসৌধা, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসম্মে
১৭.	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা
১৮.	স	সঙ্গে	সরাজ, সরব, সঠিক, সঙ্গের, সপাট
১৯.	সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা, সাজোয়ান
২০.	সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
২১.	হা	অভাব	হাপিত্যোশ, হাতাতে, হাঘরে

জ্ঞাতব্য : বাংলা উপসর্গ সাধারণত বাংলা শব্দের পূর্বেই যুক্ত হয়ে থাকে।

বাংলা উপসর্গযুক্ত শব্দের বাক্যে প্রয়োগ : ‘আমি অবেলাতে দিলাম পাড়ি আঁটে সায়রে।’ অঘারাম বাস করে অজ পাঢ়াঁগায়ে। ডিক্ষাৰ চাল কাঁড়া আৱ আৰ্কাড়া। আৰ্কাঠার নায়ে দিলাম কাঁঠালেৰ গলুই। ‘মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভৱে।’ ইতিহাস কথা কয়। উনাভাতে দুনা বল। নিনাইয়াৰ শতেক নাও। তৱ দুপুৱে কোথায় যাও? এতদিন কোথায় নির্বোজ হয়েছিলে?

২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ

বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ হুবহু এসে গেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত উপসর্গও তৎসম শব্দের আগে বসে শব্দের নতুন রূপে অর্থের সংকোচন সম্প্রসারণ করে থাকে।

তৎসম উপসর্গ বিশিষ্টি : প্ৰ, পৱা, অপ, সম, নি, অনু, অৰ, নিৱ, দূৱ, বি, অধি, সু, উৎ, পৱি, প্ৰতি, অতি, অপি, অভি, উৎ, আ।

বাংলা উপসর্গ যেমন বাংলা শব্দের আগে বসে, তেমনি তৎসম উপসর্গ তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের আগে বসে। বাংলা উপসর্গের মধ্যে আ, সু, বি, নি- এ চারটি উপসর্গ তৎসম শব্দেও পাওয়া যায়। বাংলা ও সংস্কৃত উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে শব্দটিৰ সঙ্গে উপসর্গ যুক্ত হয়, সে শব্দটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা, আৱ সে শব্দটি তৎসম হলে সে উপসর্গটিও তৎসম হয়। যেমন –আকাশ, সুনজৱ, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও বাংলা। আৱ আকষ্ট, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ ও নিদাঘ তৎসম শব্দ। কাজেই এসব শব্দের উপসর্গ আ, সু, বি, নি-ও তৎসম উপসর্গ।

নিচে বিশিষ্ট তৎসম উপসর্গের উদাহৰণ দেওয়া হলো

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		তৎসম
১.	প্ৰ	প্ৰকৃষ্ট/সম্যক	অর্থে	প্ৰভাৱ, প্ৰচলন, প্ৰস্ফুটিত
	-	খ্যাতি	"	প্ৰসিদ্ধ, প্ৰতাপ, প্ৰভাৱ
	-	আধিক্য	"	প্ৰগাঢ়, প্ৰচাৱ, প্ৰবল, প্ৰসাৱ
	-	গতি	"	প্ৰবেশ, প্ৰস্থান
	-	ধাৰা-পৱল্পৰা বা অনুগামিত	"	প্ৰপৌত্ৰ, প্ৰশাৰা,
২.	পৱা	আতিশয়	"	পৱাকষ্টা, পৱাহাত্ত, পৱায়ণ
	-	বিপৱীত	"	পৱাজ্য, পৱাভাৱ
৩.	অপ	বিপৱীত	"	অপমান, অপকাৱ, অপচয়, অপবাদ
	-	নিকৃষ্ট	"	অপসংস্কৃতি, অপকৰ্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	-	স্থানান্তৰ	"	অপসাৱণ, অপহৱণ, অপনোদন
	-	বিকৃত	"	অপমৃত্যু

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
৪.	সম-	সম্যক রূপে	অর্থে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর
	-	সমুখে	"	সমাগত, সমুখ
৫.	নি	নিয়েধ	"	নিবৃত্তি
	-	নিষ্ঠয়	"	নিবারণ, নির্ণয়
	-	আতিশয়	"	নিদায়, নিদারূণ
	-	অভাব	"	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
৬.	অব	ইনতা	"	অবজ্ঞা, অবমাননা
	-	সম্যকভাবে	"	অবরোধ, অবগাহন, অবগত
	-	নিষ্ঠে/অধোমুখিতা	"	অবতরণ, অবরোহণ
	-	অভ্রতা	"	অবশ্যে, অবসান, অবেলা
৭.	অনু	পচ্চাং	"	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ
	-	সাদৃশ্য	"	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার
	-	পৌনঃপুন	"	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন
	-	সঙ্গে	"	অনুকূল, অনুকম্পা
৮.	নির	অভাব	"	নিরব, নির্জীব, নিরহজ্ঞার, নিরাশ্রয়, নির্দিন
	-	নিষ্ঠয়	"	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর
	-	বাহির/বিহুর্মুখিতা	"	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন
৯.	দূর	মদ	"	দূর্ভাগ্য, দূর্দশা, দূর্নাম
	-	কষ্টসাধ্য	"	দূর্গত, দূর্গম, দূরতিক্রম্য
১০.	বি	বিশেষ রূপে	"	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুষ্ক
	-	অভাব	"	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল
	-	গতি	"	বিচরণ, বিক্ষেপ
	-	অপ্রকৃতস্থ	"	বিকার, বিপর্যয়
১১.	সু	উন্নত	"	সুকৃষ্ট, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল
	-	সহজ	"	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ
	-	আতিশয়	"	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
১২.	উৎ	উর্ধবমুখিতা	"	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিণ্ড, উদগ্রীব, উত্তোলন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত		উদাহরণ
১৩.	অধি	আতিশয়	অর্থে	উচ্ছেদ, উভন্ত, উঁফুট্ট, উৎসুক, উৎপীড়ন
		প্রস্তুতি	"	উৎপাদন, উচ্চারণ
		অপর্ক্ষ	"	উৎকোচ, উচ্ছঙ্খল, উৎকট
১৪.	পরি	আধিপত্য	"	অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী
		উপরি	"	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
		ব্যাপ্তি	"	অধিকার, অধিবাস, অধিগত
১৫.	পরি	বিশেষ রূপ	"	পরিপন্থ, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন
		শেষ	"	পরিশেষ
		সম্যক রূপে	"	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ
১৬.	প্রতি	চতুর্দিক	"	পরিভ্রমণ, পরিমন্ডল
		সদৃশ	"	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
		বিরোধ	"	প্রতিবাদ, প্রতিহন্ত্বী
১৭.	অতি	শৌন্ধপুন	"	প্রতিদিন, প্রতিমাস
		অনুরূপ কাজ	"	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রতুপকার
		অনুরূপ কাজ	"	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রতুপকার
১৮.	উপ	সামীক্ষ্য	"	উপকূল, উপকর্ত
		সদৃশ	"	উপদীপ, উপবন
		শূন্দ	"	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা
১৯.	অতি	বিশেষ	"	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
		সম্যক	"	অতিব্যক্তি, অতিজ্ঞ, অতিভূত
		গমন	"	অতিযান, অতিসার
২০.	অতি	সম্মুখ বা দিক	"	অতিমুখ, অতিবাদন
		আতিশয়	"	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
		অতিক্রম	"	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
২১.	আ	পর্যন্ত	"	আকর্ষ, আমরণ, আসমুদ্র
		ঈষৎ	"	আরক্ষ, আভাস
		বিপরীত	"	আদান, আগমন

বাক্যে তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ

কালের প্রভাবে নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছে। ওসমান রণক্ষেত্রে বীরত্বের পরাকাঠা প্রদর্শন করেও পরাজিত হলেন। সমাগত সুধীজনকে সাদর অভিনন্দন জানানো হলো। তাঁর পুত্রদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান নেই। বলে তাঁর দৃঢ়থের সীমা-পরিসীমা নেই।

৩. বিদেশি উপসর্গ

আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি – এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতগুলো খীট উচ্চারণে আবার কতগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গিয়েছে। বেমালুম শব্দটিতে ‘মালুম’ আরবি শব্দ আর ‘বে’ ফারসি উপসর্গ। এরূপ- বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি। নিচে কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ দেয়া হলো।

ক. ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	উদাহরণ
১. কার্	কাজ	কার্য
২. দর্	মধ্যস্থি, অধীন	”
৩. না	না	”
৪. নিম্	আধা	”
৫. ফি	প্রতি	”
৬. বদ্	মন্দ	”
৭. বে	না	বেআদব, বেআকেল, বেকসুর, বেকায়দা, বেগতিক, বেতার, বেকার
৮. বর্	বাইরে, মধ্যে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
৯. ব্	সহিত	বমাল, বনাম, বকলম
১০. কম্	স্বল্প	কমজোর, কমবৰ্খত
খ. আরবি উপসর্গ		
১. আম্	সাধারণ	”
২. খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা, খাসদরবার
৩. লা	না	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপান্তা
৪. গর্	অভাব	গরমিল, গরহাজির, গররাজি

গ. ইংরেজি উপসর্গ

	উপসর্গ	যে অর্থে প্রযুক্ত	অর্থে	উদাহরণ
১.	ফুল	পূর্ণ	"	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-বাবু, ফুল-প্যান্ট
২.	হাফ	আধা	"	হাফ-হাতা, হাফ-টিকেট, হাফ-স্কুল, হাফ-প্যান্ট
৩.	হেড	প্রধান	"	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-প্রিডেন্ট, হেড-মৌলভি
৪.	সাব	অধীন	"	সাব-অফিস, সাব-জ্ঞান, সাব-ইন্সপেক্টর

ঘ. উর্দ্ধ-হিন্দি উপসর্গ

হর : প্রত্যেক অর্থে – হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

বাক্যে বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ

হিসেবে গৱামিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে। বহাল তবিয়তে দস্তখত করে ফি-রোজ হেড অফিসে আসা যাওয়া কর।

অনুশীলনী

- ১। উপসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কয় শ্রেণির উপসর্গের ব্যবহার আছে? প্রত্যেক শ্রেণির পাঁচটি করে উদাহরণ দাও।
- ২। ‘উপসর্গের স্বাধীন কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থ-দ্যোতকতা আছে।’ – বিশদ ব্যাখ্যা কর।
- ৩। বাংলা, তৎসম, বিদেশি- প্রত্যেক শ্রেণির তিনটি করে উপসর্গের উদাহরণ দিয়ে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।
- ৪। অর্থে উল্লেখ করে বাক্য রচনা কর
দরকাঁচা, বরবাদ, ফি-হস্তা, না-মঙ্গুর, বেহেড, কারখানা, লা-জওয়াব, অনুগমন, অতিবৃষ্টি, প্রতিদিন, বদনজর
- ৫। পার্থক্য নির্দেশ কর ও বাক্যে প্রয়োগ দেখাও
বনাম-বেনাম; সুবাদ-অপবাদ; বহাল-বেহাল; বিগত-আগত; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; অনুজ্ঞা-অবজ্ঞা;
- ৬। শুধু হলে (✓) চিহ্ন এবং অশুধু হলে (✗) চিহ্ন দাও।
 - ক. উপসর্গ স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
খ. অন্য শব্দের আগে বসে।
 - গ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির কোনো পরিবর্তন হয় না।
 - ঘ. উপসর্গের প্রভাবে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটে।
- ৭। নিচের কোনটি কোন ধরনের উপসর্গ?
নিখাদ, প্রতিদিন, ফি-বছর, বেহায়া, অনুসরণ, উপহার, আলুনি, বেতমিজ, নিখুত, ফুলবাবু, বিড়ই, অনুবাদ, পাতিহাস, রামছাগল, নিমরাঞ্জি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধাতু বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর সাধারণ আলোচনা

বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সেসব ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যকথায় ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় : (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়া বিভক্তি। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন – ‘করে’ একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে : কর + এ; এখানে ‘কর’ ধাতু এবং ‘এ’ বিভক্তি। সুতরাং ‘করে’ ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো ‘কর’ আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো ‘এ’। অন্যকথায় ‘কর’ ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে ‘করে’ ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

প্রচলিত বেশকিছু ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার একটা উপায় হলো : বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা। কারণ, এই রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন – তুই, কর, খা, যা, ডাক্ত, দেখ, সেখ ইত্যাদি। এগুলো যেমন ধাতুও, তেমনি মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদও।

ধাতুর প্রকারভেদ

ধাতু তিন প্রকারের : (১) মৌলিক ধাতু, (২) সাধিত ধাতু এবং (৩) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

১. মৌলিক ধাতু

যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন – চল, পড়, কর, শো, হ, খা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় : (ক) বাংলা, (খ) সংস্কৃত এবং (গ) বিদেশি ধাতু।

ক. বাংলা ধাতু : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন – কাট, কাঁদ, জান, নাচ ইত্যাদি।

খ. সংস্কৃত ধাতু : বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন – কৃ, গম, ধূ, গঠ, স্থা ইত্যাদি।

এখানে সংস্কৃত ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদ এবং সংস্কৃত ধাতুর একই অর্থবোধক বাংলা ধাতু ও তা থেকে গঠিত পদের উদাহরণ দেয়া হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঞ্জ	অঞ্জন, অঞ্জিত	আঁক	আঁকা
কথ	কথ্য, কথিত	কহ	কওয়া, কহন
কৃ	কর্তন, কর্তিত	কাট	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর	করা, করে

সংকৃত ধাতু	সাধিত গদ	বালা ধাতু	সাধিত গদ
ক্রন্দ	ক্রন্দন	কান্দ	কান্দা, কানুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন	কেনা, কেনাকাটা
খাদ	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ	গঠিত	গড়	গড়া, গড়ন
ঘৃষ	ঘৃষ্ট, ঘৰ্ণ	ঘ্ৰ	ঘৰা
দৃশ	দৃশ্য, দৰ্শন	দেখ	দেখা, দেখন
ধূ	ধূত, ধাৰণ	ধৱ	ধৱা, ধৱন
পঠ	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়	পড়া, পড়ন
বৰ্থ	বৰ্থন	বাধ	বাধন, বাধা
বুথ	বুথ, বোথ	বুথ	বুথা
ৱৰ্ক	ৱৰ্কণ, ৱৰ্ক্ষিত, ৱৰ্ক্ষী	ৱাৰ্ক	ৱাৰ্কা
শ্ৰ	শ্ৰবণ, শ্ৰূত	শুন	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক	থাকা
হস্ত	হাস, হাসন	হাস	হাসা, হাসি

গ. বিদেশাগত ধাতু : প্রধানত হিন্দি এবং বৃটিং আৱবি-ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বালা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে বিদেশাগত ধাতু বা ক্রিয়ামূল বলা হয়। যেমন – ভিক্ষে মেঝে থায়। এ বাকে ‘মাঙু’ ধাতু হিন্দি ‘মাঙ’ থেকে আগত। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রাখেছে যাদের ক্রিয়ামূলের মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু। যেমন – ‘হেৱ ঐ দুয়াৰে দাঁড়িয়ে কে?’ এ বাকে ‘হেৱ’ ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু।

এখানে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেয়া হলো।

ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	ধাতু	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়
আঁট	শক্ত করে বাধা	ফির	পুনৰাগমন, পুনৰাবৃত্তি
খাট	মেহনত কৰা	চাহ	প্রার্থনা কৰা
চেচ	চিত্কাৰ কৰা	বিগড়	নষ্ট হওয়া
জম	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ	সিন্ত হওয়া
ঝুল	দোলা	ঠেল	ঠেলা
টান	আকৰ্ষণ	ভাক	আহান কৰা
টুট	ছিন্ন হওয়া	লটক	ঝুলানো
ডৱ	ভীত হওয়া		

২. সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু কিংবা কোনো কোনো নাম - শব্দের সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন - দেখ + আ= দেখা, পড় + আ= পড়া, বল + আ= বলা। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন - মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ+আ+বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ‘য়’ = দেখায়)। এরূপ -শোনায়, বসায় ইত্যাদি।

গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু তিনি শ্রেণিতে বিভক্ত :

ক. নাম ধাতু, খ. প্রযোজক (নিজস্ত) ধাতু, (গ) কর্মবাচ্যের ধাতু।

ক. নাম ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে যে নতুন ধাতৃটি গঠিত হয় তা-ই নাম ধাতু। যেমন -সে ঘুমাচ্ছে। ‘ঘুম’ থেকে নাম ধাতু ‘ঘুমা’। ‘ধমক’ থেকে নাম ধাতু ‘ধমকা’। যেমন আমাকে ধমকিও না।

খ. প্রযোজক ধাতু : মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়েজিত করা অর্থে) ‘আ’ প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা গিজস্ত ধাতু গঠিত হয়। যেমন - কর + আ= করা (এখানে ‘করা’ একটি ধাতু)। যেমন - সে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। অনুরূপভাবে - পড় + আ=পড়া; তিনি ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

গ. কর্মবাচ্যের ধাতু : মৌলিক ধাতুর সঙ্গে ‘আ’ প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসরী ক্রিয়ার ধাতু। যথা - দেখ+ আ=দেখা; কাজটি ভালো দেখায় না। হার+আ=হারা; ‘যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেউ বেটাই চোর।’

‘কর্মবাচ্যের ধাতু’ বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন - ‘দেখায়’ এবং ‘হারায়’ প্রযোজক ধাতু।

৩. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা-ই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন - যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর (ধাতু) = ‘যোগ কর’ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) + হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- এখনও সাবধান হও, নতুন আরে খারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। নিচে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১. কর-ধাতু যোগে

ক. বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ভয় কর, লজ্জা কর, গুণ কর
খ. বিশেষণের সঙ্গে	:	ভালো কর, মন্দ কর, সুখী কর
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে	:	ক্রয় কর, দান কর, দর্শন কর, রাখা কর
ঘ. ক্রিয়াজ্ঞাত (কৃদণ্ড) বিশেষণের সঙ্গে	:	সাধিত কর, স্থগিত কর
ঙ. ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে	:	জলাদি কর, তাড়াতাড়ি কর, একত্র কর

চ. অব্যয়ের সঙ্গে	:	না কর, হাঁ কর, হায় হায় কর, ছি ছি কর
ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে	:	খাঁ খাঁ কর, বন বন কর, টন টন কর
জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে :	:	চট কর, ধী কর, হন হন কর
২. হ-ধাতু যোগে	:	বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ
৩. দে-ধাতু যোগে	:	উন্নত দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে
৪. পা-ধাতু যোগে	:	কালু পা, ডয় পা, দৃঃথ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা
৫. খা-ধাতু যোগে	:	মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা
৬. কাট-ধাতু যোগে	:	সাঁতার কাট, ভেঁট কাট, জিত কাট
৭. ছাড়-ধাতু যোগে	:	গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়
৮. ধর-ধাতু যোগে	:	গলা ধর, ঘুগে ধর, পচা ধর, মাথা ধর, গৌ ধর।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু বলতে কী বোব? ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চেনার উপায় কী?
- ২। ধাতু কয় প্রকার ও কী কী? সংস্কৃত মূল ধাতু ও বাংলা মূল ধাতুর মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ৩। নিচের সাধিত পদসমূহের ধাতু নির্ণয় কর এবং সাধিত ধাতুটি তৎসম হলে তার বাংলা রূপ এবং বাংলা হলে তার তৎসম রূপ নির্ণয় করে বাকেয়ে প্রয়োগ দেখাও :
 - খাদ্য, কথিত, বুঝ, নাচন, কথা, দৃশ্য, শেখা, দর্শন
- ৪। সাধিত ধাতু কী? সাধিত ধাতু কয় ভাগে বিভক্ত? এদের নাম লেখ।
- ৫। “বিভিন্ন পদের সঙ্গে ‘কর’ বা ‘খা’ ধাতুর সংযোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়” – উদাহরণ দাও।
- ৬। ক. কোনটি ঠিক? ধাতু- দুই প্রকার/ তিন প্রকার/ চার প্রকার
 - খ. বিদেশি ধাতু কোনটি? কাট / কৃৎ / টান
- ৭। ডান দিক থেকে শব্দ এনে ঠিক সংজ্ঞার পার্শ্বে বসাও
 - মৌলিক ধাতু ----- কৃ, চল, পড়, খাদ, আঁট
 - সাধিত ধাতু ----- শোনায়, বসায়, মুচড়ানো
 - যৌগিক ধাতু----- উন্নত দে, মার খা, ডয় পা।

নবম পরিচ্ছেদ

কৃৎ প্রত্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা

তোমরা লক্ষ করেছ যে, ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কালবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠন করা হয় ক্রিয়াপদ। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি; আর (২) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে কৃৎ-প্রত্যয়। যেমন- চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি)+ অন (কৃৎ-প্রত্যয়)= চলন (বিশেষ্য পদ)। চল্ (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন্ত (কৃৎ-প্রত্যয়)= চলন্ত (বিশেষণ পদ)।

‘প্রকৃতি’ কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে \checkmark চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে ‘প্রকৃতি’ শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন- \checkmark পড়ু+উয়া =পড়ুয়া। \checkmark নাচ+উনে = নাচুনে।

কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। যেমন - উপরের উদাহরণে ‘পড়ুয়া’ ও ‘নাচুনে’ কৃদন্ত পদ।

তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়। যেমন - \checkmark গম+অন=গমন, \checkmark কৃ+তব্য=কর্তব্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ করলে কৃৎ-প্রকৃতির আদিস্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃলিদি।

১. গুণ : (ক) ই, ইঁ-স্থলে এ, (খ) উ, উ-স্থলে ও এবং (গ) ঝ-স্থলে অৱ হয়। যেমন - \checkmark চিন্ন+আ=চেনা (ই স্থলে এ হলো); \checkmark নী+আ=নেওয়া (ই স্থলে এ); \checkmark ধু+আ =ধোয়া (উ স্থলে ও); কৃ+তা = করতা > কর্তা (ঝ স্থলে অৱ)।

২. বৃলিদি : (ক) অ-স্থলে আ, (খ) ই ও ইঁ-স্থলে ঐ, (গ) উ ও উ স্থলে ঔ এবং (ঘ) ঝ-স্থলে অৱ হয়। যেমন - পচ+অ (গক) = পাচক (পচ-এর অ স্থলে ‘আ’); শিশু+অ(ঝ) = শৈশব (ই স্থলে ঐ); যুব+অন= যৌবন (উ স্থলে ঔ); কৃ+ঘ্যণ= কার্য (ঝ স্থলে আৱ)।

বাল্লা কৃৎ-প্রত্যয়

কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাল্লা

১. (০) শূন্য-প্রত্যয় : কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন - এ মোকদ্দমায় তোমার জিত হবে না, হার-ই হবে। গ্রামে খুব ধৰু পাকড় চলছে।

২. অ-প্রত্যয় : কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - \checkmark ধৰ+অ=ধৰ, \checkmark মার+অ=মার। আধুনিক বাল্লায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন - \checkmark হার+অ=হার, \checkmark জিত+অ=জিত।

কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়ুক্ত কৃদ্রষ্ট শব্দের দ্বি-প্রয়োগ হয়। যেমন – (অসন্ম সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বান্ত) $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অ}$ = কাদকাদ (চেহারা)। এরূপ – $\sqrt{\text{পড়}} + \text{অ} = \text{পড়পড়}$, $\sqrt{\text{মৱ}} + \text{অ} = \text{মরমর}$ (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো কখনো দ্বিত্বান্ত কৃদ্রষ্ট পদে উ-প্রত্যয় হয়। যেমন – $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{উ} = \text{ডুবডুবু}$ । $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উ} = \text{উডুউডু}$ ।

৩. অন-প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ‘অন’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন – $\sqrt{\text{কাদ}} + \text{অন} = \text{কাদন}$ (কানুর ভাব)। এরূপ – নাচন, বাড়ন, ঝুলন, দোলন।

বিশেষ নিয়ম

(ক) আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে অন্ স্থলে ‘ওন’ হয়। যেমন – $\sqrt{\text{থা}} + \text{অন} = \text{থাওন}$, $\sqrt{\text{ছা}} + \text{অন} = \text{ছাওন}$, $\sqrt{\text{দে}} + \text{অন} = \text{দেওন}$ ।

(খ) আ-কারান্ত প্রযোজক (গিজন্ত) ধাতুর পরে ‘অন’ প্রত্যয় যুক্ত হলে ‘আনো’ হয়। যেমন – $\sqrt{\text{জানা}} + \text{অন} = \text{জানানো}$ । এরূপ – শোনানো, ভাসানো।

৪. অনা-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{দুল}} + \text{অনা} = \text{দুলনা}$ দোলন। $\sqrt{\text{খেল}} + \text{অনা} = \text{খেলনা}$ ।

৫. অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চির}} + \text{অনি} = \text{চিরনি}$ চিরনি। $\sqrt{\text{বাধ}} + \text{অনি} = \text{বাধনি} > \text{বাধনি}$ । $\sqrt{\text{আট}} + \text{অনি} = \text{আটনি}$ আটনি।

৬. অন্ত-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘অন্ত’ প্রত্যয় হয়। যেমন – $\sqrt{\text{উড়}} + \text{অন্ত} = \text{উড়ত্ত}$, $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{অন্ত} = \text{ডুবত্ত}$ ।

৭. অক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মুড়}} + \text{অক} = \text{মোড়ক}$ । $\sqrt{\text{বল}} + \text{অক} = \text{বলক}$ ।

৮. আ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘আ’ প্রত্যয় হয়। যেমন $\sqrt{\text{পড়}} + \text{আ} = \text{পড়া}$ (পড়া বই)। এরূপ রাখ (বিশেষণ), রাখা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

৯। আও-প্রত্যয় : ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আও’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন – $\sqrt{\text{পাকড়}} + \text{আও} = \text{পাকড়াও}$, $\sqrt{\text{চড়}} + \text{আও} = \text{চড়াও}$ ।

১১. আন (আনো) প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে ‘আন/আনো’ প্রত্যয় হয়। যেমন – $\sqrt{\text{চাল}} = \text{আন} = \text{চালান}/\text{চালানো}$ । $\sqrt{\text{মান}} + \text{আন} = \text{মানান}/\text{মানানো}$ ।

১২. আনি-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়। যেমন – $\sqrt{\text{জান}} + \text{আনি} = \text{জানানি}$, $\sqrt{\text{শুন}} + \text{আনি} = \text{শুনানি}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{আনি} = \text{উড়ানি}$, $\sqrt{\text{উড়}} + \text{উনি} = \text{উডুনি}$ ।

১৩. আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি-প্রত্যয় : যেমন – $\sqrt{\text{ডুব}} + \text{আরি}$ / উরি=ডুবরী। এরূপ – ধূনরী, পূজরী ইত্যাদি।

১৪. আল-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{মাত}} + \text{আল} = \text{মাতাল}$, $\sqrt{\text{মিশ}} + \text{আল} = \text{মিশাল}$ ।

১৫. ই-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘ই’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা – $\sqrt{\text{ভাঙ্গ}} + \text{ই} = \text{ভাঙ্গি}$, $\sqrt{\text{বেড়}} + \text{ই} = \text{বেঢ়ি}$ ।

১৬. ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ইয়া/ ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন – $\sqrt{\text{মৱ}} + \text{ইয়া} = \text{মরিয়া}$ (মরতে প্রস্তুত), $\sqrt{\text{বল}} + \text{ইয়ে} = \text{বলিয়ে}$ (বাকপটী)। এরূপ – নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে ইত্যাদি।

১৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা - $\sqrt{\text{ডাক}} + \text{উ} = \text{ডাকু}$, $\sqrt{\text{বাড়ি}} + \text{উ} = \text{বাডু}$, $\sqrt{\text{উড়ি}} + \text{উ} = \text{উডু}$ (বিপুর উডুউডু)
১৮. ‘উয়া’ বিকলে ‘ও’ - প্রত্যয় : বিশেষ্য বিশেষণ গঠনে ‘উয়া’ এবং ‘ও’ প্রত্যয় হয়। যথা - $\sqrt{\text{পড়}} + \text{উয়া} = \text{পডুয়া} > \text{পড়ো}$, $\sqrt{\text{উড়ি}} + \text{উয়া} = \text{উডুয়া} > \text{উড়ো}$, $\sqrt{\text{উড়ি}} + \text{ও} + \text{উড়ো}$ (চিঠি)।
১৯. তা-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘তা’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ফিরতা}} + \text{তা} = \text{ফিরতা}$ > ফেরতা, $\sqrt{\text{পড়}} + \text{তা} = \text{পডুতা}$, $\sqrt{\text{বহু}} + \text{তা} = \text{বহুতা}$ ।
২০. তি-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যেমন - $\sqrt{\text{ঘাটি}} + \text{তি} = \text{ঘাটিতি}$, $\sqrt{\text{বাড়ি}} + \text{তি} = \text{বাড়তি}$ । এবুপ - কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।
২১. না-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে ‘না’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন - $\sqrt{\text{কান্দি}} + \text{না} = \text{কান্দনা} > \text{কান্দা}$, $\sqrt{\text{রাখি}} + \text{না} = \text{রাখনা} > \text{রান্দা}$ । এবুপ-বারনা ইত্যাদি।

কৃৎ-প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

১. অনট-প্রত্যয় : ('ট' ইঁৎ (বিলুপ্ত) হয়, 'অন' থাকে) : $\sqrt{\text{নী}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{নী}} + \text{অন} > \text{নে} + \text{অন}$ (গুণসূত্রে) = নয়ন, $\sqrt{\text{শ্রু}} + \text{অনট} = \sqrt{\text{শ্রু}} + \text{অন}$ (গুণ ও সমিক্ষণ ফলে) = শ্রবণ। এবুপ - স্থান, ভোজন, নর্তন, দর্মন ইত্যাদি।
২. কৃ-প্রত্যয় ('ক' ইঁৎ 'ক' থাকে) : $\sqrt{\text{জা}} + \text{কৃ} (\text{জা} + \text{ত}) = \text{জাত}$, $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{কৃ} = \text{খ্যাত}$ ।
- বিশেষ নিয়ম**
- (ক) কৃ-প্রত্যয় যুক্ত হলে নিম্নলিখিত ধাতুর অন্ত্যস্বর ‘ই’ কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{পঠি}} + \text{কৃ} = (\text{পঠি} + \text{ই} + \text{ত}) = \text{পঠিত}$ । এবুপ - লিখিত, বিদিত, বেষ্টিত, চলিত, পতিত, লুক্ষিত, ক্ষুধিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।
- (খ) কৃ প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্ত্যস্বর ‘চ’ ও ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{সিচি}} + \text{কৃ} = (\text{সিক্ষি} + \text{ত})$ সিক্ষি। এবুপ - $\sqrt{\text{মুচি}} + \text{কৃ} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভুজি}} + \text{কৃ} = \text{ভুক্তি}$ ।

- (গ) এ ছাড়া কৃ প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। এখানে এবুপ কয়েকটি প্রকৃতি-প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন - $\sqrt{\text{গম্বু}} + \text{কৃ} = \text{গত}$, $\sqrt{\text{গুম্বু}} + \text{কৃ} = \text{গ্রহিত}$, $\sqrt{\text{চুরি}} + \text{কৃ} = \text{চুর্ণ}$, $\sqrt{\text{ছিদ্ৰি}} + \text{কৃ} = \text{ছিন্ন}$, $\sqrt{\text{জন্ম}} + \text{কৃ} = \text{জাত}$, $\sqrt{\text{দান্ত}} + \text{কৃ} = \text{দস্ত}$, $\sqrt{\text{দহি}} + \text{কৃ} = \text{দগ্ধ}$, $\sqrt{\text{বচি}} + \text{কৃ} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{বগ্মি}} + \text{কৃ} = \text{উপ্তি}$, $\sqrt{\text{মুহু}} + \text{কৃ} = \text{মুপ্তি}$, $\sqrt{\text{যুধি}} + \text{কৃ} = \text{যুপ্তি}$, $\sqrt{\text{লঙ্ঘি}} + \text{কৃ} = \text{লস্তি}$, $\sqrt{\text{স্বপ্নি}} + \text{কৃ} = \text{সুপ্তি}$, $\sqrt{\text{সূজি}} + \text{কৃ} = \text{সূষ্টি}$, $\sqrt{\text{হন্দি}} + \text{কৃ} = \text{হত ইত্যাদি}$ ।
৩. ক্ষি-প্রত্যয় ('ক' ইঁৎ 'তি' থাকে) : $\sqrt{\text{গম্বু}} + \text{ক্ষি} = \sqrt{\text{গম্বু}} + \text{তি} = \text{গতি}$ (এখানে 'ম' লোপ হয়েছে)।

বিশেষ নিয়ম

- (ক) ক্ষি-প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা - $\sqrt{\text{মন্তি}} + \text{ক্ষি} = \text{মতি}$, $\sqrt{\text{রম্যি}} + \text{ক্ষি} = \text{রতি}$ ।
- (খ) কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ-কার হয়। যেমন - $\sqrt{\text{শ্রম্যি}} + \text{ক্ষি} = \text{শ্রান্তি}$ (সমিক্ষণে ম>n), $\sqrt{\text{শ্রম্যি}} + \text{ক্ষি} = \text{শান্তি}$ ।
- (গ) ‘চ’ এবং ‘জ’ স্থলে ‘ক’ হয়। যেমন - $\sqrt{\text{বচি}} + \text{ক্ষি} = \text{উক্তি}$, $\sqrt{\text{মুচি}} + \text{ক্ষি} = \text{মুক্তি}$, $\sqrt{\text{ভুজি}} + \text{ক্ষি} = \text{ভুক্তি}$ ।

(ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ : $\sqrt{\text{গৈ}}+\text{ক্তি}=\text{গীতি}$, $\sqrt{\text{সিদ্ধ}}+\text{ক্তি}=\text{সিদ্ধি}$, $\sqrt{\text{বুদ্ধি}}+\text{ক্তি}=\text{বুদ্ধি}$, $\sqrt{\text{শক্তি}}+\text{ক্তি}=\text{শক্তি}$ ।

৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।

(ক) তব্য : $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{তব্য}=\text{কর্তব্য}$, $\sqrt{\text{দা}}+\text{তব্য}=\text{দাতব্য}$, $\sqrt{\text{পঠি}}+\text{তব্য}=\text{পঠিতব্য}$ ।

(খ) অনীয় : $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{অনীয়}=\text{করণীয়}$, $\sqrt{\text{রক্ষ}}+\text{অনীয়}=\text{রক্ষণীয়}$ । এরূপ—দর্শনীয়, পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।

৫. তৃচ-প্রত্যয় ('চ' ইঁ 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। যেমন—
 $\sqrt{\text{দা}}+\text{তৃ}=\sqrt{\text{দা}}+\text{তৃ}=\sqrt{\text{দা}}+\text{তা}=\text{দাতা}$, $\sqrt{\text{মা}}+\text{তৃ}=\text{মাতা}$, $\sqrt{\text{জী}}+\text{তৃ}=\text{জ্ঞেতা}$ ।

বিশেষ নিয়মে : $\sqrt{\text{যুধ}}+\text{তৃ}=\sqrt{\text{যুধ}}+\text{তা}=\text{যোদ্ধা}$ ।

৬. গক-প্রত্যয় ('গ' ইঁ 'অক' থাকে) : $\sqrt{\text{পঠি}}+\text{গক}=\sqrt{\text{পঠি}}+\text{অক}=\text{পাঠক}$ । মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন— $\sqrt{\text{নী}}=\text{গক}=(\text{নে}+\text{অক}-\text{প্রথম স্বরের বৃদ্ধি})$ নায়ক, $\sqrt{\text{গৈ}}+\text{গক}=\text{গায়ক}$, $\sqrt{\text{লিখ}}+\text{গক}=\text{লেখক}$ ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম

(ক) গক-প্রত্যয় পরে থাকলে শিঙ্গত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন— $\sqrt{\text{শুঙ্গ}}+\text{গক}=\text{পূজক}$ । এরূপ—জনক, চালক, স্তাবক।

(খ) আ-কারান্ত ধাতুর পরে এক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যথা— $\sqrt{\text{দা}}+\text{গক}=\text{দায়ক}$, বি— $\sqrt{\text{ধা}}+\text{গক}=\text{বিধায়ক}$ ।

৭. ঘ্যণ-প্রত্যয় [ঘ, গ-ইঁ, ঘ (য-ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যণ হয়। যথা— $\sqrt{\text{কৃ}}+\text{ঘ্যণ}=\text{কার্য্য}$, $\sqrt{\text{ধূ}}+\text{ঘ্যণ}=\text{ধার্য্য}$ । এরূপ—পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।

(মুট্টব্য : আধুনিক বাংলা বানানে রেফ+য+য=র্য হয় না, র্য হয়।)

৮. ষ-প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও উচিত্য অর্থে 'ষ' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'ষ' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ-কারান্ত হয় এবং 'ষ' 'য়' হয়। যেমন— $\sqrt{\text{দা}}+\text{ষ}=\text{দা}>\text{দে}+\text{য়}=\text{দেয়}$ ।
 $\sqrt{\text{হা}}+\text{ষ}=\text{হেয়}$ ।

এরূপ—বিধেয়, অজেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম : ব্যঙ্গনান্ত ধাতুর 'ষ' প্রত্যয় স্থলে ষ-ফলা হয়। যথা— $\sqrt{\text{গম}}+\text{ষ}=\text{গম্য}$, $\sqrt{\text{লভ}}+\text{ষ}=\text{লভ্য}$ ।

৯. শিন-প্রত্যয় (শ ইঁ, ইঁ থাকে, ইন 'ই'—কার হয়) : $\sqrt{\text{গ্রহ}}+\text{শিন}=\text{গ্রাহী}$, $\sqrt{\text{পা}}+\text{শিন}=\text{পায়ী}$ । এরূপ—কারী, দ্রোহী, সত্যবাদী, তাবী, স্থায়ী, গামী। কিন্তু 'শিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা—আআ- $\sqrt{\text{হণ}}+\text{শিন}=\text{আআঘাতী}$ ।

১০. ইন-প্রত্যয় (ইন)=ঈ-কার হয়) : $\sqrt{\text{শ্রম}}+\text{ইন}=\text{শ্রমী}$ ।

১১. অল-প্রত্যয় (ল ইঁ, অ থাকে) : $\sqrt{\text{জি}}+\text{অল}=\text{জয়}$, $\sqrt{\text{কি}}+\text{অল}=\text{ক্ষয়}$ । এরূপ—ভয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ, বিলয়। ব্যতিক্রম : $\sqrt{\text{হণ}}+\text{অল}=\text{বথ}$ ।

কৃদণ্ড বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ-প্রত্যয়

১. ইক্ষু-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{চল}}+\text{ইক্ষু}=\text{চলিক্ষু}$ । এরূপ—ক্ষয়িক্ষু, বর্ধিক্ষু।

২. বর-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ঈশ}}+\text{বর}=\text{ঈশ্বর}$, $\sqrt{\text{ভাস}}+\text{বর}=\text{ভাস্বর}$ । এরূপ—নশ্বর, স্থাবর।

৩. র-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{হিন}}+\text{সু}+\text{র}=\text{হিস্তু}$, $\sqrt{\text{নম}}+\text{র}=\text{নম্বৰ}$ ।

৪. উক/উক-প্রত্যয় : $\sqrt{\text{ভু}}+\text{উক}=(\text{ভো}+\text{উক})=\text{ভাবুক}$, $\sqrt{\text{জাগ}}+\text{উক}=(\text{জাগর}+\text{উক})\text{ জাগুক}$ ।
৫. শানচ-প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইৎ, 'আন' বিকলে 'মান' থাকে) : $\sqrt{\text{দীপ}}+\text{শানচ}=\text{দীপ্যমান}$ । এবুগ - $\sqrt{\text{চল}}+\text{শানচ}=\text{চলমান}$, $\sqrt{\text{বুধ}}+\text{শানচ}=\text{বৰ্ধমান}$ ।
৬. ঘঞ্চ-প্রত্যয় [(কৃদণ্ড বিশেষ্য গঠনে), ঘ এবং ঘঞ্চ ইৎ, 'অ' থাকে] : $\sqrt{\text{বস}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{বাস}$, $\sqrt{\text{যুজ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{যোগ}$, $\sqrt{\text{কুখ্য}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{ক্রোখ}$, $\sqrt{\text{খুদ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{খেদ}$, $\sqrt{\text{ভিদ্য}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{ভেদ}$ ।
- বিশেষ নিয়ম : $\sqrt{\text{ত্যজ্ঞ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{ত্যাগ}$, $\sqrt{\text{পচ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{পাক}$, $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{শোক}$ ।
 কিন্তু, $\sqrt{\text{নমিদি}}+\text{অন}=\text{নম্দন}$ । এক্ষেত্রে আ যোগে 'নম্দনা' হয় না।

অনুশীলনী

- ১। ধাতু ও ক্রিয়া প্রকৃতির পার্থক্য উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
- ২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর
 (ক) ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে-----।
 (খ) কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত পদটিকে বলা হয়-----।
- ৩। গুণ ও বৃদ্ধি কলতে কী বোঝ ?
- ৪। নিচের প্রত্যয়গুলোর কোনটি 'ইৎ' হয় লেখ।
 অনট, আন, শানচ, তৃচ, মিন, ঘঞ্চ, ঘ্যণ, ক্তি, ক্তু
- ৫। নিচের কৃৎ-প্রত্যয়সাধিত শব্দগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। $\sqrt{\text{পঠ}}+\text{ক্তি}=\text{পঠিত}$, $\sqrt{\text{শম}}+\text{ক্তি}=\text{শান্তি}$, $\sqrt{\text{শুচ}}+\text{ঘঞ্চ}=\text{শোক}$, $\sqrt{\text{নী}}+\text{তৃচ}=\text{নেতা}$
- ৬। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।
 নাচনে, ঘরনা, নিরুনিবু, চেনা, মাতাল, ভূত, লিখিত, বুদ্ধ, চরণ, উক্তি, অনুরাগী, বিধায়ক, জাগুক
- ৭। ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 জমানো, ডরানো, ইঁকানো, লটকানো, ঘরনা
- ৮। যেটি ঠিক তার ডানে টিক (\checkmark) চিহ্ন দাও
 ক. ক্রিয়ামূলকে/ ক্রিয়ার কালকে/ক্রিয়াপদকে/ অক্রিয়াবাচক পদকে বলা হয় ক্রিয়াপ্রকৃতি।
 খ. কৃদণ্ডপদকে / ক্রিয়াপদকে/ক্রিয়া বিশেষণকে/ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি যুক্ত হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়।
 গ. কৃৎ প্রত্যয়হীন পদকে/ কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদকে / ক্রিয়ামূলকে বলা হয় কৃদণ্ডপদ।
- ৯। প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর
 ঘাটতি, ঝলক, ঝাখনি, বাদু, দর্শন, মুক্ত, মুগ্ধ, উপ্ত, তোজ্জ্ব, জয়

দশম পরিচ্ছেদ

তন্ত্রিত প্রত্যয়

১. ছেলেটি বড় লাজুক।
২. বড়াই করা ভালো না।
৩. ঘরামি ডেকে ঘর ছেয়ে নে।

ওপরের ‘লাজুক’, ‘বড়াই’ শব্দগুলো গঠিত হয়েছে এভাবে : লাজুক= লাজ + উক; বড়াই=বড়+আই; ঘরামি = ঘর+আমি। ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’ শব্দগুলোর পরে যথাক্রমে ‘উক’, ‘আই’ ও ‘আমি’ (প্রত্যয়) যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে।

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যেসব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তন্ত্রিত প্রত্যয় বলা হয়।

দ্রষ্টব্য : ‘লাজ’ ‘বড়’ ও ‘ঘর’- এ শব্দগুলোর সাথে কোনো শব্দ/বিভক্তি যুক্ত হয় নি। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক তন্ত্রিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতিও বলা হয়।

ধাতু যেমন কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তন্ত্রিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় নাম প্রকৃতি।

তন্ত্রিত প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় তন্ত্রিত প্রত্যয় তিনি প্রকার।

- (ক) বাংলা তন্ত্রিত প্রত্যয়
- (খ) বিদেশি তন্ত্রিত প্রত্যয়।
- (গ) তৎসম বা সংস্কৃত তন্ত্রিত প্রত্যয়।

(ক) বাংলা তন্ত্রিত প্রত্যয়

১. আ-প্রত্যয়
 - (ক) অবজ্ঞার্থে : চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্টা।
 - (খ) বৃহদার্থে : ডিঙি + আ= ডিঙা (সপ্তডিঙা মধুকর)।
 - (গ) সদৃশ অর্থে : বাঘ+আ=বাঘা, হাত + আ=হাতা। এরূপ : কাল - কালা (চিকল কালা), কান-কানা।
 - (ঘ) ‘তাতে আছে’ বা ‘তার আছে’ অর্থে : জল + আ=জলা, গোদ + আ=গোদা। এরূপ : রোগ - রোগা, চাল- চালা, শুন-শুনা>গোলা।
 - (ঙ) সমষ্টি অর্থে : বিশ - বিশা, বাইশ-বাইশা (মাসের বাইশা)> বাইশে।
 - (চ) স্বার্থে : জট+আ=জটা, চোখ-চোখা, চাক-চাকা।
 - (ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজির - হাজিরা, চায-চাযা।
 - (জ) জাত ও আগত অর্থে : মহিষ-ভইস-ভয়সা (ঘি), দখিন-দখিনা > দখনে (হাওয়া)।

২. আই-প্রত্যয়

- (ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড়+আই=বড়াই, চড়া +আই=চড়াই।
- (খ) আদরার্থে : কানু+আই=কানাই, নিম+আই=নিমাই।
- (গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতে : বোন+আই=বোনাই, ননদ-নন্দাই, জেঠা-জেঠাই (মা)।
- (ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনে : মিঠা +আই=মিঠাই।
- (ঙ) জাত অর্থে : ঢাকা+আই=ঢাকাই (জামদানি), পাবনা-পাবনাই (শাড়ি)।
- (চ) বিশেষণ গঠনে : চোর-চোরাই (মাল), মোগল-মোগলাই (পরোটা)।

৩. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : ইতর+আমি =ইতরামি, পাগল+আমি = পাগলামি, চোর+আমি =চোরামি,
ঝাঁদর+আমি =ঝাঁদরামি, ফাজিল +আমো=ফাজলামো।
- (খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে : ঠক+আমো=ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর+আমি=ঘরামি।
- (গ) নিম্না জ্ঞাপন : জেঠা+আমি=জেঠামি, ছেলে+আমি=ছেলেমি।

৪. ই/ই-প্রত্যয়

- (ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর +ই = বাহাদুরি, উমেদার-উমেদারি।
- (খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে : ডাঙ্কার-ডাঙ্কারি, মোঙ্কার-মোঙ্কারি, পোদ্দার-পোদ্দারি, ব্যাপার-
ব্যাপারি, চাষ-চাষি।
- (গ) মালিক অর্থে : জমিদার-জমিদারি, দোকান-দোকানি।
- (ঘ) জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে : ভাগলপুর-ভাগলপুরি, মাদ্রাজ-মাদ্রাজি, রেশম-রেশমি,
সরকার-সরকারি (সম্বন্ধ বাচক)।

৫. ইয়া > এ-প্রত্যয়

- (ক) তৎকালীনতা বোঝাতে : সেকাল + এ=সেকেলে, একাল+এ=একেলে, ভাদৱ +ইয়া = ভাদৱিয়া >
ভাদুরে (কইমাছ)।
- (খ) উপকরণ বোঝাতে : পাথর -পাথরিয়া > পাথুরে, মাটি -মেটে, বালি- বেলে।
- (গ) উপজীবিকা অর্থে : জাল-জালিয়া > জেলে, ঘোঁট-ঘুঁটে।
- (ঘ) নেপুণ্য বোঝাতে : খুন-খুনিয়া > খুনে, দেমাক-দেমাকে, না (নৌকা) - নাইয়া > নেয়ে।
- (ঙ) অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে : টনটন- টন্টনে (জ্ঞান), কলকন- কলকনে (শীত), গনগন - গনগনে
(আগুন), চকচক- চকচকে (জুতা)।

৬. উয়া > ও-প্রত্যয়

- (ক) রোগগ্রস্ত অর্থে : জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো। বাত+উয়া=বাতুয়া > বেতো (ঘোড়া)।
- (খ) যুক্ত অর্থে : টাক - টেকো।
- (গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে : খড় - খড়ো (খড়োঘর)।
- (ঘ) জাত অর্থে : ধান - ধেনো।
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থে : মাঠ - মেঠো, গী - গীইয়া > গৌয়ো।
- (চ) উপজীবিকা অর্থে : মাছ - মাছুয়া > মেছো।
- (ছ) বিশেষণ গঠনে : দীত - দৈতো (হাসি), ছাদ - ছেদো (কথা), তেল - তেলো > তেলা (মাথা), ঝুঁজ - ঝুঁজো (লোক)।

৭. উ-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : ঢাল + উ = ঢালু, কল + উ = কলু।

৮. টক-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : লাজ - লাজুক, মিশ - মিশুক, মিথ্যা - মিথ্যুক।

৯. আরি/আরী/আরু-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তিখ - তিখারি, শীখ - শীখারি, বোমা - বোমারু।

১০. আলি/আলো/আলী>এল-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে : দীত - দীতাল, শাঠি - শাঠিয়াল > সেঠেল, তেজ - তেজাল, ধার - ধারাল, শীস - শীসাল, জমক - জমকালো, দুধ - দুধাল > দুধেল, হিম - হিমেল, চতুর - চতুরালি, ঘটক - ঘটকালি, সিদ - সিদেল, গীজা - গীজেল।

১১. উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয় : হাট - হাটুরিয়া > হাটুরে, সাপ - সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, কাঠ - কাঠুরে।

১২. উড়-প্রত্যয় : অর্ধহীনভাবে : লেজ - লেজুড়।

১৩. উয়া/ওয়া > ও-প্রত্যয় : সম্পর্কিত অর্থে : ঘর+ওয়া = ঘরোয়া, জল+ উয়া=জলুয়া > জলো (সুধ)।

১৪. আটিয়া / টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তামা - তামাটিয়া > তামাটে, ঝাগড়া - ঝাগড়াটে, ভাড়া - ভাড়াটে, রোগা - রোগাটে।

১৫. অট>ট-প্রত্যয় : স্বার্থে : ভরা - ভরাট, জমা - জমাট।

১৬. লা-প্রত্যয় : (ক) বিশেষণ গঠনে : মেঘ - মেঘলা

(খ) স্বার্থে : এক - একলা, আধ - আধলা।

(ঞ) বিদেশি তথ্যিত প্রত্যয়

১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি) : বাড়ি - বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে), দিঙ্গি - দিঙ্গিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে), মাছ - মাছওয়ালা (বৃক্ষ অর্থে), দুধ - দুধওয়ালা (বৃক্ষ অর্থে)।
২. ওয়াল>আন (হিন্দি) : গাড়ি - গাড়িওয়ালান, দার - দারোয়ান।
৩. আনা>আনি (হিন্দি) : মুনশি - মুনশিওয়ানা, বিবি - বিবিওয়ানা, হিন্দু - হিন্দুওয়ানি।

৪. পনা (হিন্দি) : পানি-পানসা > পানসে, এক-একসা, কাল (কাল)-কালসা > কালসে।
৫. গর> কর (ফারসি) : কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।
৬. দার (ফারসি) : তাবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার, চৌকিদার, পাহারাদার।
৭. বাজ (দক্ষ অর্থে - ফারসি) : কলমবাজ, ধড়িবাজ, ধোকাবাজ, গলাবাজ+ই=গলাবাজি (বিশেষ)।
৮. বদি (বদ্র-ফারসি) : জবানবদি, সারিবদি, নজরবদি, কোমরবদি।
৯. সই : মতো অর্থে : জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।

দ্রষ্টব্য : ‘টিপসই’ ও ‘নামসই’ শব্দ দুটোর ‘সই’ প্রত্যয় নয়। এটি ‘সই’ (অর্থ-স্বাক্ষর) শব্দ থেকে উৎপন্ন।

(গ) সংস্কৃত তাত্ত্বিক প্রত্যয়

ষ, ষ্ঠি, ষ্ট্য, ষ্ঠিক, ইত, ইমন, ইল, ইষ্ট, ইন, তর, তম, তা, ত্, নীন, নীয়, বত্তুপ, বিন্ন, র, ল প্রভৃতি সংস্কৃত তাত্ত্বিক প্রত্যয়বোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, সেগুলো বাঙ্গা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এখানে কতগুলো সংস্কৃত তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের উদাহরণ দেয়া হলো।

কয়েকটি সাধারণ সূত্র

১. যে শব্দের সঙ্গে ষ (অ)-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা- নগর+ষ=নাগর, মধুর +ষ=মাধুর্য।

বৃদ্ধি : (১) অ-স্থানে আ, (২) ই, ই-স্থানে ঐ, (৩) উ, উ-স্থানে ঔ এবং (৪) ঝ-স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

২. যে শব্দের সঙ্গে ষ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কারণ ও-কারণে পরিণত হয়।

ও+অ সমিথতে ‘অব’ হয়। যথা-গুরু+ষ=গৌরব, লঘু+ষ=লাঘব, শিশু+ষ=শৈশব, মধু+ষ=মাধব, মনু+ষ=মানব।

৩. দুটি শব্দের ধারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তাত্ত্বিক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা-

পরলোক +ষিক = পারলোকিক।

সুত্তগ+ষ্য=সৌত্তাগ্য।

পঞ্চভূত+ষিক=পাঞ্চভূতিক।

সর্বভূমি+ষ=সার্বভৌম।

ব্যতিক্রম : ‘বৰ্ষ’ শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যথা- দ্বিবৰ্ষ +ষিক= দ্বিবার্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন – বৰ্ষ + ষিক=বার্ষিক।

৪. ‘য’ প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে ষিত অ, আ, ই এবং ই-এর লোপ হয়। যথা – সম্য+য =সাম্য, কবি+য =কাব্য, মধুর +য =মাধুর্য, প্রাচী+য=প্রাচ্য।

ব্যতিক্রম : সভা+য=সভ্য (‘সাভ্য’ নয়)।

কয়েকটি সংস্কৃত প্রত্যয়

১. ইত-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

কুসুম + ইত=কুসুমিত, তরঙ্গ+ইত=তরঙ্গিত, কটক+ইত=কটকিত।

২. ইমন-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

নীল+ইমন=নীলিমা। মহৎ+ইমন=মহিমা।

৩. ইল-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঞ্জ+ইল=পঞ্জিল, উর্মি +ইল =উর্মিল, ফেন+ইল=ফেনিল।

৪. ইষ্ট-প্রত্যয় : অতিশায়নে

গুরু+ইষ্ট=গরিষ্ঠ, লঘু+ইষ্ট=লঘিষ্ঠ।

৫. ইন् (ঈ)-প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে

জ্ঞান +ইন্স=জ্ঞানিন্

সুখ+ইন্স=সুখিন্।

গুণ+ইন্স=গুণিন্

মান+ইন্স=মানিন্।

সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ লোগ পায়। যেমন – জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন ইত্যাদি।

কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন-

জ্ঞান+ইন্ (ঈ) –জ্ঞানী, গুণ+ ইন্(ঈ) গুণী ইত্যাদি।

স্ত্রী লিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ-যুক্ত হয়ে ইনী রূপ গ্রহণ করে। যেমন–

জ্ঞান+ইনী-জ্ঞানিনী, গুণ+ইনী =গুণিনী ইত্যাদি।

৬. তা ও ত্ত-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

বস্থু+ তা =বস্থুতা, শত্রু+তা = শত্রুতা।

বস্থু+ত্ত=বস্থুত্ত, গুরু+ত্ত = গুরুত্ত।

ঘন+ত্ত=ঘনত্ত, মহৎ+ত্ত = মহুত্ত।

৭. তর ও তম-প্রত্যয় : অতিশায়নে

মধুর-মধুরতর, মধুরতম। প্রিয়-প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. নীল (ঈল)- প্রত্যয় : তৎসম্মুক্তি অর্থে বিশেষণ গঠনে

সর্বজন+নীল=সর্বজনীন, কুল+নীল =কুলীন, নব+নীল=নবীন।

৯. নীয় (ঈয়)-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

জল+নীয় =জলীয়, বায়ু+নীয় =বায়ীয়, বর্ধ+নীয় =বর্ষীয়।

বিশেষ নিয়মে : পর-পরকীয়, স্ব-স্বকীয়, রাজা-রাজকীয়।

১০. বতুপ (বৎ) এবং মতুপ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমান্তর এক বচনে যথাক্রমে ‘বান্ এবং ‘মান্’ হয়] : বিশেষণ গঠনে
গুণ+বতুপ=গুণবান, দয়া+বতুপ = দয়াবান।

শ্রী+মতুপ=শ্রীমান, বুদ্ধি+মতুপ=বুদ্ধিমান।

১১. বিন (বী) প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা+বিন=মেধাবী, মায়া+বিন = মায়াবী, তেজৎ+বিন= তেজস্বী, যশৎ +বিন=যশস্বী।

১২. র-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

মধু+র=মধুর, মুখ+র=মুখর।

১৩. জ-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

শীত +জ = শীতল, বৎস +জ= বৎসল।

১৪. ঝ (অ) প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থে : মনু+ঝ=মানব, যদু +ঝ=যাদব।

(খ) উপাসক অর্থে : শিব+ঝ=শৈব, জিন+ঝ=জৈন। এরূপ : শক্তি-শাক্ত, বৃন্দ-বৌন্দ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থে : শিশু +ঝ=শৈশব, গুরু+ঝ =গৌরব, কিশোর+ঝ=কৈশোর।

(ঘ) সম্পর্ক বোঝাতে : পৃথিবী+ ঝ = পার্থিব, দেব+ঝ=দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম)+ ঝ=চৈত্র।

নিপাতনে সিদ্ধ : সূর্য+ঝ=সৌর (সাধারণ নিয়মে সূর+ঝ (অ)=সৌর)।

১৫. ঝ্য (য) প্রত্যয়

(ক) অপত্যার্থে : মনুঝ +ঝ্য=মনুষ্য, জমদগ্নি+ঝ্য=জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর+ঝ্য=সৌন্দর্য, শূর+ঝ্য=শৌর্য। ধীর+ঝ্য=ধৈর্য, কুমার +ঝ্য =কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত +ঝ্য = পার্বত্য, বেদ+ঝ্য =বৈদ্য।

১৬. ক্ষি (ই)-প্রত্যয় : অপত্য অর্থে

রাবণ+ক্ষি=রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ক্ষি=দাশরথি।

১৭. ক্ষিক (ইক)-প্রত্যয়

(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য +ক্ষিক=সাহিত্যিক, বেদ+ক্ষিক=বৈদিক, বিজ্ঞান+ক্ষিক=বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থে : সমূদ্র+ক্ষিক=সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক, মাস-মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর-সামরিক, সমাজ-সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত +ক্ষিক=হেমন্তিক, অকস্মাৎ+ক্ষিক=আকস্মিক।

১৮. ক্ষেয় (এয়)-প্রত্যয়

ভগিনী+ক্ষেয়=ভাগিনীয়, অগ্নি+ক্ষেয়=আগ্নেয়, বিমাত্ (বিমাতা) +ক্ষেয়=বৈমাত্রেয়।

অনুশীলনী

১। তদ্বিত প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? তদ্বিত প্রত্যয়কে শব্দ প্রত্যয় বলা যায় কি? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতি বলা হয় কেন?

৩। নিম্নলিখিত খাঁটি বাংলা তদ্বিতাত্ত শব্দসমূহে কী অর্থে কোন কোন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে, তা পাশাপাশি লিখে দাও।

হাজিরা	-	জলা	-	মিঠাই	-	লেজুড়	-	চামচা	-
দরকারি	-	টেকো	-	মিথুক	-	ঘরোয়া	-	চাকাই	-

৪। দুটি করে উদাহরণ দাও।

(ক) কণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির (প্রাতিপদিকের) স্বরের বৃদ্ধি হয়।

(খ) এই প্রত্যয় যুক্ত হলে মূলস্বরের বৃদ্ধি ছাড়াও প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উ-কার থাকলে তা ও-কার হয়।

(গ) তদ্বিতাত্ত শব্দের প্রকৃতি দুটি শব্দে গঠিত হলে অথবা শব্দটি উপসর্গযুক্ত থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই (উপসর্গসহ) মূলস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

কাব্য, ভাস্তবেয়, বৈজ্ঞানিক, বায়বীয়, সর্বজনীন, সুষ্মী, কসুমিত, ফেনিল, শীতল, মধুর, কুলীন, পার্বত্য, বৌদ্ধ, সূর্য, পৌরুষ, মেধাবী।

৬. ঠিক উন্নৱাচিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

ক. প্রাতিপদিক বলা হয়- বিভক্তিযুক্ত পদকে / সমস্যমান পদকে/ বিভক্তিহীন পদকে।

খ. বাংলা ভাষায় তদ্বিত প্রত্যয় - দুই প্রকার / তিন প্রকার / চার প্রকার

গ. ওয়ালা (দুধওয়ালা) - বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়

ঘ. উড় (লেজুড়) - বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়

ঙ. ইত (কসুমিত) বাংলা / বিদেশি / তৎসম তদ্বিত প্রত্যয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শব্দের শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হতে পারে।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) মৌলিক ও (খ) সাধিত
২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) যৌগিক, (খ) রূটি এবং (গ) যোগরূট
৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : (ক) তৎসম, (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তত্ত্ব (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি।

১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা তেওঁে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন – গোলাপ, নাক, লাজ, তিন।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। উদাহরণ : চাদমুখ (চাদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুবুরি (ডুব+উরি), চলন্ত (চল + অন্ত), প্রশাসন (প্র+শাসন), গরমিল (গর+মিল) ইত্যাদি।

২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ

অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিনি ভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. যৌগিক শব্দ

খ. রূটি বা রূটি শব্দ

গ. যোগরূট শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের বৃংগাণ্ডিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন-

গায়ক = গৈ + ক (অক) – অর্থ : গান করে যে।

কর্তব্য = কৃ + তব্য – অর্থ : যা করা উচিত।

বাবুয়ানা = বাবু + আনা – অর্থ : বাবুর ভাব।

মধুর = মধু + র – অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

দৌহিতা = দুহিতা+ত্ব্য – অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।

চিকামারা = চিকা+মারা – অর্থ : দেওয়ালের শিখন।

খ. রূটি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূটি শব্দ বলে। যেমন-হস্তী=হস্ত + ইন, অর্ধ-হস্ত আছে যার; কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো+এষণা) অর্থ- গরু খোজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

এ বক্তব্য-

- বাঁশি - বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
- তেল - শুধু তিলজাত মেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উচ্চিজ্জ্বল পদার্থজাত মেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন-
বাদাম-তেল।
- প্রবীণ - শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি ‘অভিজ্ঞতাসম্মত’
ব্যবস্ক ব্যক্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- সম্বেশ - শব্দ ও প্রত্যয়গত অর্থে ‘সংবাদ’। কিন্তু রূটি অর্থে ‘মিষ্টান্ন বিশেষ’।
- গ. যোগরূচি শব্দ : সমাস নিষ্পত্তি যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যামান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে কোনো
বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূচি শব্দ বলে। যেমন-
- পঙ্কজ - পঙ্কে জন্মে যা (উপগদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পঞ্চাঙ্গল প্রভৃতি নানাবিধি উদ্ধিদ পঙ্কে জন্মে
থাকে। কিন্তু ‘পঙ্কজ’ শব্দটি একমাত্র ‘পঞ্চাঙ্গল’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই পঙ্কজ একটি যোগরূচি শব্দ।
- রাজপুত - ‘রাজার পুত্র’ অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে ‘জাতিবিশেষ’।
- মহাযাত্রা - মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূচি শব্দরূপে অর্থ ‘মৃত্যু’।
- জলধি - ‘জল ধারণ করে এমন’ অর্থ পরিত্যাগ করে একমাত্র ‘সমুদ্র’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
৩. উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ : বাংলা ভাষা অধ্যায়ে বাংলা ভাষার শব্দভাস্তার পরিচেছে এ বিষয়ে বিশদ
আলোচনা করা হয়েছে।

অনুশীলনী

- ১। গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে। বিভাগগুলোর নাম লেখ।
- ২। অর্থগতভাবে বা অর্থের বিচার-বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে, উদাহরণসহ
উল্লেখ কর।
- ৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহ রূটি, যোগরূচি ও যৌগিক—এই তিনটি গুচ্ছে প্রদত্ত ছক অনুসারে সাজাও।
তাগিনেয়, জলধি, রাজপুত, রাজপুত্র, বাঁশি, তেল, সম্বেশ।

রূটি	যোগরূচি	যৌগিক শব্দ

- ৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বৃংপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থ লেখ।
ক) সম্বেশ খ) হরিগ গ) প্রবীণ ঘ) মহাযাত্রা
- ৫। নিচের শব্দগুলো কোনটি কোন শ্রেণিতে পড়ে দেখ।
নীলিমা, এক, জনৈক, হাত, ছেলেধরা, সাপ, আসমান-জমিন, বেহায়াপনা, সাপুড়িয়া, হাত-পা,
লাঞ্ছুক, সাঁবাদিক, পাগলামি, বাড়িওয়ালা, চা বাগান।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচেদ

পদ-প্রকরণ

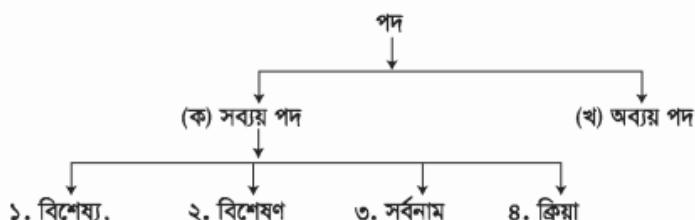
দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা মানুষের চিরন্তন কল্পনার রাজ্য টাদের দেশে পৌছেছেন এবং মঙ্গলগ্রহেও যাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন।

ওপরের বাক্যটিতে ‘রা’ (অভিযাত্রী + রা), ‘এর’ (মানুষ + এর), ‘র’ (কল্পনা + র), ‘এ’ (মঙ্গলগ্রহ + এ) প্রত্তি চিহ্নগুলোকে বিভক্তি বলা হয়।

বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।

পদগুলো প্রধানত দুই প্রকার : সব্যয় পদ ও অব্যয় পদ।

সব্যয় পদ চার প্রকার : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া। সুতরাং পদ মোট পাঁচ প্রকার : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া এবং অব্যয়।



আলোচ্য বাক্যটিতে

- | | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| ১. বিশেষ্য পদ | : অভিযাত্রী, মানুষ, কল্পনা, রাজ্য, দেশ, মঙ্গলগ্রহ |
| ২. বিশেষণ পদ | : দুঃসাহসী, চিরন্তন, প্রস্তুত |
| ৩. সর্বনাম পদ | : তাঁরা |
| ৪. ক্রিয়াপদ | : পৌছেছেন, হচ্ছেন, যাওয়ার (অসমাপিকা ক্রিয়া) |
| ৫. অব্যয় পদ | : এবং, জন্য |

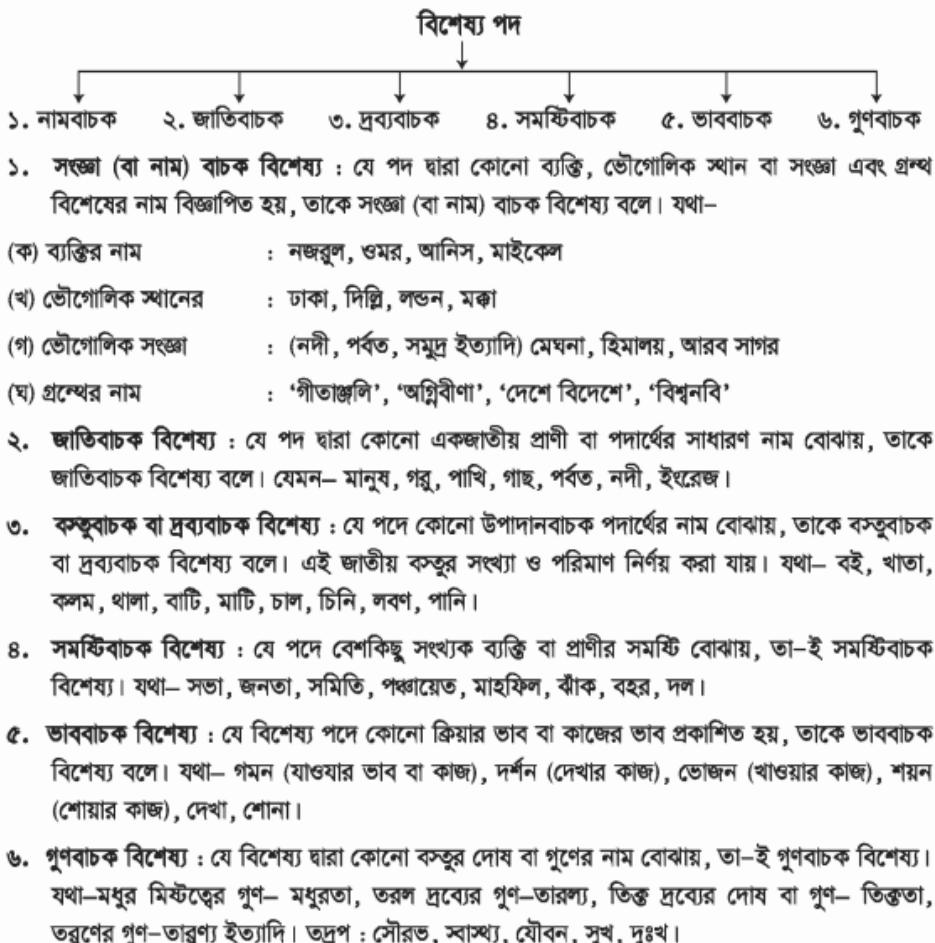
বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে।

বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, কল্পনা, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয় তাদের বিশেষ্য পদ বলে।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. কস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)



ବିଶେଷଣ ପଦ

ବିଶେଷଣ : ଯେ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ଓ କ୍ରିୟାପଦେର ଦୋସ, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବଲେ ।

ଚଳନ୍ତ ଗାଡ଼ି : ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ।

କରୁଣାମୟ ଭୂମି : ସର୍ବନାମେର ବିଶେଷଣ ।

ମୃତ ଚଳ : କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ।

ବିଶେଷଣ ଦୁଇ ଭାଗେ ବିଭିନ୍ନ । ସ୍ଥା-୧. ନାମ ବିଶେଷଣ ଓ ୨. ଭାବ ବିଶେଷଣ ।

୧. ନାମ ବିଶେଷଣ : ଯେ ବିଶେଷଣ ପଦ କୋନୋ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସର୍ବନାମ ପଦକେ ବିଶେଷିତ କରେ, ତାକେ ନାମ ବିଶେଷଣ ବଲେ । ସ୍ଥା-

ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ : ସୁମ୍ଭୁ ସବଳ ଦେହକେ କେ ନା ତାଲୋବାସେ?

ସର୍ବନାମେର ବିଶେଷଣ : ସେ ରୂପବାନ ଓ ଗୁଣବାନ ।

ନାମ ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାରରେ

କ.	ରୂପବାଚକ	: ନୀଳ ଆକାଶ, ସବୁଜ ମାଠ, କାଳୋ ମେଘ ।
ଖ.	ଗୁଣବାଚକ	: ଚୌକ୍କେ ଲୋକ, ଦକ୍ଷ କାରିଗର, ଠାଙ୍କା ହାଓୟା ।
ଗ.	ଅବସ୍ଥାବାଚକ	: ତାଜା ମାଛ, ରୋଗୀ ଛେଲେ, ହୌଡ଼ା ପା ।
ଘ.	ସଂଖ୍ୟାବାଚକ	: ହାଜାର ଲୋକ, ଦଶ ଦଶା, ଶଟକା ।
ঙ.	ତ୍ରୁମ୍ଭବାଚକ	: ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ, ସତର ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରଥମା କନ୍ୟା ।
ଚ.	ପରିମାଣବାଚକ	: ବିଘାଟେକ ଜମି, ପାଚ ଶତାଂଶ ଭୂମି, ହାଜାର ଟନୀ ଜାହାଜ, ଏକ କେଜି ଚାଲ, ଦୁ କିଲୋମିଟାର ରାସ୍ତା ।
ଛ.	ଅର୍ଥବାଚକ	: ଅର୍ଦ୍ଧକ ସମ୍ପଦ, ଶୋଇ ଆନା ଦରଲ, ସିକି ପଥ ।
ଜ.	ଉପାଦାନବାଚକ	: ବେଳେ ମାଟି, ମେଟେ କଲସି, ପାଥୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ।
ଘ.	ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ	: କତନ୍ଦୂର ପଥ? କେମନ ଅବସ୍ଥା?
ଙ୍ଗ.	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାଜାପକ	: ଏଇ ଲୋକ, ସେଇ ଛେଲେ, ଛାବିଥେ ମାର୍ଚ ।

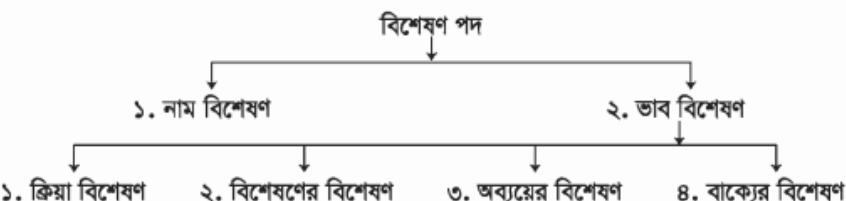
ବିଭିନ୍ନଭାବେ ବିଶେଷଣ ଗଠନର ପଞ୍ଚତି

କ.	କ୍ରିୟାଜାତ	: ହାରାନୋ ସମ୍ପଦି, ଖାବାର ପାନି, ଅନାଗତ ଦିନ ।
ଖ.	ଅବ୍ୟାଯଜାତ	: ଆଛା ମାନୁଷ, ଉପରି ପାଓନା, ହଠାତ୍ ବଡ଼ଲୋକ ।
ଗ.	ସର୍ବନାମ ଜାତ	: କବେକାର କଥା, କୋଥାକାର କେ, ସୀଯି ସମ୍ପଦି ।
ଘ.	ସମାସସିଦ୍ଧ	: ବେକାର, ନିୟମ-ବିରୁଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନହାରା, ଚୌଚାଲା ସର ।
ଙ୍ଗ.	ବୀକ୍ଷାମୂଳକ	: ହାସିହାସି ମୁଖ, କାନ୍ଦକାନ୍ଦ ଚେହାରା, ଡୁରୁଦୁରୁ ନୌକା ।
ଚ.	ଅନୁକାର ଅବ୍ୟାଯଜାତ	: କନକନେ ଶୀତ, ଶନଶନେ ହାଓୟା, ଧିକିଧିକି ଆଗୁନ, ଟୁଟୁଟୁସେ ଫଳ, ତକତକେ ମେବେ ।

- ছ. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
জ. তথিতান্ত : জাতীয় সম্পদ, নেতৃত্ব বল, মেঠো পথ।
ঝ. উপসর্গস্থুল : নিয়ুত কাজ, অগ্রহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
ঞ. বিদেশি : নাস্তিন্যাবুদ্ধ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপতনি তালুক।

২. ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ।

ভাব বিশেষণ চার প্রকার : ১. ক্রিয়া বিশেষণ ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।



১. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘর্ষনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা—

ক. ক্রিয়া সংগঠনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

খ. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

২. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা—

ক. নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দুর্ত চলে।

৩. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা— ধীকৃ তারে, শৰ্ক ধীকৃ নির্জল যে জন।

৪. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়। যেমন—

দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন

বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন— যমুনা একটি দীর্ঘ নদী, পদ্মা দীর্ঘতর, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য বৃহস্পতি, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে বৃহস্পতি এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

ক. বাংলা শব্দের অতিশায়ন

১. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে চাইতে, চেয়ে, হইতে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের পর কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। যথা—
 গুরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি।
 বাংলের চেয়ে সিংহ বলবান।
২. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সবচেয়ে, সব থেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা—
 নবম শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বৃদ্ধিমান। ভাইদের মধ্যে বিমলই সবচাইতে বিচক্ষণ। পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান।
৩. দূটি বস্তুর মধ্যে অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, বেশি, অল, কম, অধিকতর প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যথা—
 পদ্মফুল গোলাপের চাইতে অনেক সুন্দর। ধিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী। কমলার চাইতে পাতিলের অল ছোট।
৪. কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তিই চেয়ে, থেকে প্রভৃতি শব্দের কার্যসাধন করে। যেমন— এ মাটি সোনার বাড়া।

খ. তৎসম শব্দের অতিশায়ন

১. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ‘তর’ এবং বহুর মধ্যে ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন—
 গুরু—গুরুতর—গুরুতম। দীর্ঘ—দীর্ঘতর—দীর্ঘতম।
 কিন্তু ‘তর’ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণটি শুতিকু হলে ‘তর’ প্রত্যয় যোগ না করে বিশেষণের পূর্বে ‘অধিকতর’ শব্দটি যোগ করতে হয়। যেমন— অশ্ব হন্তী অপেক্ষা অধিকতর সুন্দী।
২. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও ‘তম’ প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন— মেঘনা বালাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহস্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।
৩. তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনায় ‘সৈয়স্’ প্রত্যয় এবং বহুর মধ্যে তুলনায় ‘ইষ্ট’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। বাংলায় সাধারণত ‘সৈয়স্’ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় না। যেমন—

মূল বিশেষণ	দুয়ের তুলনায়	বহুর তুলনায়
লঘু	লঘিয়ান	লঘিষ্ট
অল	কলীয়ান	কলিষ্ট
বৃদ্ধ	জ্যায়ান	জ্যেষ্ট
শ্রেয়	শ্রেয়ান	শ্রেষ্ট।

উদাহরণ : তিন ভাইয়ের মধ্যে রহিমই জ্যেষ্ঠ এবং করিম কনিষ্ঠ। সংখ্যাগুলোর উদ্বিষ্ট সাধারণ গুণিতক বের কর।

৪. ‘ইয়স্’ প্রত্যয়ান্ত কোনো কোনো শব্দের স্তুপ বাল্লা প্রচলিত আছে। যেমন— তুয়সী প্রশংসা।

একই পদের বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ

বাল্লা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

তালো	: বিশেষণ রূপে	- তালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য রূপে	- আপন তালো সবাই চায়।
মন্দ	: বিশেষণ রূপে	- মন্দ কথা বলতে নেই।
	বিশেষ্য রূপে	- এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে?
পুণ্য	: বিশেষণ রূপে	- তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য রূপে	- পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	: বিশেষণ রূপে	- নিশীথ রাতে বাজছে ঝাশি।
	বিশেষ্য রূপে	- গভীর নিশীথে প্রকৃতি সৃষ্টি।
শীত	: বিশেষণ রূপে	- শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
	বিশেষ্য রূপে	- শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অশ্রুকার।
সত্য	: বিশেষণ রূপে	- সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য রূপে	- এ এক বিরাট সত্য।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

সর্বনাম সাধারণত ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন— হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তাই শরীরটি যেন বিরাট এক মাহসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে ‘তার’ শব্দটি প্রথম বাক্যের ‘হস্তী’ বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই, ‘তার’ শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষ্যে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন—

ক. যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

খ. ধান ভানতে যারা শিবের গীত গায়, তারা স্থির লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

- (১) ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
- (২) আত্মবাচক : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
- (৩) সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
- (৪) দূরত্ববাচক : এই, এসব।
- (৫) সাকুল্যবাচক : সব, সকল, সমুদয়, তাৎ।
- (৬) প্রশ্নবাচক : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?
- (৭) অনিদিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
- (৮) ব্যতিহারিক : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
- (৯) সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
- (১০) অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ১. ব্যক্তিবাচক | ২. আত্মবাচক |
| ৩. সামীপ্যবাচক | ৪. দূরত্ববাচক |
| ৫. সাকুল্যবাচক | ৬. প্রশ্নবাচক |
| ৭. অনিদিষ্টতাজ্ঞাপক | ৮. ব্যতিহারিক |
| ৯. সংযোগজ্ঞাপক | ১০. অন্যাদিবাচক |

সর্বনামের পুরুষ

‘পুরুষ’ একটি পারিভাষিক শব্দ। বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারই পুরুষ আছে। বিশেষণ ও অব্যয়ের পুরুষ নেই। ব্যাকরণে পুরুষ তিনি প্রকার।

১. উভ্যম পুরুষ : স্বয়ং বক্তাই উভ্যম পুরুষ। আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ উভ্যম পুরুষ।
২. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাদের প্রতৃষ্ঠি সর্বনাম শব্দ মধ্যম পুরুষ।

৩. নাম পুরুষ : অনুগস্থিত অথবা পরোভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাকে, তারা, তাদের প্রতিই নাম পুরুষ। (সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ)।



ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপ

পুরুষত্বে ব্যক্তিবাচক সর্বনামগুলোর রূপ

রূপ	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	নাম পুরুষ
সাধারণ	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের; কবিতায় : মোর, মোরা	ভূমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে
সন্ত্বারাক		আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের	তিনি, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাদের, তাহাদিগকে, তাদেরকে, তাহাকে, তাকে, ইনি, এঁর, এঁরা, ইহাদের, এঁদের, ইহাকে, এঁকে, উনি, উঁর, উঁরা, উঁদের
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক			ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের

সর্বনামের বিভক্তিগুলী রূপ : বাংলা সর্বনামসমূহ কর্তৃকারক ভিন্ন অন্যান্য কারককে বিভক্তিযুক্ত হওয়ার পূর্বে একটি বিশেষ রূপ পরিষ্ঠাহ করে। সর্বনামের এ রূপটিকে বিভক্তিগুলী রূপ বলা হয়।

কর্তৃকারককে সর্বনামের মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয় এবং একে প্রথমা বিভক্তিযুক্ত একবচন ধরা হয়।

কর্তৃকারককে প্রথমার একবচন		অন্যান্য কারককে বিভক্তিগুলী রূপ		
সাধারণ	সন্ত্বারাক	তুচ্ছার্থক	সন্ত্বারাক	তুচ্ছার্থক
আমি				
ভূমি	আপনি	তুই	আপনা	তোমা, তো
সে	তিনি		তাহা, তাঁ	তাহা, তা
যে	যিনি		যাহা, যা	যাহা, যা
	ইনি	এ	ইহা, এঁ	ইহা, এ
	উনি	উহা	উহা, উঁ	উহা, ও
কে, কি, কী		কে, কি, কী		কাহা, কা

জ্ঞাতব্য

১. চলিত ভাষায়—

- (ক) তুচ্ছার্থে তাহা স্থানে তা, যাহা স্থানে যা, কাহা স্থানে কা, ইহা স্থানে এ, উহা স্থানে ও আদেশ হয়।
- (খ) সন্তুষ্মার্থে এগুলোর সাথে একটি চম্পুকিপু সংযোজিত হয়। যথা— তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)। (সন্তুষ্মার্থে) তাহা + দের = তাহাদের (সাধু) > তাদের (চলিত)।
২. করণ কারকে অনুসর্গ ব্যবহারের পূর্বে মূল সর্বনাম শব্দের সঙ্গে র, এর বা কে বিভক্তি যোগ করে নিতে হয়। যেমন— তাহাকে দিয়া, তাকে দিয়ে, তাহার দারা, তার দারা, আমাকে দিয়ে।
৩. ষষ্ঠী বিভক্তি অর্থে ইয়—প্রত্যয়যুক্ত সর্বনামজ্ঞাত বিশেষণ শুধু তৎসম সর্বনামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যথা :
মৎ+ ইয় = মদীয়, তৎ+ ইয় = তবদীয়, তৎ+ ঈয় = তদীয়।
৪. ‘কী’ সর্বনামটি কোনো কোনো কারকে ‘কিসে’ বা (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে) ‘কীসের’ রূপ গ্রহণ করে। যথা :
কী + দারা = কীসের দারা, কী + থেকে = কীসে থেকে, কীসের থেকে।

সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. বিনয় প্রকাশে উন্নত পুরুষের একবচনে দীন, অধম, বাল্দা, সেবক, দাস প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—
‘আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে’। ‘দীনের আরজ’।
২. ছন্দবন্ধ কবিতায় সাধারণত ‘আমার’ স্থানে মম, ‘আমাদের’ স্থানে মোদের এবং ‘আমরা’ স্থানে মোরা
ব্যবহৃত হয়। যেমন — ‘কে বুঁধিবে ব্যথা মম’। ‘মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি! বাংলা ভাষা’।
‘ক্ষুদ্র শিশু মোরা, করি তোমারি ক্ষদনা’।
৩. উপাস্যের প্রতি সাধারণত ‘আপনি’ স্থানে তুমি প্রযুক্ত হয়। যেমন— (উপাস্যের প্রতি ভক্ত) ‘প্রভু, তুমি রক্ষা
কর এ দীন সেবকে।’
৪. অভিনন্দনপত্র রচনায়ও অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিকে ‘তুমি’ সম্মোধন করা হয়।
৫. তুমি : ঘনিষ্ঠজন, আপনজন বা সমবয়স্ক সাথীদের প্রতি ব্যবহার্য।
তুই : তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, ঘনিষ্ঠতা বোঝাতেও আমরা তাই ব্যবহার করি।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে
কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, সেগুলোর একবচন বা বহুবচন হয় না এবং সেগুলোর স্তুতি ও পুরুষবাচকতা
নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা
বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে— বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হ্যা, না ইত্যাদি।
২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাত, অর্থাৎ, দৈবাত, বরৎ, পুনর্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। ‘এবৎ’ ও ‘সুতরাত’ তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবৎ’ শব্দের অর্থ এমন, আর ‘সুতরাত’ অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবৎ = ও (বাংলা), সুতরাত = অতএব (বাংলা)।

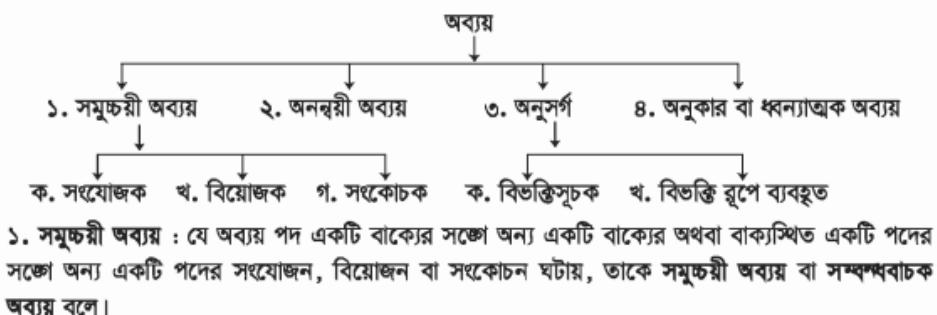
৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, থাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে : ছি ছি, ধিক ধিক, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৩. দুটি ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

অব্যয়ের প্রকারভেদ

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার : ১. সমুচ্চয়ী, ২. অনন্তৰ্যী, ৩. অনুসর্গ, ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।



- (i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।
- (ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্ৰদ্ধা করে। এখানে ‘তাই’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাত শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

- (i) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী।
- এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে।
- (ii) ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক। আমরা ঢেক্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক। বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে ‘অথচ’ অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে তাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে। তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গা হওয়ার আশঙ্কা আছে।

২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. অনুষ্ঠয়ী অব্যয় : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনুষ্ঠয়ী অব্যয় বলে। যেমন-

ক. উচ্ছ্঵াস প্রকাশ : মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : ইঝা, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আঙ্গুল যাব। নিচয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদনবাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।

ঙ. সমর্থনসূচক জ্ঞাবাবে : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।

চ. যত্নগো প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড় লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ! কী আপনি! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. সম্মোধনে : ‘ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’

ঝ. সম্ভাবনায় : ‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে পাছে লোকে কিছু বলে।’

ঝঃ. বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নির্বর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন-

১. কৃত না হারানো শৃঙ্খলাগে আজও মনে।

২. ‘হায়রে তাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সত্তা, কোথায় সংজ্ঞা।’

৩. অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ ও সর্বনাম পদের বিভিন্ন ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যথা— ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় ‘পদানুয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার : ক. বিভিন্নসূচক অব্যয় এবং খ. বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪. অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যথা—

বস্ত্রের ধ্বনি— কড় কড়	মেঘের গর্জন — গুড় গুড়
বৃক্ষের তুমুল শব্দ — ঝম ঝম	সিংহের গর্জন — গর গর
দ্রোতের ধ্বনি — কল কল	ঘোড়ার ডাক — চিহি চিহি
বাতাসের গতি — শন শন	কাকের ডাক— কা কা
শুষ্ক পাতার শব্দ — মর মর	কোকিলের রব — কুকু কুকু
নৃপুরের আওয়াজ — ঝুম ঝুম	চুড়ির শব্দ — টুং টাঁ

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের শ্রেণিভুক্ত। যথা—

ঝা ঝা (প্রথরতাবাচক), ঝী ঝী (শূন্যতাবাচক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ঝল মল, চক চক, ছম ছম, টন টন, খট খট ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

ক. অব্যয় বিশেষণ : কতগুলো অব্যয় বাকে ব্যবহৃত হলে নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থবাচকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যথা—

নাম-বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

তাব-বিশেষণ : আবার যেতে হবে।

ক্রিয়া-বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় : কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা—তথা, যত—তত, যখন—তখন, যেমন—তেমন, যেরূপ—সেরূপ ইত্যাদি। উদাহরণ—যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ণে না।

গ. ত (সত্ত্বকৃত তস) প্রত্যয়ান্ত অব্যয় : এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যথা — ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. আর — পুনরাবৃত্তি অর্থে	: ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে	: বল, আর কী চাও?
নিরাশায়	: সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকারে	: আর কি বাজবে বাণি?

୨. ଓ – ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥେ	:	କରିମ ଓ ରାହିମ ଦୁଇ ଭାଇ ।
ସଞ୍ଚାବନାୟ	:	ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହତେଓ ପାରେ ।
ତୁଳନାୟ	:	ଓକେ ବଳାଓ ଯା, ନା ବଳାଓ ତା ।
ସୀକୃତି ଜ୍ଞାପନେ	:	ଖେତେ ଯାବେ ? ଗେଲେଓ ହୟ ।
ହତୋଶା ଜ୍ଞାପନେ	:	ଏତ ଚେଷ୍ଟାତେଓ ହଲୋ ନା ।
୩. କି/କୀ – ଜିଜ୍ଞାସାୟ	:	“ତୁମି କି ବାଡ଼ି ଯାଛ ?
ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶେ	:	କୀ ବିପଦ, ଲୋକଟା ଯେ ପିଛୁ ଛାଡ଼େ ନା ।
ସାକ୍ଷ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥେ	:	କି ଆମୀର କି ଫବିର, ଏବଦିନ ସବଲକେଇ ଯେତେ ହବେ ।
ବିଡୁଷନା ପ୍ରକାଶେ	:	ତୋମାକେ ନିଯେ କୀ ମୁଶକିଲେଇ ନା ପଡ଼ାମ ।
୪. ନା – ନିଷେଧ ଅର୍ଥେ	:	ଏଥନ ହେଓ ନା ।
ବିକର ପ୍ରକାଶେ	:	ତିନି ଯାବେନ, ନା ହୟ ଆମି ଯାବ ।
ଆଦର ପ୍ରକାଶେ ବା ଅନୁରୋଧେ	:	ଆର ଏକଟି ମିଷ୍ଟି ଥାଓ ନା ଥୋକା । ଆର ଏକଟା ଗାନ ଗାଓ ନା ।
ସଞ୍ଚାବନାୟ	:	ତିନି ନା କି ଢାକାଯ ଯାବେନ ।
ବିଅଯେ	:	କୀ କରେଇ ନା ଦିନ କାଟାଇ ।
ତୁଳନାୟ	:	ଛେଲେ ତୋ ନା, ଯେନ ଏକଟା ହିଟଗାର ।
୫. ଯେନ – ଉପମାୟ	:	ମୁଖ ଯେନ ପରାଫୁଲ ।
ପ୍ରାର୍ଥନାୟ	:	ଖୋଦା ଯେନ ତୋମାର ମଜାଲ କରେନ ।
ତୁଳନାୟ	:	ଇସ୍, ଠଣ୍ଡା ଯେନ ବରଫ ।
ଅନୁମାନେ	:	ଲୋକଟା ଯେନ ଆମାର ପରିଚିତ ମନେ ହଲୋ ।
ସତର୍କିକରଣେ	:	ସାବଧାନେ ଚଲ, ଯେନ ପା ପିଛଲେ ନା ପଡ଼ ।
ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ	:	ଛେଲେ ତୋ ନୟ ଯେନ ନନୀର ପୁତୁଳ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରଟି ଉତ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସରଟିର ପାଶେ ଟିକ (✓) ଚିହ୍ନ ଦାଓ ।

(i) ପଦ କ୍ୟ ପ୍ରକାର ?

କ. ଚାର

ଗ. ଛୟ

ଘ. ପୀଚ

ଘ. ସାତ

- (ii) বিশেষ্য পদ কয় প্রকার?
 ক. তিন
 খ. চার
 গ. শীচ
 ঘ. ছয়
- (iii) ভাববিশেষ কয় প্রকার ?
 ক. দুই
 খ. তিন
 গ. চার
 ঘ. পাঁচ
- (iv) সর্বনাম পদ কয় প্রকার?
 ক. দশ
 খ. নয়
 গ. আট
 ঘ. সাত
- (v) অব্যয় পদ কয় প্রকার?
 ক. তিন
 খ. চার
 গ. শীচ
 ঘ. ছয়
- (vi) কোনটি সম্মোগজ্ঞাপক সর্বনাম?
 ক. যারা-তারা
 খ. তোরা
 গ. এরা
 ঘ. কারা
- (vii) কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে?
 ক. ধীরে চল
 খ. সে গুণবান
 গ. ঘোড়া খুব মুত চলে
 ঘ. মেটে কলসি
- (viii) কোনটি ভাববাচক বিশেষ্য?
 ক. তোজন
 খ. সৌরভ
 গ. চিনি
 ঘ. জনতা
- (ix) কোনটিতে বস্তুবাচক বিশেষ্য রয়েছে?
 ক. সবুজ মাঠ
 খ. তাজা মাছ
 গ. বেলে মাটি
 ঘ. অর্দেক পথ
- (x) কোন বাক্যের মোটা অক্ষরটি অনন্বয়ী অব্যয়?
 ক. তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।
 খ. বৃক্ষ পড়ে ঝামৰাম।
 গ. তুমি ভালো ছাত্র তাই তোমাকে সবাই ভালোবাসে।
 ঘ. উঁ বড় লেগেছে।

- ২। পদ বলতে কী বোঝ? পদ প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত হতে পারে?
- ৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে যে সমস্ত বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো প্রকারভেদ অনুসারে সাজাও।
 ক. নজরুল বাংলাদেশের চিরস্মরণীয় কবি।
 খ. তাঁর কাব্য প্রতিভা জাতিকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছে।
 গ. ‘ঠোকাঠুকি লেগে গেল বরগাকড়িতে।’
 ঘ. ‘জীবন, যৌবন, বল সকলই যুচায় কাল, আয় যেন পদ্মপত্রে নীর।’
- ৪। নাম বিশেষণকে আমরা কয় ভাগ করতে পারি? প্রত্যেকটি ভাগের উদাহরণ দাও।
- ৫। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক, প্রশ্নবাচক, নাম বিশেষণের উদাহরণ দাও।
- ৬। ক্রিয়া, অব্যয় ও সর্বনামজ্ঞাত বিশেষণ পদের উদাহরণ দাও এবং বাকে প্রয়োগ দেখাও।
- ৭। ‘বিশেষণের অতিশায়ন’ বলতে কী বোঝ? খাঁটি বাংলা বিশেষণ শব্দের অতিশায়নের বিষয়সমূহ বিশদ আলোচনা কর।
- ৮। বাক্যগঠনে অতিশায়নের ভূল থাকলে শুন্ধ কর।
 মেঘনা বাংলাদেশের অধিকতম দীর্ঘতর নদী। হস্তী অশ্ব অপেক্ষা বলবস্তর। সভায় তার ভূয়াসন প্রশংসা হয়েছিল। তাইদের মধ্যে মুমিনই সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতম।
- ৯। কেন কোন ক্ষেত্রে সর্বনামের সন্তুষ্মান্ত্বক বৃপ্তি ব্যবহৃত হয়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।
- ১০। ‘তুই’ ও ‘তুমি’ সর্বনামের ব্যবহারবিধি লেখ।
- ১১। স্বরচিত বাকে উদাহরণ দাও।
 সংকেচন অব্যয়, সম্ভাবনা ও সম্ভতি প্রকাশে অনন্ধয়ী অব্যয়, অনুভূতিগ্রাহ্য অনুকার অব্যয়।
- ১২। বিভিন্ন অর্থে ‘ও’ এবং ‘না’ অব্যয়ের ব্যবহার দেখাও।
- ১৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ রূপে বাকে প্রয়োগ দেখাও।
 ধনী, সাধু, কাল, মধু, সুন্দর, গোলাপ, পুণ্য
- ১৪। বাকে প্রয়োগ দেখাও।
 ভাববাচক, বিশেষ্য, বিশেষণ, বৃপ্তবাচক বিশেষণ, দূরত্বজ্ঞাপক সর্বনাম, অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়, সমুচ্ছয়ী অব্যয়।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚେତ କ୍ରିୟାପଦ

୧. କବିର ବହି ପଡ଼ୁଛେ ।

୨. ତୋମରା ଆଗାମୀ ବହର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ।

‘ପଡ଼ୁଛେ’ ଏବଂ ‘ଦେବେ’ ପଦ ଦୁଟୀ ଦାରା କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଛେ ବଲେ ଏବା କ୍ରିୟାପଦ ।

ଯେ ପଦେର ଦାରା କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରା ବୋବାଯୁ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ ।

ବାକ୍ୟେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେ ପଦ ଦାରା କୋନୋ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳେ କୋନୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନ ବୋବାଯୁ, ତାକେ କ୍ରିୟାପଦ ବଲେ । ଉପରେର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣେ ନାମ ପୁରୁଷ ‘କବିର’ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ‘ପଡ଼ା’ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଘଟନ ପ୍ରକାଶ କରାଛେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ, ‘ତୋମରା’ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରିୟା ସଂଘଟନର ସନ୍ଧାବନା ପ୍ରକାଶ କରାଛେ ।

କ୍ରିୟାପଦେର ଗଠନ : କ୍ରିୟାମୂଳ ବା ଧାତୁର ସଙ୍ଗେ ପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ କାଳସୂଚକ କ୍ରିୟାବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠନ କରାତେ ହୁଏ । ଯେମନ –

‘ପଡ଼ୁଛେ’ – ପଡ଼ ‘ଧାତୁ’ + ‘ଛେ’ ବିଭକ୍ତି ।

ଅନୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ : କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟଗଠନେ ଅପରିହାର୍ୟ ଅଞ୍ଜଳି । କ୍ରିୟାପଦ ଭିନ୍ନ କୋନୋ ମନୋଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଯା ନା । ତବେ କଥନେ କଥନେ ବାକ୍ୟେ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ବା ଅନୁକ୍ତ ଥାକତେ ପାରେ । ଯେମନ –

ଇନି ଆମାର ଭାଇ = ଇନି ଆମାର ଭାଇ (ହୁଏ) ।

ଆଜ ପ୍ରଚକ୍ରିୟାପଦ = ଆଜ ପ୍ରଚକ୍ରିୟାପଦ (ଅନୁକ୍ତ ହୁଛେ) ।

ତୋମାର ମା କେମନ ? = ତୋମାର ମା କେମନ (ଆଛେନ) ?

ବାକ୍ୟେ ସାଧାରଣତ ‘ହୁ’ ଏବଂ ‘ଆଛ’ ଧାତୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାପଦ ଉହ୍ୟ ଥାକେ ।

କ୍ରିୟାର ପ୍ରକାରଭେଦ

ବିବିଧ ଅର୍ଥେ କ୍ରିୟାପଦକେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହୁଏ ଥାକେ ।

୧. ଭାବ ପ୍ରକାଶେର ଦିକ ଦିଯେ କ୍ରିୟାପଦକେ ଦୁଇ ଭାଗେ ଭାଗ କରା ଯାଯା-କ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଏବଂ ଖ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ।

କ. ସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ଦାରା ବାକ୍ୟେର (ମନୋଭାବେ) ପରିସମାପିତ ଜ୍ଞାପିତ ହୁଏ, ତାକେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ – ଛେଲେରା ଖେଳା କରାଏ । ଏ ବହର ବନ୍ୟାଯ ଫୁଲେର କ୍ଷତି ହୁଯେହେ ।

ଖ. ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା : ଯେ କ୍ରିୟା ଦାରା ବାକ୍ୟେର ପରିସମାପିତ ଘଟେ ନା, ବନ୍ତାର କଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥେକେ ଯାଯା, ତାକେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବଲେ । ଯେମନ –

୧. ପ୍ରଭାତେ ସୂର୍ୟ ଉଠିଲେ

୨. ଆମରା ହାତ-ମୁଖ ଧୁଯେ

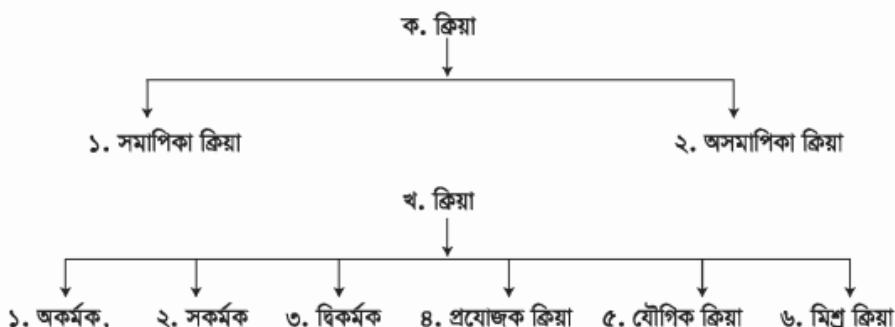
৩. আমরা বিকেলে খেলতে

এখানে, ‘উঠলে’ ‘ধূয়ে’ এবং ‘খেলতে’ ক্রিয়াপদগুলোর দ্বারা কথা শেষ হয়নি; কথা সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই এ শব্দগুলো অসমাপিকা ক্রিয়া।

উপর্যুক্ত বাক্যগুলো পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন করলে দাঁড়াবে-

১. প্রভাতে সূর্য উঠলে অশ্বকার দূর হয়।
২. আমরা হাত মুখ ধূয়ে পড়তে বসলাম।
৩. আমরা বিকেলে খেলতে যাই।

পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠন করতে হলে সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ইয়া (পড়িয়া), ইলে (পড়িলে), ইতে (পড়িতে), এ (পড়ে), লে (পড়লে), তে (পড়তে) বিভিন্ন্যুক্ত ক্রিয়াপদ অসমাপিকা ক্রিয়া।



২. সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা—ই সকর্মক ক্রিয়া। ক্রিয়ার সাথে কী বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উন্নত পাওয়া যায়, তা—ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন—বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কী দিয়েছেন?

উত্তর : কলম (কর্মপদ)।

প্রশ্ন : কাকে দিয়েছেন?

উত্তর : আমাকে (কর্মপদ)।

‘দিয়েছেন’ ক্রিয়াপদটির কর্ম পদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন—মেয়েটি হাসে। ‘কী হাসে’ বা ‘কাকে হাসে’ প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর হয় না। কাজেই ‘হাসে’ ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া।

দিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দিকর্মক ক্রিয়া বলে।

দিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে গৌণ কর্ম বলে। বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন বাক্যে ‘কলম’ (বস্তু) মুখ্যকর্ম এবং ‘আমাকে’ (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা

ধাতৃর্থক কর্মপদ বলে। যেমন— আর কত খেলা খেলবে। মূল ‘খেল’ ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ ‘খেলবে’ এবং কর্মপদ ‘খেলা’ উভয়ই গঠিত হয়েছে। তাই ‘খেলা’ পদটি সমধাতুজ বা ধাতৃর্থক কর্ম।

সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন—

এমন সুখের মরণ কে মরতে পারে?

বেশ এক দূর ঘূরিয়েছি।

আর মাঝাকান্না কেঁদো না গো বাপু।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক হতে পারে। যেমন—

অকর্মক

আমি চোখে দেখি না।

ছেলেটা কানে শোনে না।

আমি রাতে খাব না।

অশ্঵কারে আমার খুব ভয় করে।

সকর্মক

আকাশে চাঁদ দেখি না।

ছেলেটা কথা শোনে।

আমি রাতে ভাত খাব না।

বাবাকে আমার খুব ভয় করে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। (সংকৃত ব্যাকরণে একে গিজন্ত ক্রিয়া বলা হয়)

প্রযোজক ক্রিয়া : যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে।

প্রযোজ্য কর্তা : যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন—

প্রযোজক কর্তা

মা

(তুমি)

সামুড়ে

প্রযোজ্য কর্তা

শিশুকে

থোকাকে

সাপ

প্রযোজক ক্রিয়া

চাঁদ দেখাছেন।

কাদিও না।

খেলায়।

জ্ঞাতব্য : প্রযোজক ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়।

প্রযোজক ক্রিয়ার গঠন : প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু = মূল ক্রিয়ার ধাতু + আ। যেমন মূল ধাতু $\sqrt{\text{হাস}}$ + আ = হাসা (প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু)। হাসা + ছেন বিভক্তি = হাসাচ্ছেন (প্রযোজক ক্রিয়া)।

৪. নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ, বিশেষণ এবং ধ্বনাত্মক অব্যয়ের পরে ‘আ’ প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন—

ক. বেত (বিশেষ) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)। যথা—

শিক্ষক ছাত্রাদিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

খ. বাঁকা (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)। যথা—

কফিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয় : কল কল – দাঁতটি ব্যাখ্যায় কলকলাচ্ছে। ফৌস – অজগরটি ফৌসাচ্ছে।

আ-প্রত্যয় মুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিচু ফলেছে।

টক - তরকারি বাসি হলে টকে।

ছাপা- আমার বন্ধু বইটা ছেপেছে।

৫। ঘোষিক ক্রিয়া : একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থে প্রকাশ করে, তবে তাকে ঘোষিক ক্রিয়া বলে। যেমন-

ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা শুনে রাখ।

খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি বলতে শাগলেন।

গ. কার্যসম্পাদ্য অর্থে : ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল।

ঘ. আকর্তৃকতা অর্থে : সাইরেন বেজে উঠল।

ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।

চ. অনুমোদন অর্থে : এখন যেতে পার।

৬। মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে ক্ৰ., হ., দে., পা., যা, কাট., গা, ছাড়., ধৰ., মাৰ., প্ৰচৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন-

ক. বিশেষের উভয় (পরে) : আমরা তাজমহল দৰ্শন কৱলাম। এখন গোপ্তায় যাও।

খ. বিশেষণের উভয় (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ প্ৰীত হলাম।

গ. ধ্বনাত্মক অব্যয়ের উভয় (পরে) : মাথা বিম বিম কৰছে। বাম্ বাম্ কৰে বৃক্ষি পড়ছে।

ক্রিয়ার ভাব (Mood)

১. সূর্য অস্ত যাচ্ছে।
২. এখন বাঢ়ি যাও।
৩. সে পড়লে পাশ কৱত।
৪. তোমার কল্যাণ হোক।

ওপৱের বাক্যগুলোতে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

ক্রিয়ার যে অবস্থার দ্বারা তা ঘটার ধৰন বা রীতি প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।

ক্রিয়ার ভাব বা ধৰন চার প্রকার

১. নির্দেশক ভাব (Indicative Mood)
২. অনুজ্ঞা ভাব (Imperative Mood)
৩. সাপেক্ষ ভাব (Subjunctive Mood)
৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব (Optative Mood)



১. নির্দেশক ভাব : সাধারণ ঘটনা নির্দেশ করলে বা কিছু জিজ্ঞাসা করলে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব হয়।

যথা—

ক. সাধারণ নির্দেশক : আমরা বই পড়ি। তারা বাড়ি যাবে।

খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় : আপনি কি আসবেন? সে কি গিয়েছিল?

২. অনুজ্ঞা ভাব : আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ ইত্যাদি সূচিত হলে ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন—

ক. আদেশাত্মক : বর্তমান কালে — চূপ কর।

: ভবিষ্যৎ কালে — তুমি কাল যেও।

খ. নিষেধাত্মক : বর্তমান কালে — অন্যায় কাজ করো না।

: ভবিষ্যৎ কালে — মিথ্যা বলবে না।

গ. অনুরোধসূচক : বর্তমান কালে — ছাতাটা দিন তো ভাই।

: ভবিষ্যৎ কালে — আপনারা আসবেন।

ঘ. উপদেশাত্মক : বর্তমানে কালে — মন দিয়ে পড়।

: ভবিষ্যৎ কালে — স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো।

৩. সাপেক্ষ ভাব : একটি ক্রিয়ার সংঘটন অন্য একটি ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে, নির্ভরশীল ক্রিয়াকে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—

ক. সম্ভাবনায় : তিনি ফিরে এলে সবকিছুর মীমাংসা হবে। যদি সে গড়ত তবে পাশ করত।

খ. উদ্দেশ্য বোঝাতে : ভালো করে পড়লে সফল হবে।

গ. ইচ্ছা বা কামনায় : আজ বাবা বেঁচে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না।

৪. আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব : যে ক্রিয়াপদে বক্তা সোজাসুজি কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তাকে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের ক্রিয়া বলা হয়। যেমন—সে যাক। যা হয় হোক। সে একটু হাসুক। বৃষ্টি আসে আসুক। তার মঙ্গল হোক।

অনুশীলনী

১। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উভয় দেওয়া হয়েছে। ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) টিক দাও।

(i) কোন বাক্যটিতে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে?

ক. আমি ঘূম থেকে জেগেছি।

খ. আমি বেশ এক ঘূম ঘুমিয়েছি।

গ. আমি বেশ ঘূম দিয়েছি।

ঘ. তোমার ভালো ঘূম হয়েছিল তো?

(ii) কোনটি মিশ্র ক্রিয়া?

ক. গোলায় যাও।

খ. কলকলাচ্ছ।

গ. বেজে ওঠা।

ঘ. দেখাচ্ছেন।

(iii) কোন বাক্যটি অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ করছে?

ক. আমি বাঢ়ি যাই।

খ. মন দিয়ে লেখাপড়া কর।

গ. পরিশ্রম করলে সফল হবে।

ঘ. তার মঙ্গল হোক।

(iv) কোন বাক্যটিতে নামধাতুর ক্রিয়াপদ রয়েছে?

ক. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

খ. আমরা কৃতুবমিনার দর্শন করলাম।

গ. শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন।

ঘ. ভূমি যেতে পার।

(v) কোন বাক্যটি সাপেক্ষ ভাব প্রকাশ করছে?

ক. আমাকে বই দাও।

খ. যদি সে যেত, আমি আসতাম।

গ. তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ঘ. রেবা ভালো গান করে।

(vi) কোন বাক্যটিতে যৌগিক ক্রিয়াপদ রয়েছে?

ক. ভূমি এখন গান করতে পার।

খ. আমি এইমাত্র এলাম।

গ. শিক্ষক মহোদয় বাংলা পড়াচ্ছেন।

ঘ. হামিদকে দেখে খুশি হলাম।

(vii) কোন বাক্যটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

ক. চল খেলতে যাই।

খ. আর মায়াকান্না কেঁদো না।

গ. আমাকে বইটা দাও।

ঘ. সাপুড়ে সাপ খেলায়।

(viii) কোন বাক্যটির ক্রিয়া সকর্মক?

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ক. চুপ করে থাক। | খ. আকাশের টাঁদ যেন মাটিতে নেমেছে। |
| গ. আকাশে টাঁদ উঠেছে। | ঘ. শিশুটি কাঁদে। |

(ix) কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ক. মাথা বিম বিম করছে। | খ. তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে। |
| গ. মা শিশুটিকে হাসান। | ঘ. শিশুটি কাঁদে। |

(x) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া আছে?

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| ক. এ নদীতে প্রচুর মাছ আছে। | খ. আমরা হাত-মুখ ধূয়ে বেড়াতে বের হব। |
| গ. ঝুপকথার গল্ল শোন। | ঘ. তুমি কোথায় যাচ্ছ? |

- ২। ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।
- ৩। বাংলা বাক্য গঠনে কোন কোন ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে? উদাহরণ দাও।
- ৪। সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ সহযোগে বিশদ ব্যাখ্যা কর।
- ৫। শূন্যস্থান পূরণ কর
 - ক. দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মপদটিকে বলা হয় এবং ব্যক্তিবাচক কর্মপদটিকে বলা হয়।
 - খ. বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একটি থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলা হয়।
- ৬। প্রযোজক ক্রিয়া এবং নামধাতু ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।
- ৭। যৌগিক ক্রিয়া কাকে বলে? যৌগিক ও মিশ্র ক্রিয়ার পার্থক্য লেখ।
- ৮। যৌগিক ক্রিয়া গঠনের উপায় কী? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে দাও।
- ৯। ‘ক্রিয়ার ভাব’ বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে সাপেক্ষ ভাবের ক্রিয়াপদের তিনটি উদাহরণ দাও।
- ১০। ‘আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব’ বলতে কী বোঝ? বাক্য গঠন করে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাবের প্রয়োগ দেখাও।

তৃতীয় পরিচেছন

কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

১. আমরা বই পড়ি। ‘পড়া’ ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।
 ২. কাল তৃমি শহরে গিয়েছিলে। ‘যাওয়া’ ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।
 ৩. আগামীকাল স্কুল বন্ধ থাকবে। ‘বন্ধ থাকা’ কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।
- সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।
- এ হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদ : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন-

আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যাই। তিনি যান।

(সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।)

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যথা-

আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনরা) যান। সে (বা তারা) যাই।
তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সন্ত্রমাত্রক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে
(উভয় পুরুষে হয় না)। যেমন –

সাধারণ	সন্ত্রমাত্রক	তুচ্ছার্থক/সন্তোষার্থক
উভয় পুরুষ	আমি যাই	--
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও	আপনি যান
	তোমরা যাও	আপনরা যান
নাম পুরুষ	সে যাই	তিনি যান
	তারা যাই	তাঁরা যান

কালের প্রকারভেদ

ক্রিয়া সংঘটনের প্রধান কাল বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. বর্তমান কাল : **ক.** সাধারণ বর্তমান বা নিয়ন্ত্রিত বর্তমান

খ. ঘটমান বর্তমান

গ. পুরাপদ্ধতি বর্তমান

২. অতীত কাল : ক. সাধারণ অতীত
খ. নিত্যবৃত্ত অতীত
গ. ঘটমান অতীত
ঘ. পুরাঘটিত অতীত।
৩. ভবিষ্যৎ কাল : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ^১
খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ^২
গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ^৩

বর্তমান কাল

১. সাধারণ বর্তমান কাল : যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন— সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

ক. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্থানবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যথা—

- সম্ম্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্থানবিকতা)
আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

- (১) স্থায়ী সত্য প্রকাশে : চার আর তিনে সাত হয়।
- (২) ঐতিহাসিক বর্তমান : অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে।
যেমন—
বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।
- (৩) কাব্যের ভণিতায় : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।
- (৪) অনিচ্ছিত প্রকাশে : কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।
- (৫) ‘যদি’, ‘যখন’, ‘যেন’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন—
বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব।
সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে।
বিগদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।
- (২) প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চঙ্গীদাস বলেন, ‘সবার উপরে মানুষ
সত্য, তাহার উপরে নাই।’
- (৩) বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।
- (৪) ‘নেই’, ‘নাই’ বা ‘নি’ শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে যালনি।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল
ব্যবহৃত হয়। যথা—হাসান বই পড়ছে। নীরা গান গাইছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

- (১) বক্তৃর প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা—বক্তা বললেন, “শত্রুর অত্যাচারে
দেশ আজ বিপন্ন, ধন—সম্পদ শুষ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।”
 - (২) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই আসছি।
- গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান
কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন—
- এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।
- এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত : বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংযোগে কালই সাধারণ অতীত
কাল। যেমন—

প্রদীপ নিতে গেল। শিকারি পাখিটিকে গুলি করল।

সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : ‘এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।’
 - (২) বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় হলাম।
২. নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
বলে। যেমন—
- আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ করতাম।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার

- (১) কামনা প্রকাশে : আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।

(২) অসম্ভব কল্পনায় : ‘সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ’।

(৩) সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে তাগোই হতো।

৩. ঘটমান অভীত কাল : অভীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি—কিয়া সংঘটনের এরূপ তাব বোবালে কিয়ার ঘটমান অভীত কাল হয়। যেমন—

কাল সম্ম্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা তখন বই পড়ছিলাম। বাবা আমাদের পড়াশুনা দেখছিলেন।

৪. পুরাধিত অভীত কাল : যে কিয়া অভীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাধিত অভীত কাল বলা হয়। যেমন—

সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি কি তুমি করেছিলে?

(ক) অভীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা গিয়েছিল।

আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ দিয়েছিলাম।

(খ) অভীতে সংঘটিত কিয়ার পরম্পরা বোবাতে শেষ কিয়াপদে পুরাধিত অভীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন—
বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌছেছিলাম।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে কিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা—

আমরা মাঠে খেলতে যাব।

শীত্ত্বাই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

(১) আঙ্কেপ প্রকাশে অভীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন—কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে? সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের তেরি বাজবে?

(২) অভীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে কিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন— ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো ‘বিশ্বলবি’ পড়ে থাকবে।

১. ঘটমান ভবিষ্যৎ কিয়ার রূপ

নাম পুরুষ সাধারণ : —ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ : —ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

(সন্ত্রামাত্রক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ : —ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক : —ইতে থাকিবে/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উন্নত পুরুষ : —ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ বলে।

লক্ষ করার বিষয়, এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার –ইতে / –তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য : মূল ধাতুর সঙ্গে –ইতে/তে–বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

২. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি–ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক ও গম ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা – গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

- (i) কোন বাক্যে পুরাঘটিত অভীত কালের ক্রিয়া আছে?
 - ক. আমরা গিয়েছি
 - খ. তুমি যেতে থাক
 - গ. সে কি গিয়েছিল?
 - ঘ. সেখানে গিয়ে দেখে এসো
- (ii) কোন বাক্যটি ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
 - ক. এ কথা জানতে তুমি
 - খ. ‘দেখে এলাম তারে’
 - গ. কে যেন আসছে
 - ঘ. ‘আবার আসিব ফিরে’
- (iii) কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
 - ক. আমি রোজ স্কুলে যাই
 - খ. বাবরের পর হুমায়ুন বাদশা হন
 - গ. কেন যে তুমি আস না
 - ঘ. রোজ দেরি হয় কেন?
- (iv) সে হয়তো ‘এসে থাকবে’—এখানে কোন কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
 - ক. পুরাঘটিত বর্তমান
 - খ. ঘটমান অভীত
 - গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
 - ঘ. সাধারণ অভীত
- (v) কাজ শেষ করার জন্য সে আদাজল ‘খেয়ে লেগেছে’—এখানে ক্রিয়া পদটির কাল হচ্ছে—
 - ক. সাধারণ বর্তমান
 - খ. ঘটমান বর্তমান
 - গ. পুরাঘটিত বর্তমান
 - ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান

- (vi) ‘সাতাশ ‘হত’ যদি একশ ‘সাতাশ’-এখানে ‘হত’ কোন কালের ক্রিয়া? ক. পুরাঘটিত অতীত গ. সাধারণ অতীত
খ. পুরাঘটিত বর্তমান ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত
- (vii) ক্রিয় লক্ষ শহিদের রক্তে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাক্যটি কোন কালের? ক. সাধারণ বর্তমান গ. পুরাঘটিত অতীত
খ. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ. পুরাঘটিত বর্তমান
- (viii) তিনি গতকাল ঢাকা ‘যান’ নি-ক্রিয়াটি কোন কালের? ক. পুরাঘটিত বর্তমান গ. পুরাঘটিত অতীত
খ. সাধারণ বর্তমান ঘ. ঐতিহাসিক বর্তমান
- (ix) কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণ? ক. আমি রোজ সকালে বেড়াই গ. তোমাকে রোজ যেতে হবে
খ. আমি রোজ বেড়াতে যাব ঘ. আমি রোজ স্কুলে যেতাম
- (x) কোনটি পুরাঘটিত বর্তমানের উদাহরণ? ক. আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি গ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম
খ. আমি কথা কইব না ঘ. আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি
- ২। ‘কাল’ বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়ার কাল প্রধানত কয় তাপে বিভক্ত? তাদের নাম লেখ।
- ৩। ‘পুরুষ ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।’—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।
- ৪। ‘পুরুষভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।’—উদাহরণ সহযোগে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।
- ৫। স্বরচিত বাক্যে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের চারটি বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।
- ৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোতে কী কী অর্থে বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ হয়েছে তা নির্দেশ কর।
- ক. ‘এ জগতে হায়, সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি।’
- খ. ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।’
- গ. ‘চিন্তার কারণ নেই, কালই তাকে মজা দেখাছি।’
- ঘ. সে গত মাসেও কাজে যোগদান করেনি।
- ঙ. ‘এতক্ষণে বুঝিলাম, প্রীতির উৎস পার্থিব সঞ্চাদ।’
- ৭। নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে চারটি বাক্য রচনা কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ

সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা ও উদাহরণ ‘ক্রিয়াপদ’ সম্পর্কে আলোচনা (চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে) দেওয়া হয়েছে। এখানে সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও প্রয়োগ বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হবে।

সমাপিকা ক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন মুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা-

আনোয়ার বই পড়ে। (ক্রিয়া - সকর্মক, কাল - বর্তমান)।

মাসুদ সারাদিন খেলেছিল। (ক্রিয়া - অকর্মক, কাল - অতীত)।

আমি তোমাকে একটি কলম উপহার দেব। (ক্রিয়া - দিকর্মক, কাল-ভবিষ্যৎ)।

অসমাপিকা ক্রিয়া

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ-ইয়া (যো), -ইতে (তে) অথবা -ইলে (লে) বিভিন্ন মুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন - যত্ন করলে রত্ন মেলে। তাকে ঝুঁজে নিয়ে আসতে চেষ্টা করবে।

অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা

অসমাপিকা ক্রিয়া ঘটিত বাক্যে একাধিক প্রকার কর্তা (কর্তৃকারক) দেখা যায়-

১. এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা - তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? ‘পেলে’ (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং ‘আসবে’ (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে ‘তুমি’।
২. অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেখানে কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলা হয়। যেমন-
৩. শর্তাধীন কর্তা : এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। উদাহরণ - তোমরা বাড়ি এলে আমি রওনা হব। এখানে ‘এলে’ অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘তোমরা’ এবং ‘রওনা হব’ সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘আমি’। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপক্ষের ব্যবহার শর্তাধীন।

৪. নিরপেক্ষ কর্তা : শর্তাদীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ডিম্ব কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন – সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে ‘যাত্রীদের’ পথ চলার সঙ্গে ‘সূর্য’ অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে ‘সূর্য’ নিরপেক্ষ কর্তা।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

১. ‘ইলো’ > ‘লে’ বিভিন্নভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. কার্যপরম্পরা বোঝাতে	: চারটা বাজলে স্কুলের ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিশ্বাস জ্ঞাপনে	: একবার মুঠলে কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থে	: এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে	: তিনি গেলে কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে	: ‘জনিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?’
চ. বিধিনির্দেশে	: এখানে প্রচারপত্র লাগালে ফৌজদারিতে সোপার্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনার বিকল্পে	: আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে	: বৃষ্টিতে তিজলে সর্দি হবে।

২. ‘ইয়া’ > ‘এ’ বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে	: হাত-মুখ ধূমে পড়তে বস।
খ. হেতু অর্থে	: ছেলেটি কুসংজো মিশে নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে	: টেটিয়ে কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে	: ‘হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গান।’
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে	: সেখানে আর গিয়ে কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ	: ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব।

৩. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভিন্ন যুক্তি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

ক. ইচ্ছা প্রকাশে	: এখন আমি যেতে চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে	: মেলা দেখতে ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে	: খোকা এখন ইঁটতে পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে	: বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে	: রমলা গাইতে জানে।
চ. আবশ্যিকতা বোঝাতে	: এখন ট্রেন ধরতে হবে।

- ছ. সূচনা বোঝাতে : রানি এখন ইতেজি পড়তে শিখেছে।
- জ. বিশেষণবাচকতায় : লোকটাকে দৌড়াতে দেখলাম।
- ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে থাকতে দেখিনি।
- ঞ. অনুসর্গবৃপ্তে : ‘কোন দেশেতে তরুণতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।’
- ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অন্য সাধনে : ‘দেখিতে বাসনা মাপো তোমার চরণ।’
- ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্য সাধনে : পর্যন্ত দেখতে সুন্দর।
৪. ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার হিত প্রয়োগ
- ক. নির্ভুলতা প্রকাশে : ‘কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরবা।’
- খ. সমকাল বোঝাতে : ‘সেউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।’
সেউতিতে হইল সোনা ‘দেখিতে দেখিতে’।

টীকা : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন— গুৰু মেরে জুতা দান। আজুল ফুলে কলাগাছ।

যৌগিক ক্রিয়া

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন বিধি : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়, দেখ, লাগ, ফেল, আস, উঠ, দে, লহ, থাক, প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে, এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

১. যা-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি থেমে গেল।
- খ. অবিরাম অর্থে : গায়ক শেয়ে যাচ্ছেন।
- গ. তুমশ অর্থে : চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।
- ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া যেতে পারে।

২. পড়-ধাতু

- ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন শুয়ে পড়।
- খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা ছাড়িয়ে পড়েছে।
- গ. আকস্মিকতা অর্থে : এখনই তুফান এসে পড়বে।
- ঘ. তুমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছি।

৩. দেখ-ধাতু

- ক. মনোযোগ আকর্ষণে : এদিকে চেয়ে দেখ।
 খ. পরীক্ষা অর্থে : লবণ্টা চেখে দেখ।
 গ. ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে বলে দেখ।

৪. আস-ধাতু

- ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকলে বৃষ্টি আসতে পারে।
 খ. অভ্যস্ততায় : আমরা এ কাজই করে আসছি।
 গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

৫. দি-ধাতু

- ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে যেতে দাও।
 খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ করে দিলাম।
 গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা বুবিয়ে দাও।

৬. নি-ধাতু

- ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এবার কাপড়-চোপড় গুহিয়ে নাও।
 খ. পরীক্ষা অর্থে : কণ্ঠি পাথরে সোনাটা কয়ে নাও।

৭. ফেল-ধাতু

- ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সন্দেশগুলো খেয়ে ফেল।
 খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা হেসে ফেলল।

৮. উঠ-ধাতু

- ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : আগের বোঝা ভারী হয়ে উঠছে।
 খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি রেগে উঠেন।
 গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাতে চেঁচিয়ে উঠল।
 ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা হয়ে উঠল না।
 ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য হয়ে উঠে না।

৯. শাগ-ধাতু

- ক. অবিরাম অর্থে : খোকা কাঁদতে শাগল।
 খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে শাগ তো দেখি।

১০. থাক-ধাকু

- | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|
| ক. নিরন্তরতা অর্থে | : | এবার ভাবতে থাক। |
| খ. সম্ভাবনায় | : | তিনি হয়তো বলে ধাকবেন। |
| গ. সম্মেহ প্রকাশে | : | সে-ই কাজটা করে থাকবে। |
| ঘ. নির্দেশে | : | আর দরকার নেই, এবার বলে থাক। |

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (/) চিহ্ন দাও

- (i) কোন বাক্যের ক্রিয়াটি সম্ভাবনা প্রকাশ করছে?
- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ক. বৃষ্টি থেমে গেল | গ. তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসতে পারে |
| খ. একুণি বৃষ্টি এসে পড়বে | ঘ. সে গান করতে পারে। |
- (ii) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াটি অনুসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ক. জন্মভূমি স্বর্ণের চাইতে শ্রেষ্ঠ | গ. এমন চাওয়া চাইতে নেই |
| খ. সে আমার দিকে চাইতে থাকে | ঘ. কী চাইতে ইচ্ছা করে? |
- (iii) কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে?
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ক. সে যেতে যেতে থেমে গেল | গ. সে কেঁদে কেঁদে বলল |
| খ. বালিকাটি গান করে চলে গেল | ঘ. সে এলে আমি যাব। |
- (iv) কোন বাক্যের কর্তা নিরপেক্ষ?
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ক. আকাশে টাই উঠলে আড়া ভাঙ্গে | গ. বৃষ্টিতে ভিজলে কেন, সর্দি হবে |
| খ. বৃষ্টি হয়েছে তাই আমরা যাব না | ঘ. তুমি যদি যাও, সে যাবে। |
- (v) কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া প্রশংসিত হয়েছে?
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ক. তুমি কি এখন যাবে? | গ. ‘জনিলে মরিতে হবে।’ |
| খ. মরলে কি কেউ ফেরে? | ঘ. আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা। |
- (vi) কোন বাক্যে আবশ্যিকতা বোঝাতে ইতে > তে বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ক. তোমাকে দেখতে চাই | গ. খোকা এখন পড়তে পারে |
| খ. আমি এখানে থাকতে আসিনি | ঘ. এখন টেন ধরতে হবে। |

- (vii) কোন বাকেয়ে পরীক্ষা অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
- ক. কফি পাথরে সোনা কষে নাও গ. এখন তাবতে থাক
 খ. আমাকে করতে দাও ঘ. আমরা পরীক্ষা দিয়ে আসছি।
- (viii) কোন বাকেয়ে নির্দেশ অর্থে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?
- ক. তিনি হয়তো বসে থাকবেন গ. অনেক কাজ করেছ, এখন বসে থাক
 খ. কাজ করে সে বসে থাকবে ঘ. তুমি কি এখন বসে থাকবে?
- (ix) কোন বাকেয়ে ইয়া (>এ) বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাচ্ছে?
- ক. কথা কয়ে দেখ গ. রাজশাহী গিয়ে ফিরে আসব
 খ. গান গেয়ে গেয়ে পথ চলেছে ঘ. এখন গিয়ে কী করবে?
- (x) কোন বাকেয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া নিমিত্ত অর্থ প্রকাশ করছে?
- ক. দেখতে দেখতে সে এসে গেল গ. পরীক্ষা দিতে ঢাকা যাব
 খ. মেয়েটি গাইতে জানে ঘ. সে থেতে ভালোবাসে।
- ২। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পার্থক্য কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
- ৩। এক কর্তা, সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ দাও। নিরপেক্ষ কর্তা কাকে বলে?
- ৪। অসমাপিকা ক্রিয়াতে কী কী বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত থাকে? স্বচ্ছভাবে ক্রিয়াকে এবং এর প্রয়োগকে দেখাও।
- ৫। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে কী কী অর্থে ‘ইলে’ বা ‘লে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়েছে বুঝিয়ে লেখ।
- ক. ছুটি হলে দেশে যাব।
 খ. বৃক্ষ হলে ভালো ফসল হয়।
 গ. ‘জন্মলে মরিতে হবে।’
 ঘ. তার কথা শুনলে হাসি পায়।
 ঙ. চাচা গেলেও যে কাজ হবে, আমি গেলেও সেই কাজ হবে।
- ৬। উদাহরণ দাও।
- ক. ক্রিয়া সংঘটনের অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ-----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।
 খ. হেতু অর্থে-----‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি।
 গ. অনুসর্গ রূপে-----‘ইতে’ বা ‘তে’ বিভক্তি।

- ৭। নিম্নলিখিত অর্থে ‘ইয়া’ বা ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও-
- বিধি বোঝাতে।
 - ক্রিয়ার নিরন্তরতা প্রকাশে।
 - শেখা অর্থে।
 - ক্রিয়ার বিশেষ্য গঠনে।
 - সমকালতা বোঝাতে।
 - উপকৰ্ম অর্থে।
 - আবশ্যিকতা অর্থে।
- ৮। যৌগিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝ ? যৌগিক ক্রিয়ার গঠনবিধি সংক্ষেপে লেখ।
- ৯। নিম্নলিখিত বাক্যের মধ্যে মোটা হরফে লিখিত পদসমূহে কোন কোন অর্থে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে?
- সাইরেন বেজে উঠল।
 - সম্ম্যাঘনিয়ে এল।
 - নির্যাতিতরাই একদিন মাথা উচিয়ে উঠবে।
 - লেয়ে খেয়ে এস।
 - হঠাতে দুম ভেঙে যায়।
 - এ কাকে ডেকে এনেছিস ?
 - তারপরই নিরুদ্দেশ হয়ে যাই দীর্ঘ দিনের জন্য।
- ১০। অসমাপিকা ক্রিয়ায়ে শূন্যস্থান পূরণ কর-
- কাঁদিতে-----জীবন গেল।
 - বড় যদি-----চাও, ছোট হও তবে।
 - খোকাকে-----দেখলে-----দিও।
 - নাসিমা কি গান-----জানত ?
 - আজ বৃষ্টি----পারে।
 - চ) -----ডেকে দিও।
 - ছ) ‘-----করিও কাজ-----তাবিও না।’
 - জ) ‘সুখের-----এ ঘর বাঁধিনু অনলে---গেল।’

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাংলা অনুজ্ঞা

ক. কাল একবার এসো।

খ. তুই বাড়ি যা।

গ. ‘ক্ষমা কর মোর অপরাধ।’

ওপরের বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে অনুরোধ, দ্বিতীয় বাক্যে আদেশ এবং তৃতীয় বাক্যে প্রার্থনা বোঝাচ্ছে।

আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষে ক্রিয়াপদের দেরূপ হয় তাকে অনুজ্ঞা পদ বলে।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

১. মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়। তোরা (বই) পড়।

কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ অর্থে সন্ত্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘আপনি’ বা ‘আপনারা’ এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ‘তুমি’ বা ‘তোমরা’ পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন—

সন্ত্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ— আপনি (আপনারা) আসুন (আস্+উন)।

সাধারণ মধ্যম পুরুষ— তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২. প্রাচীন বালো রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে ‘হ’ যোগ করার নিয়ম ছিল। এই ‘হ’ বর্তমানে অ এবং ও তে বৃপ্তাত্ত্বিত হয়েছে। যেমন—

ক. ‘করহ [=কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় শাজ।’

খ. ‘অধম সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদছায়া।’

৩. ক. উভয় পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এই মত সকলে সমর্থন করেন না।

৪. ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ/ক্রিয়াপদ
১. সন্ত্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
২. সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
৩. তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর, যা
৪. সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

জ্ঞাতব্য : ক. নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সন্ত্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন— আপনি দেখেন।

সন্তুষ্মান্ত্বক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি- ‘উন’। যেমন—আপনারা দেখুন।

খ. চলতি ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ-কারান্ত বা ও-কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন— নেন, লন, নিন < লটন, লোন।

গ. মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সন্তুষ্মান্ত্বক	আপনি, আপনারা,	-ইবেন	-বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	-ইও	-ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	-ইস	-স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	-ইবে	-বে	করিবে	করবে

দ্রষ্টব্য : ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা এবং ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

১. ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে -ইতে/-তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং থাক্ ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি যুক্ত করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয়ে মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন—

(সে)-ইতে/-তে + -উক (করিতে/করতে থাকুক)।

(তিনি/আপনি) -ইতে/-তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)

(তুমি)-ইতে/-তে + -অ-ও (করিতে/করতে থাক/থাকো)।

(তুই)-ইতে/তে + - ০ (করিতে/করতে থাক)

মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইতে/-তে যুক্ত হয়; এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এই অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত থাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এই যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে।

থাক্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সহায় করে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : উপর্যুক্ত কারণেই ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার অন্য পৃথক ক্রিয়াবিভক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। যেমন—

-ইতে/-তে+ - ইবেন/- বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

-ইতে/-তে + ইও - এ/-ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

-ইতে/-তে + -ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

-ইতে/-তে+ - ইবে/-বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

জ্ঞাতব্য

- ক) ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।
খ) সম্মানাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্মানাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

ক. বর্তমান কাল

- | | | |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| (১) আদেশ | : | কাজটি করে ফেল। তোমরা এখন যাও। |
| (২) উপদেশ | : | সত্য গোপন করো না।
কড়া রোদে ঘোরাফেরা করিস না।
'গাত্তিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।' |
| (৩) অনুরোধ | : | আমার কাজটা এখন কর।
অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না। |
| (৪) প্রার্থনা | : | আমার দরখাস্তটা পড়ুন। |
| (৫) অভিশাপ | : | মর, পাপিষ্ঠ। |

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| (১) আদেশ | : | সদা সত্য বলবে। |
| (২) সম্ভাবনায় | : | চেষ্টা কর, সবই বুঝাতে পারবে। |
| (৩) বিধান অর্থে | : | রোগ হলে ওমুখ থাবে। |
| (৪) অনুরোধে | : | কাল একবার এসো (বা আসিও বা আসিবে)। |

অনুশীলনী

১। প্রতি প্রশ্নের চারটি উত্তরের ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

- (i) কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে?
 ক. রোগ হলে ওমুখ খেতে হবে গ. চেষ্টা কর, বুঝাতে পারবে
 খ. সদা সত্য বলবে ঘ. কাল এসো।
- (ii) তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
 ক. -ইস গ. -ও
 খ. -স ঘ. -ইও
- (iii) সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভিন্ন কোনটি?
 ক. -উন গ. -ও
 খ. -ন ঘ. শূন্য

- (iv) ‘ওখানে যাস না !’ – কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
- | | |
|----------|-----------|
| ক. আদেশ | গ. অনুরোধ |
| খ. উপদেশ | ঘ. বিধান |
- (v) ‘খোদা আগনার মজাল করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
- | | |
|--------------|------------|
| ক. আদেশ | গ. উপদেশ |
| খ. প্রার্থনা | ঘ. অনুরোধ। |
- (vi) ‘ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো।’– কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
- | | |
|----------|-----------|
| ক. আদেশ | গ. অনুরোধ |
| খ. উপদেশ | ঘ. বিধান। |
- (vii) ‘তোর সর্বনাশ হোক।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
- | | |
|--------------|-----------|
| ক. প্রার্থনা | গ. অভিশাপ |
| খ. উপদেশ | ঘ. আদেশ। |
- (viii) ‘আমাকে সাহায্য করুন।’ – কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে?
- | | |
|--------------|-----------|
| ক. অনুরোধ | গ. আদেশ |
| খ. প্রার্থনা | ঘ. উপদেশ। |
- ২। অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝা? কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়?
- ৩। বর্তমান কালের অনুজ্ঞার বিভিন্নসমূহ লেখ।
- ৪। ‘তবিষ্যৎ অর্থে অনুজ্ঞা পদ মধ্যম প্রযুক্তি সীমাবদ্ধ।’-এ উক্তিটি কুবিয়ে দাও।
- ৫। বাক্য গঠন কর
- | |
|--------------------------------|
| ক. অনুরোধ বর্তমান অনুজ্ঞা |
| খ. সম্ভাবনাময় তবিষ্যৎ অনুজ্ঞা |
| গ. অভিশাপে বর্তমান অনুজ্ঞা |
| ঘ. উপদেশে বর্তমান অনুজ্ঞা। |
- ৬। কোন কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার হয়েছে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলোর পাশে লেখ।
- ক) ‘ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।’
 - খ) ‘তবে যদি দয়া কর, ক্ষমা করো মোর অপরাধ।’
 - গ) ‘রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।’
 - ঘ) খোদা তোমার হায়াত দরাজ করুন।
 - ঙ) সে জাহানামে যাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক্রিয়া-বিভক্তি : সাধু ও চলিত

আমি যাই।

আপনারা যাবেন।

সে যাচ্ছে।

তারা যাচ্ছিলেন।

ওপরে যা-ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, ‘বেন’, ‘ছে’ ও ‘ছিলেন’ বিভক্তি যুক্ত করে সমাপিকা ক্রিয়াপদগুলো গঠিত হয়েছে।

ধাতুর উপর যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠন করে, এই সমস্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে ক্রিয়া বিভক্তি বলা হয়।

১. বিভক্তিসমূহ ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বাচ্যভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন-

আমি যাই—সাধারণ বর্তমান কালে উভয় পুরুষের ক্রিয়াপদ।

আপনারা যাবেন—সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে (সন্ত্রামাত্মক) মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ।

২. সাধু ও চলিত রীতিভেদেও ক্রিয়াবিভক্তির পরিবর্তন হয়। যথা—

সাধু

আপনি ভাত খাইয়াছেন।

তাহারা বাড়ি যাইতেছে।

চলিত

আপনি ভাত খেয়েছেন।

তারা বাড়ি যাচ্ছে।

৩. প্রযোজক ক্রিয়াভেও ক্রিয়াবিভক্তির অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন—

সাধু রীতি (প্রযোজক)

আমি তাহাকে দিয়া কাজটি করাইয়াছি।

রত্ন মণিকে গান শিখাইতেছিল।

চলিত রীতি (প্রযোজক)

আমি তাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছি।

রত্ন মণিকে গান শেখাচ্ছিল।

ধাতুর গণ : ‘গণ’ শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর ‘গণ’ বলতে ধাতুগুলোর বানানের ধরন বোঝায়। ‘ধাতুর গণ’ ঠিক করতে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন—

(ক) ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত?

(খ) ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

‘হওয়া’ ক্রিয়ার ধাতু ০ হ (হ + অ)। ‘হ’ একাক্ষর ধাতু এবং প্রথম বর্ণ হ—এর সাথে স্বরবর্ণ ‘অ’ যুক্ত আছে। সুতরাং হ—আনিগণের মধ্যে ল-ধাতু (ক্রিয়াপদ—লওয়া) পড়বে।

ବାଳୀ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଧାତୁକେ ବିଶାଟି ଗଣେ ତାଗ କରା ହେଁବେ । ସଥା—

- ୧ । ହ-ଆଦିଗଣ : ହ (ହୋଯା), ଲ (ଲୋଯା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୨ । ଖ-ଆଦିଗଣ : ଖା (ଖୋଯା), ଧା (ଧୋଯା), ପା (ପୋଯା), ଯା (ଯୋଯା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୩ । ଦି-ଆଦିଗଣ : ଦି (ଦେଓଯା), ନି (ନେଓଯା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୪ । ଶୁ-ଆଦିଗଣ : ଛୁ (ଚୌଆନୋ), ନୁ (ନୋଆନୋ), ଛୁ (ହୈୟା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୫ । କର-ଆଦିଗଣ : କର (କରା), କମ୍ (କମା), ଗଡ଼ (ଗଡ଼ା), ଚଳ (ଚଳା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୬ । କହ-ଆଦିଗଣ : କହ (କହା), ସହ (ସହା), ବହ (ବହା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୭ । କାଟି- ଆଦିଗଣ : ଶୀଘ୍ର, ଚାଲ, ଆକ୍ର, ବୀଘ୍ର, କୌଦ, ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୮ । ଗାହ-ଆଦିଗଣ : ଚାହ, ବାହ, ନାହ (ନାହାନମ୍ବାନ) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୯ । ଲିଖ-ଆଦିଗଣ : କିନ୍, ଘିର, ଜିତ, ଫିର, ତିକ୍ତ, ଚିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୦ । ଉଠ- ଆଦିଗଣ : ଉଡ଼, ଶୁନ, ଫୁଟ, ଥୁଙ୍ଗ, ଥୁଲ, ଦୁବ, ତୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୧ । ଲାକା-ଆଦିଗଣ : କାଟା, ଡାକା, ବାଜା, ଆଗା (ଅଗସର ହୋଯା) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୨ । ନାହୀ-ଆଦିଗଣ : ଗାହୀ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୩ । ଫିରା-ଆଦିଗଣ : ଛିଟା, ଶିଖା, ବିମା, ଟିରା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୪ । ଘୂରା- ଆଦିଗଣ : ଉଚା, ଲୁକା, କୁଡ଼ା (କୁଡ଼ାଛେ) ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୫ । ଧୋଯା-ଆଦିଗଣ : ଶୋଯା, ଥୋଚା, ଥୋଯା, ଗୋଛା, ଯୋଗା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୬ । ଦୌଡ଼ା-ଆଦିଗଣ : ଶୌଛା, ଦୌଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୭ । ଚଟକା-ଆଦିଗଣ : ସମ୍ବାର, ଧମ୍ବକା, କଚଳା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୮ । ବିଗ୍ରା-ଆଦିଗଣ : ହିଚଡ଼ା, ଛିଟକା, ସିଟକା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୧୯ । ଉଲ୍ଲଟା- ଆଦିଗଣ : ଦୁମଡ଼ା, ମୁହ୍ରା, ଉପ୍ରଚା ଇତ୍ୟାଦି ।
- ୨୦ । ଛୋବଳା - ଆଦିଗଣ : କୋଚକା, କୋକଡ଼ା, କୋଦଳା ଇତ୍ୟାଦି ।

ଧାତୁ-ବିଭକ୍ତିର ରୂପ

ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ

କାଳ	ନାମ ପୁରୁଷ (ସାଧାରଣ)		ନାମ ଓ ମଧ୍ୟମ (ସନ୍ତ୍ରମାତ୍ରକ)		ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ (ସାଧାରଣ)		ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ (ତୁଳ୍ଯ)		ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ	
	ଦେ		ଦ୍ରୁମି		ଦ୍ରୁଇ		ଆମି			
	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧. ସାଧାରଣ	-ଏ	-ଏ	-ଏନ	-ଏନ	-ଅ	-ଅ	-ଇସ୍	-ଇସ୍	-ଇ	-ଇ
୨. ଘଟମାନ	-ଇତେହେ	-ହେ	-ଇତେହେନ	-ହେନ	-ଇତେହ	-ହ	-ଇତେହିସ୍	-ହିସ୍	-ଇତେହି	-ହି
୩. ପୁରାଘଟିତ	-ଇଯାହେ	-ଏହେ	-ଇଯାହେନ	-ଏହେନ	-ଇଯାହ	-ଏହ	-ଇଯାହିସ୍	-ଏହିସ୍	-ଇଯାହି	-ଏହି
୪. ଅନୁଞ୍ଜା	-ଟକ	-ଟକ	-ଟନ	-ଟନ	-ଅ	-ଅ	-ମୂଳଧାତୁ	-ମୂଳଧାତୁ		

ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ : -ଇତେହ, -ହ, -ଇଯାହ, -ଏହ, ବିଭକ୍ତିଗୁଲୋର ଚିହ୍ନ ଅ-କାରାନ୍ତ ।

অতীত কাল

কাল	নাম পুরুষ (সাধারণ)		নাম ও মধ্যম পুরুষ (সন্ত্রমাত্রিক)		মধ্যম পুরুষ (সাধারণ)		মধ্যম পুরুষ (তৃতীয়)		উভয় পুরুষ		
	সে		তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি		
	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	
৫। সাধারণ	-ইল	-ল	-ইলেন	-লেন	-ইলে	-লে	-ইলি	-লি	-ইলাম	-লাম	-লুম
৬। নিয়ন্ত্রিত	-ইত	-তে	-ইতেন	-তেন	-ইতে	-তে	-ইতিস্	-তিস্	-ইতাম	-তাম	-তুম
৭। ঘটমান	-ইতেছিল	-ছিল	-ইতেছিলেন-ছিলেন	-ইতেছিলে-ছিলে	-ইতেছিলে-ছিলে	-ছিলে	-ইতেছিলি-ছিলি	-ছিলি	-ইতেছিলাম-ছিলাম		
৮। পুরোষাচ্ছিত	ইয়াছিল	-এছিল	-ইয়াছিলেন-এছিলেন	-ইয়াছিলে-এছিলে	-ইয়াছিলে-এছিলে	-	-ইয়াছিলি-এছিলি	-এছিলি	-ইয়াছিলাম-এছিলাম	-ইয়াছি-এছিলাম	

দ্রষ্টব্য : পরে, 'জ্ঞ' থাকলে কর্তৃ ধাতুর 'র' লোপ পায়। (কচিলে, কচিলি)।

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইবে	-বে	-ইবি	-বি	-ইব	-ব	-বো
১০। অনুজ্ঞা	-ইবে	-বে	-ইবেন	-বেন	-ইও	-ও	-ইস	-সি	-ইস		

দ্রষ্টব্য : -ইল, -ল, -ইত, -ইতেছিল, -ছিল, -এছিল বিভিন্নগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

কর্তৃ ধাতুর বৃপ্তি (সর্, গড়, চল্প প্রভৃতি কর-আদিগণ)

কাল	সে	তিনি	আপনি	তুমি		তুই		আমি		
				সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	
১। সাধারণ বর্তমান	করে	করে	করেন	করেন	কর	কর	করিস	করিস	করি	করি
২। ঘটমান বর্তমান	করিতেছে	করছে	করিতেছেন	করছেন	করিতেছ	করছ	করিতেছিস	করিছিস	করিতেছি	করছি
৩। পুরোষাচ্ছিত বর্তমান	করিয়াছে	করেছে	করিয়াছেন	করেছেন	করিয়াছ	করেছ	করিয়াহিস	করেছিস	করিয়াহি	করেছি
৪। বর্তমান অনুজ্ঞা/ আক্ষমকা	করুক	করুক	করুন	করুন	কর	কর	করু	করু	০	০
৫। সাধারণ অতীত	করিল	করল	করিলেন	করলেন	করিলে	করলে	করিলি	করলি	করিলাম	করলাম
৬। নিয়ন্ত্রিত অতীত	করিত	করত	করিতেন	করতেন	করিতে	করতে	করিতিস	করতিস	করিতাম	করতাম
৭। ঘটমান অতীত	করিতেছিল	করছিল	করিতেছিলেন	করছিলেন	করিতেছিলে	করছিলে	করিতেছিলি	করছিলি	করিতেছিলাম	করছিলাম
৮। পুরোষাচ্ছিত অতীত	করিয়াছিল	করেছিল	করিয়াছিলেন	করেছিলেন	করিয়াছিলে	করেছিলে	করিয়াছিলি	করেছিলি	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
৯। সাধারণ ভবিষ্যৎ	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিবে	করবে	করিবি	করবি	করিব	করব
১০। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	করিবে	করবে	করিবেন	করবেন	করিব	করবে	করিস	করিস	০	০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তিনটি কালের দশটি ক্রমিক বৃপ্তের জন্য আমরা ধাতুরূপ সাধনে এরপর কালের পরিবর্তে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ ক্রমিক সংখ্যাগুলো ব্যবহার করব।

কর, করিতেছ, করছ, করিয়াছ, করেছ - শব্দগুলো শেষ ধ্বনির উচ্চারণ অ-কারান্ত।

ଯା-ଧାତୁର ରୂପ

(ଆଦ୍ୟବର୍ଗ ଆ-କାର ଯୁକ୍ତ-ଥା, ଯା, ପା, ଧା ପ୍ରତ୍ୱତି ଥା-ଆଦିଗଣ)

ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧ ଯାଏ ଯାନ ଯାଓ ଯାଇସ ଯାଇ	୧ ଯାଏ ଯାନ ଯାଓ ଯାସ ଯାଇ
୨ ଯାଇତେହେ ଯାଇତେହେନ ଯାଇତେହେ ଯାଇତେହିସ ଯାଇତେହି	୨ ଯାଛେ ଯାଛେନ ଯାଛୁ ଯାଛିସ ଯାଛି
୩ ଗିଯାଛେ ଗିଯାଛେନ ଗିଯାଛୁ ଗିଯାଛିସ ଗିଯାଛି	୩ ଗେହେ (ଗିଯେହେ) ଗିଯେହେନ (ଗେହେନ) ଗିଯେହେ (ଗେହୁ) ଗିଯେହିସ (ଗେହିସ) ଗିଯେହି (ଗେହି)
୪ ଯାଉକ (ଯାକ) ଯାନ ଯାଓ ଯା	୪ ଯାକ ଯାନ ଯାଓ ଯା
୫ ଗେଲ ଗେଲେନ (ଯାଇଲେନ) ଗେଲେ (ଯାଇଲେ) ଗେଲି (ଯାଇଲି) ଗେଲାମ (ଯାଇଲାମ)	୫ ଗେଲ ଗେଲେନ ଗେଲେ ଗେଲି ଗେଲାମ
୬ ଯାଇତ ଯାଇତେନ ଯାଇତେ ଯାଇତିସ୍ ଯାଇତାମ	୬ ଯେତ ଯେତେନ ଯେତେ ଯେତିସ ଯେତାମ
୭ ଯାଇତେଛିଲ ଯାଇତେଛିଲେନ ଯାଇତେଛିଲେ ଯାଇତେଛିଲି ଯାଇତେଛିଲାମ	୭ ଯାଛିଲ ଯାଛିଲେନ ଯାଛିଲେ ଯାଛିଲି ଯାଛିଲାମ
୮ ଗିଯାଛିଲ ଗିଯାଛିଲେନ ଗିଯାଛିଲେ ଗିଯାଛିଲି ଗିଯାଛିଲାମ	୮ ଗିଯେଛିଲ ଗିଯେଛିଲେନ ଗିଯେଛିଲେ ଗିଯେଛିଲି ଗିଯେଛିଲାମ
୯ ଯାଇବେ ଯାଇବେନ ଯାଇବେ ଯାଇବି ଯାଇବ	୯ ଯାବେ ଯାବେନ ଯାବେ ଯାବି ଯାବ
୧୦ ଯାଇସେ ଯାଇବେନ ଯାଇସ ଯାଇସି	୧୦ ଯାବେ ଯାବେନ ଯେଓ (ଯେୟୋ) ଯାସ

ମୁଖ୍ୟ : ଗିଯାଛ, ଗେଲ, ଗିଯାଛିଲ, ଯାଇସ, ଯାଛ, ଗିଯେହ, ଗେହ, ଯେତ, ଯାଛିଲ, ଗିଯେଛିଲ, ଯାବ-ଶଦଗୁଲୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ-କାରାତ ।

ଲିଖ ଧାତୁର ରୂପ

(ଆଦ୍ୟବର୍ଗ ଇ-କାର ଯୁକ୍ତ-କିନ୍ନ ଘିର, ଜିତ୍ ଫିର, ଭିଡ଼, ଚିନ ପ୍ରତ୍ୱତି ଲିଖ-ଆଦିଗଣ)

ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧ ଲିଖେ ଲିଖେନ ଲିଖ ଲିଖିସ ଲିଖି	୧ ଲେଖେ ଲେଖେନ ଲେଖ ଲିଖିସ ଲିଖି
୨ ଲିଖିତେହେ ଲିଖିତେହେନ ଲିଖିତେହେ ଲିଖିତେହିସ ଲିଖିତେହି	୨ ଲିଖଛେ ଲିଖିନେ ଲିଖଛୁ ଲିଖିହିସ ଲିଖିହି
୩ ଲିଖିଯାଛେ ଲିଖିଯାଛେନ ଲିଖିଯାଛୁ ଲିଖିଯାହିସ ଲିଖିଯାହି	୩ ଲିଖିହେ ଲିଖିହେନ ଲିଖିହୁ ଲିଖିହିସ ଲିଖିହି
୪ ଲିଖୁକ ଲିଖୁନ ଲିଖ ଲିଖ୍	୪ ଲିଖୁକ ଲିଖୁନ ଲେଖ ଲେଖ୍
୫ ଲିଖିଲ ଲିଖିଲେନ ଲିଖିଲେ ଲିଖିଲି ଲିଖିଲାମ	୫ ଲିଖିଲ ଲିଖିଲେନ ଲିଖିଲେ ଲିଖିଲି ଲିଖିଲାମ
୬ ଲିଖିତ ଲିଖିତେନ ଲିଖିତେ ଲିଖିତିସ ଲିଖିତାମ	୬ ଲିଖିତ ଲିଖିତେନ ଲିଖିତେ ଲିଖିତିସ ଲିଖିତାମ
୭ ଲିଖିତେଛି ଲିଖିତେଛିଲେନ ଲିଖିତେଛିଲେ ଲିଖିତେଛିଲି ଲିଖିତେଛିଲାମ	୭ ଲିଖିଲି ଲିଖିଲେନ ଲିଖିଲେ ଲିଖିଲି ଲିଖିଲାମ
୮ ଲିଖିଯାହି ଲିଖିଯାହିଲେନ ଲିଖିଯାହିଲେ ଲିଖିଯାହିଲି ଲିଖିଯାହିଲାମ	୮ ଲିଖେଛି ଲିଖେଛିଲାମ ଲିଖେଛିଲେ ଲିଖେଛିଲି ଲିଖେଛିଲାମ
୯ ଲିଖିବେ ଲିଖିବେନ ଲିଖିବେ ଲିଖିବି ଲିଖିବ	୯ ଲିଖିବେ ଲିଖିବେନ ଲିଖିବେ ଲିଖିବି ଲିଖିବ
୧୦ ଲିଖିବେ ଲିଖିବେନ ଲିଖିଓ (ଲିଖିୟୋ) ଲିଖିସ	୧୦ ଲିଖିବେ ଲିଖିବେନ ଲିଖୋ ଲିଖିସ

ମୁଖ୍ୟ : ଲିଖ, ଲେଖ, ଲିଖିଯାଛ, ଲିଖେ, ଲିଖିତ, ଲିଖିଲ, ଲିଖିତେହିସ, ଲିଖିତିସ—ଶଦଗୁଲୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ-କାରାତ ।

দে (দি) ধাতুর রূপ
(আদ্যবর্ণ ই-কার যুক্ত - 'নি' ইত্যাদি দি-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। দেয় দেন দাও দিস দেই।	১। দেয় দেন দাও দিস দি (দিই)।
২। দিতেছে দিতেছেন দিতেছ দিতেছিস দিতেছি।	২। দিছে দিছেন দিছ দিছিস দিছি।
৩। দিয়াছে দিয়াছেন দিয়াছ দিয়াছিস দিয়াছি।	৩। দিয়েছে দিয়েছেন দিয়েছ দিয়েছিস দিয়েছি।
৪। দিক দিন দাও দে।	৪। সাধু রীতির মতো
৫। দিল (দিলো) দিলেন দিলে দিলি দিলাম।	৫। সাধু রীতির মতো
৬। দিত দিতেন দিতে দিতি দিতাম।	৬। সাধু রীতির মতো।
৭। দিতেছিল দিতেছিলেন দিতেছিলে দিতেছিলি দিতেছিলাম।	৭। দিছিল দিছিলেন দিছিলে দিছিলি দিছিলাম।
৮। দিয়াছিল দিয়াছিলেন দিয়াছিলে দিয়াছিলি দিয়াছিলাম।	৮। দিয়েছিল দিয়েছিলেন দিয়েছিলে দিয়েছিলি দিয়েছিলাম।
৯। দিবে দিবেন দিবি দিব।	৯। দেবে দেবেন দিবি দেব।
১০। দিবে দিবেন দিও (দিয়ো) দিস।	১০। দেবে দেবেন দিও (দিয়ো) দিস।

উঠ ধাতুর রূপ
(আদ্যবর্ণ উ-কার যুক্ত - উড়, শুন, পুট, খুঁজ, খুল, দ্রুব, তুল ইত্যাদি উঠ-আদিগণ)

সাধু	চলিত
১। উঠে উঠেন উঠ উঠিস উঠি।	১। ওঠে ওঠেন ওঠ উঠিস উঠি।
২। উঠিতেছে উঠিতেছেন উঠিতেছ উঠিতেছিস উঠিতেছি।	২। উঠছে উঠছেন উঠছ উঠছিস উঠছি।
৩। উঠিয়াছে উঠিয়াছেন উঠিয়াছ উঠিয়াছিস উঠিয়াছি।	৩। উঠেছে উঠেছেন উঠেছ উঠেছিস উঠেছি।
৪। উঠুক উঠুন উঠ উঠ।	৪। উঠুক উঠুন ওঠ ওঠ।
৫। উঠিল উঠিলেন উঠিলে উঠিলি উঠিলাম।	৫। উঠল উঠলেন উঠলে উঠলি উঠলাম।
৬। উঠিত উঠিতেন উঠিতে উঠিতিস উঠিতাম।	৬। উঠত উঠতেন উঠতে উঠতিস উঠতাম।
৭। উঠিতেছিল উঠিতেছিলেন উঠিতেছিলে উঠিতেছিলি। উঠিতেছিলাম।	৭। উঠছিল উঠছিলেন উঠছিলে উঠছিলি। উঠছিলাম।
৮। উঠিয়াছিল উঠিয়াছিলেন উঠিয়াছিলে উঠিয়াছিলি। উঠিয়াছিলাম।	৮। উঠেছিল উঠেছিলেন উঠেছিলে উঠেছিলি। উঠেছিলাম।
৯। উঠিবে উঠিবেন উঠিবে উঠিবি উঠিব।	৯। উঠবে উঠবেন উঠবে উঠবি উঠব।
১০। উঠিবে উঠিবেন উঠিও (উঠিয়ো) উঠিস।	১০। উঠবে উঠবেন উঠো উঠিস।

দ্রষ্টব্য : উঠ, ওঠ, উঠছ, উঠিল, উঠিতেছিল, উঠছিল, উঠিয়াছিল-শব্দগুলো উচ্চারণে অ-কারান্ত।

ଶୁ-ଧାତୁ (ଆଦୟବର୍ଗ ଉ-କାର ମୁକ୍ତ-ରୁ, ନୁ, ଝୁ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁ-ଆଦିଗଣ)

ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧। ଶୋଯ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୁସ ଶୁଇ	୧। ଶୋଯ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୁସ ଶୁଇ
୨। ଶୁଇତେହେ ଶୁଇତେହେନ ଶୁଇତେହେ ଶୁଇତେହିସ ଶୁଇତେହି	୨। ଶୁଚେହେ ଶୁଚେହେନ ଶୁଚେହେ ଶୁଚିହେସ ଶୁଚିହେ
୩। ଶୁଇଯାହେ ଶୁଇଯାହେନ ଶୁଇଯାହେ ଶୁଇଯାହିସ ଶୁଇଯାହି	୩। ଶୁଯେହେ ଶୁଯେହେନ ଶୁଯେହେ ଶୁଯେହିସ ଶୁଯେହି
୪। ଶୁକ ଶୋନ ଶୋଓ ଶୋ	୪। ସାଧୁ ରୀତିର ମତୋ
୫। ଶୁଇଲ ଶୁଇଲେନ ଶୁଇଲେ ଶୁଇଲି ଶୁଇଲାମ	୫। ଶୁଲ ଶୁଲେନ ଶୁଲେ ଶୁଲି ଶୁଲାମ
୬। ଶୁଇତ ଶୁଇତେନ ଶୁଇତେ ଶୁଇତିସ ଶୁଇତାମ	୬। ଶୁମ ଶୁତେନ ଶୁତେ ଶୁତିସ ଶୁତାମ
୭। ଶୁଇତେହିଲ ଶୁଇତେହିଲେନ ଶୁଇତେହିଲେ ଶୁଇତେହିଲି ଶୁଇତେହିଲାମ	୭। ଶୁଚିଲ ଶୁଚିଲେନ ଶୁଚିଲେ ଶୁଚିଲି ଶୁଚିଲାମ
୮। ଶୁଇଯାହି ଶୁଇଯାହିଲେନ ଶୁଇଯାହିଲେ ଶୁଇଯାହିଲି ଶୁଇଯାହିଲାମ	୮। ଶୁଯେହିଲ ଶୁଯେହିଲେନ ଶୁଯେହିଲେ ଶୁଯେହିଲି ଶୁଯେହିଲାମ
୯। ଶୁଇବେ ଶୁଇବେନ ଶୁଇବେ ଶୁଇବି ଶୁଇବ	୯। ଶୋବେ ଶୋବେନ ଶୋବେ ଶୁବି ଶୋବୋ
୧୦। ଶୁଇବେ ଶୁଇବେନ ଶୁଇଓ (ଶୁଇଯୋ) ଶୁଇବି	୧୦। ଶୋବେ ଶୋବେନ ଶୁଯୋ ଶୁସ

ଦ୍ୱାରାବ୍ୟ : ଶୁଇଛ, ଶୁଇତେହେ, ଶୁଇଯାହେ, ଶୁଯେହେ, ଶୁଇଲ, ଶୁଲ, ଶୁଇତ, ଶୁତ, ଶୁଇତେହିଲ, ଶୁଚିଲ, ଶୁଇଯାହିଲ, ଶୁଯେହିଲ,
ଶୁଇତ- ଶଦଗୁଲୋ ଉଚାରଣେ ଅ-କାରାନ୍ତ ।

ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁର ରୂପ

୧। ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁର ଚଲିତ ରୂପ ସାଧନେ କଥନେ କଥନେ ମୂଳ ଧାତୁର ସଙ୍ଗେ ଶୁଧୁ ପ୍ରୟୋଜକ ରୂପଟି ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।
ଯେମନ- ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକେ ପଡ଼ାଇଯାହେନ । - ସାଧୁ ରୂପ ।

[√ ପଡ଼ + ଆ = ପଡ଼ା (ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ) + ଇଯାହେନ (ବିଭିନ୍ନି) ।

ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଟିକେ ପଡ଼ିଯେହେନ - ଚଲିତ ରୂପ ।

[√ ପଡ଼ + ଓ (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟୋଜକ-ପ୍ରକରଣେର ଆ ଯୁକ୍ତ ହଲୋ ନା) + ଇଯେହେନ = ପଡ଼ିଯେହେନ- ଚଲିତ
ରୂପ ।] ଚଲିତ ରୂପେ ଆରା କରେକଟି ଧାତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ଣବୀଯ-

ହ-ଧାତୁ : ଦୀଢ଼ାଓ, ତୋମାକେ ହେଉଯାଇଛି ।

ଶିଖ-ଧାତୁ : କେ ତୋମାକେ ଗାନ ଶେଖାଇଛେ ?

ଶୁନ-ଧାତୁ : ଏ କୀ କଥା ଶୋନାଲି ରେ ।

প্রযোজক ধাতুর বিভক্তি
বর্তমান কাল

কাল বিভাগ	সে	তিনি	আপনি	তুমি	তুই	আমি
	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত	সাধু চলিত
১। সাধারণ	*য় *য়	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স	*ই *ই	
২। ঘটমান	*ইতেছে *ছে	*ইতেছেন *ছেন	*ইতেছ *ছ	*ইতেছিস *ছিস	*ইতেছি *ছি	
৩। পুরাখটিত	*ইয়াহে *ইয়েছে	*ইয়াছেন *ইয়েছেন	*ইয়াছ *ইয়েছ	*ইয়াছিস *ইয়েছিস	*ইয়াছ *ইয়েছি	
৪। অনুজ্ঞা	*উক *ক	*ন *ন	*ও *ও	*ইস *স		

অতীত কাল

৫। সাধারণ	*ইল *ল * লো	*ইলেন *লেন	*ইলে *লে	*ইলি *লি	*ইলাম *লাম
৬। নিত্যবৃত্ত	*ইত *ত *তো	*ইতেন *তেন	*ইতে *তে	*ইতিস *তিস	*ইতাম *তাম
৭। ঘটমান	*ইতেছিল *ছিল	*ইতেছিলেন *ছিলেন	*ইতেছিলে *ছিলে	*ইতিছিলি *ছিলি	*ইতেছিলাম *ছিলাম
৮। পুরাখটিত	*ইয়াছিল ০ ইয়েছিল	*ইয়াছিলেন ০ ইয়েছিলেন	*ইয়াছিলে ০ ইয়েছিলে	*ইয়াছিলি ০ ইয়েছিলি	*ইয়াছিলাম ০ ইয়েছিলাম

ভবিষ্যৎ কাল

৯। সাধারণ	*ইবে *বে	*ইবেন *বেন	*ইবে *বে	*ইবি *বি	*ইব*ব *বো
১০। অনুজ্ঞা	*উক *ক	*বেন *বেন	*ইও *য়ো	*ইস *স	

জ্ঞাতব্য : ধাতুর প্রযোজক রূপ সাধনে তারকা চিহ্নের (*) স্থলে মূল ধাতুর পরে (আ-কার) সংযোজিত হবে, কিন্তু ০ স্থলে হবে না।

‘କର’ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଜକ ରୂପ

କଳ	ଦେ		ତିନି		ଆଗନି		ଭୂମି		ଦୂରେ		ଆମି	
	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ	ସାଧୁ	ଚଲିତ
୧। ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଯ	କରାଯ	କରାନ	କରାନ	କରାଓ	କରାଓ	କରାଇସ	କରାସ	କରାଇ	କରାଇ		
୨। ଘଟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଇତେହେ	କରାହେ	କରାଇତେହେନ	କରାହେନ	କରାଇତେଛ	କରାହୁ	କରାଇତେହିସ	କରାଇସ	କରାଇତେହି	କରାହୁ		
୩। ପୂର୍ବାଘାତିତ ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାଇଯାହେ	କରାଯାହେ	କରାଇଯାହେନ	କରାଯାହେନ	କରାଇଯାଛ	କରିଯାଇଛେ	କରାଇଯାହିସ	କରିଯାହିସ	କରାଇଯାହି	କରିଯାହି		
୪। ଅନୁଜୀ/ଆକଙ୍କାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ	କରାକ	କରାକ	କରାନ	କରାନ	କରାଓ	କରାଓ	କରାଇସ	କରାସ	କରାଇ	କରାଇ		
୫। ସାଧାରଣ ଅଭୀତ	କରାଇସ	କରାଲ	କରାଇଲେ	କରାଲେ	କରାଇଲେ	କରାଲେ	କରାଇଲି	କରାଲି	କରାଇଲାମ	କରାଲାମ		
୬। ନିତ୍ୟବ୍ରତ ଅଭୀତ	କରାଇତ	କରାତ	କରାଇତେନ	କରାତେନ	କରାଇତେ	କରାତେ	କରାଇତିସ	କରାତିସ	କରାଇତାମ	କରାତାମ		
୭। ଘଟମାନ ଅଭୀତ	କରାଇତେହି	କରାହିଲ	କରାଇତେହିଲେ	କରାହିଲେ	କରାଇତେହିଲେ	କରାହିଲେ	କରାଇତେହିଲି	କରାହିଲି	କରାଇତେହିଲାମ	କରାହିଲାମ		
୮। ପୂର୍ବାଘାତିତ ଅଭୀତ	କରାଇଯାହିଲ	କରିଯାଇଲ	କରାଇଯାହିଲେ	କରିଯାଇଲେ	କରାଇଯାହିଲେ	କରିଯାଇଲେ	କରାଇଯାହିଲି	କରିଯାଇଲି	କରାଇଯାହିଲାମ	କରିଯାଇଲାମ		
୯। ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟାତ	କରାଇବେ	କରାବେ	କରାଇବେନ	କରାବେନ	କରାଇବେ	କରାବେ	କରାଇବି	କରାବି	କରାଇବ	କରାବ		
୧୦। ଭବିଷ୍ୟାତ ଅନୁଜୀ	କରାକ	କରାକ	କରାନ	କରାନ	କରାଇଏ	କରାଯୋ	କରାଇସ	କରାସୁ				

ପରିଶିଷ୍ଟା : ଧାତୁର ଚଲିତ ରୂପ ସାଧନେ କାତିପଯ ପରିବର୍ତ୍ତନ

୧. ମୂଳସବର ଅ-କାରାନ୍ତ

କହୁ ଧାତୁ : କଇତାମ, କଇଲାମ, କଇତି, କଇତିସ, କରେହିସ ଇତ୍ୟାଦି ।

୨. ମୂଳସବର ଆ-କାରାନ୍ତ

(କ) ଥା-ଧାତୁ : ଖୋଲାମ (ଥାଇଲାମ), ଖୋଲେନ (ଥାଇଲେନ), ଖୋଲ, ଥେଲେ, (ଥାଇଲ), ଥେଯେହେ ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଘ) ଯା-ଧାତୁ : ଗେଲ (ଯାଇଲ), ଗିଯେହିଲ, ଯେତ-ଯେତୋ (ଯାଇତ), ଯେତେହିଲ, ଯାହିଲ (ଯାଇତେହିଲ) ଇତ୍ୟାଦି ।

(ଗ) ଗାହୁ (ଗୈ)-ଧାତୁ : (ଚଲିତ ରୂପ)- ଗାହିତ, ଗାହିଲାମ, ଗେଯେହିଲାମ, ଗେଯେହେ, ଗାହିଲେ, ଗାହିତିସ, ଗାହିଛିସ, ଗାହିବେ, ଗାବେ, ଗାଇବ, ଗାବ ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ମୂଳସବର ଇ ବା ଈ-କାରାନ୍ତ : ଶୁନ୍ ଧାତୁ- ଶୋନୋ, ଶୋନେନ, ଶୋନେ, ଶୁନଲାମ, ଶୁନେଛି, ଶୁନତାମ, ଶୁନେହିସ, ଶୋନାଓ ଇତ୍ୟାଦି ।

୪। ମୂଳସବର ଟୁ-କାରାନ୍ତ : ଦେ, (ଦି) ଧାତୁ-ଦିଇ, ଦେଯ, ଦେନ, ଦିନ, ଦାଓ, ଦିଲାମ, ଦିଯେହିଲାମ, ଦିତାମ (ଦିତୁମ), ଦେବ (ଦେବୋ), ଦିଚେ, ଦିଚ୍ଛିଲୁମ, ଦାଓ, ଦେ, ଦିନ, ଦିକ, ଦିଯୋ (ଦିବୋ) ଇତ୍ୟାଦି ।

୫। ମୂଳସବର ଓ-କାରାନ୍ତ : ଧୋ-ଧାତୁ-ଧୋଯ, ଧୋନ, ଧୋଓ, ଧୁଛିସ, ଧୁଇବ, ଧୁଯେହିଲ, ଧୋସ, ଇତ୍ୟାଦି । ବାକି

ସବଗୁଲୋ ଉ-କାର ଯୁକ୍ତ ଧାତୁର ରୂପେର ନ୍ୟାୟ ।

প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ সাধনে কয়েকটি পরিবর্তন

(বৰ্ধনীর মধ্যে সাধু রূপটিও দেখানো হলো)

(ক) মূলস্বর অ-কারান্ত : 'হ' - হইয়েছে (হওয়াইয়াছে), হইয়েছিস (হওয়াইয়াছিস), হইয়েছিলুম (হওয়াইয়াছিলাম), হওয়াছি (হওয়াইতেছি), হয়ায়ো (হওয়াইও)।

(খ) মূলস্বর ই-ই-কারান্ত : হলে প্রযোজক ধাতুর চলিত রূপ কখনো ই-কারান্ত এবং কখনো এ-কারান্ত হয়। যেমন - (সাধু) শিখ > (চলিত) শেখ (ধাতু)।

রূপ সাধন : শিখাই-শেখাই-শিখুই। শেখাও-শিখোও। শেখালুম,-শিখোলুম। শেখালে-শিখোলে। শেখাতুম-শিখোতুম। শেখাতিস-শিখেতিস। শেখাত-শিখোতো। শেখাবি-শিখোবি। শিখাছি-শিখেছি (শিখাছি)। শেখাছে-শিখুছে। শেখাছিল-শিখেছিল। শেখাও-শেখোও। শেখ-শিখো।

(গ) মূলস্বর উ-কারান্ত : এর দুটো রূপ দেখা যায়। বৰ্ধনীর মধ্যে দ্বিতীয় রূপটিও দেখানো হলো।

শুন-ধাতুর রূপ সাধন : শুনাই (শোনাই)। শোনাও (শুনোও)। শুনান (শুনোন)। শোনায় (শুনোয়)। শুনানি (শুনোনি)। শুনালুম (শুনোলুম)। শোনাতুম (শুনোতুম)। শোনাতিস (শুনেতিস-শুনুতিস)। শোনাব (শুনোব)। শোনাছ (শুনাছ)। শোনাও (শোনোও)। শোনাস (শুনোস) ইত্যাদি।

বাক্য গঠন : আহা! কী হওয়াটাই না তুমি হওয়ালে। দাঢ়াও তোমাকে শেখাছি। তুই আর আমাকে কী শিখুবি? রোজ তোমাকে কত রূপকথা শোনাই। 'কী কথা শুনালি মোরে'। ওকে তুমি কী শুনাছ?

কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণ সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যেমন -

১. √আ-আইল>এল। আইলেন>এলেন। আইলে>এলে। আইলি>এলি। আইলাম>এলাম। আয় (অনুজ্ঞা)।
২. √আছ - (বৰ্তমান কালে) : আছে, আছেন, আছ, আছিস, আছি। (অতীত কালে) ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
- ৩। নহ ধাতু-(বৰ্তমান কালে) : নন, নহে, নহেন > নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
- ৪। বট ধাতু - (বৰ্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
- ৫। থাক (রহ) ধাতু (বৰ্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রহ), থাকিস, (রস, রোস, রহিস), থাকি (রই), থাকে (রয়) ইত্যাদি।

অতীত কাল : রহিত (রইত), রহিতেন (রইতেন), রহিতাম (রইতাম-রইতুম) ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল : রহিবে, (রইবে, রবে), রহিবেন (রইবেন), রহিবি (রইবি), রহিব (রইবো), রহিস (রোস, রোসো)।

ବାକ୍ୟ ଗଠନ : ‘କୋଥାକାର ଜାଦୁକର ଏଣି ଏଥାନେ ।’ ‘ଆଇଲ ରାଙ୍ଗସକୁଳ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବେଗେ ।’ କେମନ ଆହିସ ? କୋଥାଯି ଛିଲି ? ଦେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତୁମି ନାହିଁ । ‘ଏକା ଦେଖି କୁଳବଧୁ, କେ ବଟ ଆପନି ? ‘ଆଜି ଘରେ ଏକଲାଟି ପାରବୋ ନା ରାଇତେ ।’ ରୋସୋ, ତୋମାକେ ମଜା ଦେଖାଛି । ‘ହେଥା ନମ୍ବ, ହେଥା ନମ୍ବ, ଅନ୍ୟ କୋଥା, ଅନ୍ୟ କୋନ ଥାନେ ।’

ଅନୁଶୀଳନୀ

୧। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଚାରଟି ଉତ୍ତର ଦେଓୟା ହୁଅଛେ । ଠିକ ଉତ୍ତରଟିର ପାଶେ ଟିକ (√) ଚିହ୍ନ ଦାଓ :

(କ) ବାଲ୍ମୀ ଭାସାର ଧାତୁର ରୂପ କୌଣ୍ଟି ?

- | | |
|---------|---------|
| କ. ୧୮ଟି | ଘ. ୨୦ଟି |
| ଗ. ୧୯ଟି | ଘ. ୨୧ଟି |

(ଘ) କୋନ ଗୁଛେର ସବଗୁଲୋ ଧାତୁ ଉଠ-ଆଦି ଗପେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ?

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| କ. ଶୁଣ ଥୁଣ୍ଡ, ଡୁବ,, ତୁସ୍ | ଘ. ସହ, କହ, ବସ, ଶୁଣ, |
| ଗ. ଲିଖ, କିନ୍, ବାହ, ଡୁବ | ଘ. କିହ, ଡୁବ, ଲିଖ, ଶୁଣ |

(ଗ) କର-ଧାତୁର ଉତ୍ସମ ପୁରୁଷ ପୁରାଘଟିତ ଅଭୀତେ ଚଲିତ ରୂପ କୌଣ୍ଟି ?

- | | |
|-----------|--------------|
| କ. କରତାମ | ଘ. କରିଯାଇଲାମ |
| ଗ. କରିତାମ | ଘ. କରେଇଲାମ |

(ଘ) ଯା-ଧାତୁର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ନିତ୍ୟବୃତ୍ତ ଅଭୀତେର ଚଲିତ ଭାସାର ରୂପ କୌଣ୍ଟି ?

- | | |
|------------|---------|
| କ. ଗିଯେଇଲେ | ଘ. ଯେତେ |
| ଗ. ଯାଇଛି | ଘ. ଯାଇତ |

(ଓ) ଦେ-ଧାତୁର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଘଟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନେର ଚଲିତ ନୀତିର ରୂପ କୌଣ୍ଟି ?

- | | |
|-----------|-----------|
| କ. ଦିତେହେ | ଘ. ଦିତ |
| ଗ. ଦିଛେ | ଘ. ଦିଯେଇଲ |

(ଚ) କୋନ ଗୁଛେର ସବଗୁଲୋ ଧାତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ ?

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| କ. √ଆ, √ବଟ, √ଶିଖ √ଯା | ଘ. √ଆଛ, √ତା, √ ଶିଖ, √ଯା |
| ଗ. √ଆ, √ଥାକ୍, √ଆଛ, √ବଟ | ଘ. √ଥାକ୍, √ବଟ, √ଆ, √ଶିଖ |

(ଛ) ପ୍ରୟୋଜକ ଯା-ଧାତୁର ପୁରାଘଟିତ ଅଭୀତ କାଳେର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷେର ଚଲିତ ରୂପ କୌଣ୍ଟି ?

- | | |
|--------|-----------|
| କ. ଗେଲ | ଘ. ଗିଯାଇଲ |
| ଗ. ଯେତ | ଘ. ଗିଯେଇଲ |

(বা) নহ-ধাতুর সাধারণ বর্তমান উভয় পুরুষের চলিত রূপ কোনটি?

ক. নহি

খ. নহে

গ. নই

ঘ. নয়

২। ধাতু কাকে বলে? ধাতু কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার ধাতুর দুটো করে উদাহরণ দাও।

৩। নামধাতু বলতে কী বোঝ? নামধাতু কীভাবে গঠিত হয়, বাক্যে এর ব্যবহার দেখাও।

৪। সংজ্ঞা লেখ এবং বিশদভাবে বুবিয়ে দাও।

গিজন্ত ধাতু, অসম্পূর্ণ ধাতু, সহযোগমূলক ধাতু

৫। নিম্নলিখিত ধাতুগুলোর সাথে ও চলিত রূপ লেখ।

বল, শিখ, দে, শুন, যা, কহ, পড়, লিখ।

৬। শুন-ধাতুর শিজন্ত-প্রকরণের রূপগুলো লেখ।

৭। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

(ক) তিনটি ঘটমান কালের গাহ ধাতু।

(খ) কর-ধাতুর ভবিষ্যৎ শিজন্ত রূপ।

(গ) গাহ-ধাতুর বর্তমান কালের চলিত রূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কারক ও বিভক্তি এবং সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ

কারক : ‘কারক’ শব্দটির অর্থ – যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার :

- | | |
|--------------|-------------------|
| ১. কর্তৃকারক | ৪. সম্প্রদান কারক |
| ২. কর্ম কারক | ৫. অপাদান কারক |
| ৩. করণ কারক | ৬. অধিকরণ কারক |

একটি বাক্যে ছয়টি কারকের উদাহরণ –

* বেগম সাহেবা প্রতিদিন তাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

এখানে

১.	বেগম সাহেবা	–	ক্রিয়ার	সঙ্গে	কর্তৃসম্বন্ধ
২.	চাল	–	”	”	কর্ম সম্বন্ধ
৩.	হাতে	–	”	”	করণ সম্বন্ধ
৪.	গরিবদের	–	”	”	সম্প্রদান সম্বন্ধ
৫.	তাঁড়ার থেকে	–	”	”	অপাদান সম্বন্ধ
৬.	প্রতিদিন	–	”	”	অধিকরণ সম্বন্ধ

বিভক্তি : বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অবয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন – ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ + এ বিভক্তি), মা (মা + o বিভক্তি), শিশুকে (শিশু + কে বিভক্তি), চাঁদ (ঠাদ + o বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্য বিভক্তি আছে মনে করা হয়।

বাংলা শব্দ-বিভক্তি

০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ-বিভক্তি), এ, (য), তে (এ), কে, (ৱে,) র, (এরা) – এ কয়টিই খাটি বাংলা শব্দ বিভক্তি। এ ছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দও কারক-সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন-ঘারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।

বাংলা শব্দ-বিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।

একবচন এবং বহুবচন তেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন –

বিভক্তির আকৃতি

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	: o, অ, এ, (য়), তে, এতে।	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ।
দ্বিতীয়া	: o, অ, কে, রে (এরে), এ, য়, তে।	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের।
তৃতীয়া	: o, অ, এ, তে, দারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক।	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দারা, দিগ কর্তৃক, গুলির দারা, গুলিকে দিয়ে, * গুলো দিয়ে, গুলি কর্তৃক, * দের দিয়ে।
চতুর্থী	: দ্বিতীয়ার মতো।	দ্বিতীয়ার মতো।
পঞ্চমী	: এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে।	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে, গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে।
ষষ্ঠী	: র, এর।	*দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর।
সপ্তমী	: এ, (য়), য়, তে, এতে।	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে।

তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বৰ্বন্ধনীতে সিদ্ধিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

বিভক্তি যোগের নিয়ম

- (ক) অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ‘রা’ যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয় যেমন—পাথরগুলো, গুরুগুলি।
- (খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উভয় ‘কে’ বা ‘রে’ বিভক্তি হয় না, শূন্য বিভক্তি হয়। যথা—কলম দাও।
- (গ) স্বরান্ত শব্দের উভয় ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয়—‘য়’ বা ‘য়ে’। ‘এ’ স্থানে ‘তে’ বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে।
যেমন—মা+এ =মায়ে, ঘোড়া + এ = ঘোড়ায়, পানি + তে = পানিতে।
- (ঘ) অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উভয় প্রায়ই ‘রা’ স্থানে ‘এরা’ হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির ‘র’ স্থলে ‘এর’ যুক্ত হয়। যেমন—লোক + রা = লোকেরা। বিদান (ব্যঞ্জনান্ত) + রা = বিদানেরা। মানুষ + এর = মানুষের।
লোক + এর = লোকের। কিন্তু অ-কারান্ত, আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত থাটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক
বচনে সাধারণ ‘র’ যুক্ত হয়, ‘এর’ যুক্ত হয় না। যেমন—বড়ু, মামার, ছেলের।

কর্তৃকারক

বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক।

ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই কর্তৃকারক। যেমন – খোকা বই পড়ে। (কে পড়ে? খোকা – কর্তৃকারক)। মেয়েরা ফুল তোলে। (কারা তোলে? মেয়েরা – কর্তৃকারক)।

কর্তৃকারকের প্রকারভেদ

ক. কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে :

১. মুখ্য কর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন – ছেলেরা ফুটবল খেলছে।
মুফলধারে বৃক্ষ গড়ছে।

২. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায়, তখন তাকে
প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন – শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াছেন।

৩. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। ওপরের
বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা।

তন্ত্র – রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে একজাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাদের ব্যতিহার
কর্তা বলে। যেমন –

বাষ্পে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়।

রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

খ. বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিনি রকম হতে পারে। যেমন –

১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দ্বারা ঢোর ধূত হয়েছে।

২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।

৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : ঝালি বাজে। কলমটা সেখে ভালো।

কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : হামিদ বই পড়ে।

খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বশিরকে যেতে হবে।

গ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : আমার যাওয়া হয়নি।

(ঙ) সন্তমী বা এ বিভক্তি	:	গৌয়ে মানে না, আপনি মোড়ুল। বাপে না জিজ্ঞাসে, মাঝে না সম্ভাষে। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়। বাঘে—মহিষে খানা একবাটে খাবে না।
য-বিভক্তি	:	দোড়ায় গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি	:	গহুতে দুধ দেয়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কৌসে?

কর্মকারক

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্মন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে।

কর্ম দুই প্রকার : মুখ্য কর্ম, গৌণ কর্ম। যেমন—

বাবা আমাকে (গৌণ কর্ম) একটি কলম (মুখ্য কর্ম) কিনে দিয়েছেন।

সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক ও গৌণ কর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণ কর্মে বিভক্তি যুক্ত হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

কর্মকারকের প্রকারভেদ

- ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।
- খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : ছেলেটিকে বিছানায় শোয়াও।
- গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক সুম ঘুমিয়েছি।
- ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরম্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন—

দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।

কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ডাক্তার ডাক।
- আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্য কর্ম)
রবাস্তুনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।
(গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)
- (খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি
রে বিভক্তি : তাকে বল।
‘আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা’।

- (গ) যষ্টী বা র বিভক্তি : তোমার দেখা পেলাম না।
 (ঘ) সন্তমীর এ বিভক্তি : ‘জিজ্ঞাসিবে জনে জনে।’ (বীক্ষায়)

করণ কারক

‘করণ’ শব্দটির অর্থ : যষ্ট, সহায়ক বা উপায়।

ক্রিয়া সম্পাদনের যষ্ট, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘কীসের দ্বারা’ বা ‘কী উপায়ে’ প্রশংসন করলে যে উভয়টি পাওয়া যায়, তা-ই করণ কারক। যেমন —

নীরা কলম দিয়ে লেখে। (উপকরণ – কলম)

‘জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়।’ (উপায় – সাধনা)

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ছত্রো বল খেলে। (অকর্মক ক্রিয়া)
 ডাকাতেরা গৃহস্থামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)
- (খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি
 দিয়া বিভক্তি : শাঙ্কাল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।
 মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপর্জন।
- (গ) সন্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি
 তে বিভক্তি : ফুলে ফুলে ঘর তরেছে।
 শিকারি বিড়াল গৌফে চেনা যায়।
- তে বিভক্তি : ‘এত শঠতা, এত যে ব্যথা,
 তবু যেন তা মধুতে মাখা।’ – নজরুল।
 লোকটা আতিতে বৈষ্ণব।
- য বিভক্তি : চেষ্টায় সব হয়।
 এ সুতায় কাপড় হয় না।

সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (স্বত্ত্বত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়— ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।

(অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না; কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।)

সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যবহার

(ক) চতুর্থী বা কে বিভিন্ন : ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। (ষষ্ঠ্যত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে। যেমন – ধোপাকে কাপড় দাও।)

(খ) সপ্তমী বা এ বিভিন্ন : সৎপোত্রে কন্যা দান কর। সমিতিতে টাঁদা দাও। ‘অস্বজনে দেহ আলো’।

জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে ‘কে’ বিভিন্ন যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভিন্ন হয়। যেমন – ‘বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।’

অপাদান কারক

যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন –

বিচ্যুত : গাছ থেকে পাতা পড়ে।
মেষ থেকে বৃষ্টি পড়ে।

গৃহীত : সুন্তি থেকে মুক্তো মেলে।
দুখ থেকে দই হয়।

জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
খেজুর রসে গুড় হয়।

বিরত : পাপে বিরত হও।

দূরীভূত : দেশ থেকে পঞ্চাপাল চলে গেছে।

রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।

আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।

ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্ন হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রয়োগ

(ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভিন্ন : বৈঁটা-আঙগা ফল গাছে থাকে না।’
‘মনে পড়ে সেই জৈষ্ঠ দুপুরে গাঠশালা পলায়ন।’

(খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভিন্ন : বাবাকে বড় ভয় পাই।

(গ) ষষ্ঠী বা এর বিভিন্ন : যেখানে বাদের ভয় সেখানে সম্পৰ্ক হয়।

(ঘ) সপ্তমী বা এ বিভিন্ন : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।

য় বিভিন্ন : টাকায় টাকা হয়।

বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

- (ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।
- (খ) দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
- (গ) নিষ্কেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সম্ভবী অর্থাৎ ‘এ’ ‘য়’ ‘তে’ ইত্যাদি বিভিন্ন যুক্ত হয়। যথা—

- আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নেই।
- কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য উঠে।
- অধিকরণ তিনি প্রকার : ১. কালাধিকরণ।
২. আধারাধিকরণ।
৩. ভাবাধিকরণ।

যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সম্ভবী বিভিন্নের প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সম্ভবী বলা হয়। যেমন—

সুর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।

আধারাধিকরণ তিনি ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক, ২. অভিব্যাপক এবং ৩. বৈষয়িক।

১. ঐকদেশিক : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া স্থাপিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন—

পুরুরে মাছ আছে। (পুরুরের যে কোনো একস্থানে)

বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)

আকাশে টাই উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)

সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক অধিকরণ হয়। যেমন—

ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে (ঘাটের কাছে)। দুয়ারে দাঢ়ায়ে প্রাণী,

ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে), রাজাৰ দুয়ারে হাতি বাঁধা।

২. অভিব্যাপক : উদিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন—

তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)

নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে।)

৩. বৈষয়িক : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারণ কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।

আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, শুশ্রে অপরাজেয়।

অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

- (ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নেই।
- (খ) তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিগোন (এর ভিতরে) দিয়ে ওযুধ থাবে।
- (গ) পক্ষমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
- (ঘ) সম্পত্তী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নেই।

অধিকরণে অনুসর্ণের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

পরিশিষ্ট

১। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে – রহিম বাড়ি যায়।
- (খ) কর্মকারকে – ডাঙ্কার ডাক।
- (গ) করণে – ঘোড়াকে চাবুক মার।
- (ঘ) অপাদানে – গাড়ি স্টেশন ছাড়।
- (ঙ) অধিকরণে – সারাবাত বৃষ্টি হয়েছে।

২. বিভিন্ন কারকে সম্পত্তী বা এ বিভক্তি

- (ক) কর্তৃকারকে – লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।
- (খ) কর্মকারকে – এ অধীনে দায়িত্বার অর্পণ করুন।
- (গ) করণে – এ কলমে ভালো লেখা হয়।
- (ঘ) অপাদানে – ‘আমি কি ডরাই সবি ভিখারি রাখবে?’
- (ঙ) অধিকরণে – এ দেহে প্রাণ নেই।

সম্বলিত পদ

ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বলিত পদ বলে। যেমন— মতিনের ভাই বাড়ি যাবে।

এখানে ‘মতিলের’ সঙ্গে ‘ভাই’—এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু ‘যাবে’ ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নেই।

জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নেই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।

সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

(ক) সম্বন্ধ পদে ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা : আমি + র = আমার (ভাই), খালিদ +

এর = খালিদের (বই)।

(খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার > কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

আজি + কার = আজিকার > আজকের (কাগজ)। পূর্বে + কার = পূর্বেকার (ঘটলা)

কালি + কার = কালিকার > কালকার > কালকের (ছেলে)।

কিন্তু ‘কাল’ শব্দের উভয়ের শুধু ‘এর’ বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল + এর = কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন—

(ক) অধিকরণ সম্বন্ধ	:	রাজার রাজ্য, প্রজার জমি।
(খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ	:	গাছের ফল, পুরুরের মাছ।
(গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ	:	অগ্নির উত্তাপ, রোগের কষ্ট।
(ঘ) উপাদান সম্বন্ধ	:	বৃপ্তির থালা, সোনার বাটি।
(ঙ) গুণ সম্বন্ধ	:	মধুর মিষ্টান্তা, নিমের তিক্ততা।
(চ) হেতু সম্বন্ধ	:	ধনের অহংকার, বৃপ্তের দেমাক।
(ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ	:	রোজার ছুটি, শরতের আকাশ।
(জ) কৃতি সম্বন্ধ	:	গাঢ়ের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর।
(ঝ) অংশ সম্বন্ধ	:	হাতির দাঁত, মাথার চুল।
(ঝঝ) ব্যবসায় সম্বন্ধ	:	পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারি।
(ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ	:	একের তিন, সাতের পাঁচ।
(ঠ) কৃতি সম্বন্ধ	:	নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’ মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।
(ড) আধাৱ-আধেয়	:	বাটিৰ দুধ, শিশিৰ ওযুধ।
(ঢ) অভেদ সম্বন্ধ	:	জ্ঞানের আগোক, দুঃখের দহন।

- (গ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : ননীর পুতুল, শোহার শরীর।
- (ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, মৌখনের চাখল্য।
- (থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : সবার সেরা, সবার ছেট।
- (দ) কারক সম্বন্ধ :
 (১) কর্তৃ সম্বন্ধ — রাজাৰ হুকুম।
 (২) কর্ম সম্বন্ধ — প্রভুৰ সেবা, সাধুৰ দর্শন।
 (৩) কারক সম্বন্ধ — চোখেৰ দেখা, হাতেৰ লাঠি।
 (৪) অপাদান সম্বন্ধ — বাঘেৰ ভয়, বৃষ্টিৰ পানি।
 (৫) অধিকরণ সম্বন্ধ — ক্ষেত্ৰেৰ ধান, দেশেৰ লোক।

সম্বোধন পদ

‘সম্বোধন’ শব্দটিৱ অর্থ আহবান। যাকে সম্বোধন বা আহবান কৱে কিছু বলা হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন— শুহে মাৰি, আমাকে পার কৰো। সুমন, এখানে এসো।

জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যেৰ অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিতি ক্রিয়াপদেৰ সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

- অনেক সময় সম্বোধন পদেৰ পূৰ্বে ওগো, ওৱে, হে, ওগো, অয়ি প্ৰত্যুতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনেৰ সূচনা কৰে। যেমন— ‘ওগো, তোৱা জয়ধৰনি কৰ।’ ‘ওৱে, আজ তোৱা যাস নে ঘৱেৱ বাহিৱে।’ ‘অয়ি নিৱমল উষা, কে তোমাকে নিৱমিল?’
- অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদেৰ কাজ কৱে থাকে।
- সম্বোধন পদেৰ পৱে অনেক বিস্যসূচক চিহ্ন দেওয়া হয়। এই ধৰনেৰ বিস্যসূচক চিহ্নকে সম্বোধন চিহ্ন বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নেৰ প্ৰয়োগই বেশি হয়। যেমন— ওৱে খোকা, যাবাৰ সময়ে একটা কথা শুনে যাস।

অনুশীলনী

১। প্ৰত্যেক প্ৰশ্নেৰ চারটি কৱে উন্তুৰ দেওয়া হয়েছে। সৰ্বোন্তম উন্তুৱিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) কোন বাক্যে ব্যতিহাৰ কৰ্তা রয়েছে?

ক. মা শিশুকে টাঁদ দেখাচ্ছেন

গ. বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না

খ. রাখাল গুৱুৰ পাল লয়ে যায় মাঠে

ঘ. তোমাকে পড়তে হবে

(২) কোন বাক্যটিতে কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়েছে?

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ক. শিক্ষক মহোদয় ছাত্রকে পড়াচ্ছেন | গ. তারা বল খেলে |
| খ. ডাক্তার ডাক | ঘ. আমি ঢাকা যাচ্ছি |

(৩) কোন বাক্যটিতে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে?

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ক. তেলাপোকাকে ডয় পাই | গ. ভিস্কুককে দান কর |
| খ. তাকে ডেকে আন | ঘ. ‘বেলা যে পড়ে এল জলকে চল’ |

(৪) কোন বাক্যে ভাবে স্প্রত্মী-র প্রয়োগ রয়েছে?

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ক. সূর্যস্তে চারদিক অন্ধকারে আবৃত হয় | গ. ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর’ |
| খ. লোকে কৃত কথা বলে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

(৫) কোন বাক্যে করণ কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ক. আমি স্কুলে যাচ্ছি | গ. ছেলেরা মাঠে বল খেলে |
| খ. সে ঢাকা যাবে | ঘ. তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাক |

(৬) কোন বাক্যে ভাববাচ্যের কর্তার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ক. সে গ্রামে যাবে | গ. ছুটি হলে ঘণ্টা বাজে |
| খ. তাকে গ্রামে যেতে হবে | ঘ. আমার যাওয়া হবে না |

(৭) কোন বাক্যে বিধেয় কর্ম রয়েছে?

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ক. তাকে আমরা চিনি না | গ. ‘জিজ্ঞাসিব জনে জনে’ |
| খ. ‘দুধকে আমরা দুগ্ধ বলি’ | ঘ. লাঙাল দ্বারা জমি চাষ করা হয় |

(৮) কোন বাক্যে কর্তায় এ-বিভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ক. পাগলে কী না বলে | গ. ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে |
| খ. বনে বাঘ আছে | ঘ. ‘অন্ধজনে দেহ আলো’ |

২। কারক বলতে কী বোঝ? কারক নির্বাচনে শব্দ বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৩। বাল্লা শব্দ বিভক্তিগুলোর নাম লেখ এবং বচন অনুসারে তাদের সাজাও।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. অপ্রাপ্তি বা ইতর প্রাপ্তিবাচক শব্দের বহুবচনে ----- বিভক্তি যুক্ত হয় না।

খ. স্বরান্ত শব্দের উন্তর ‘এ’ বিভক্তির রূপ হয় ‘য়’ অথবা -----।

গ. বাংলা শব্দে, অ, আ এবং এ-কারান্ত শব্দে ষষ্ঠীর এক বচনে শুধু ‘র’ যুক্ত হয়, --- যুক্ত হয় না।

৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও।

(ক) প্রযোজক কর্তা (খ) কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (গ) বিধেয় কর্ম (ঘ) ভাবে সম্ভবী

(ঙ) গৌণ কর্ম (চ) অভিব্যাপক অধিকরণ (ছ) নামধাতুজ কর্মকারক।

৬। নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর।

(১) আজ আর আমার যাওয়া হবে না।

(২) গোয়ালা গুরু দোহন করে।

(৩) নিজের চেষ্টায় বড় হও।

(৪) শিকারি বিড়াল গৌফে ঢেনা যায়।

(৫) বাবাকে বড় ভয় পাই।

(৬) বৈটা-আলগা ফল গাছে থাকে না।

(৭) লোকটা কানায় ভেজো পড়ল।

৭। বাক্যে উদাহরণ দাও।

(ক) অপাদান কারকে শূন্য বিভক্তি

(খ) অপাদান কারকে ‘এ’ বিভক্তি

(গ) করণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি

(ঘ) কর্তৃকারকে ‘তে’ বিভক্তি

৮। বিভিন্ন কারকে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ দেখিয়ে বাক্য গঠন কর।

৯। সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় কিনা, উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

১০। খাটি বাংলা সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখিয়ে দুটি বাক্য রচনা কর।

১১। বিভিন্ন কারকে সম্ভবী বিভক্তির ব্যবহার দেখাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ

বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাকে ব্যবহৃত হয়ে বাকের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা ‘কে’ এবং ‘র’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন—

বিনা : দৃঢ়খ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ? (প্রাতিপদিকের পরে)

সনে : ময়ূরীর সনে নাচিষে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (ষষ্ঠীয়ার ‘কে’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন—

প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, উপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, তিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্মে, জন্য, পর্যন্ত অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, ঘারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, খেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতর ইত্যাদি।

এদের মধ্যে ঘারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রতৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে।

অনুসর্গের প্রয়োগ

১. বিনা/বিনে : কর্তৃ কারকের সঙ্গে – তুমি বিনা (বিনে) আমার কে আছে ?
বিনি : করণ কারকের সঙ্গে – বিনি সুতায় গাথা মালা।
বিহনে : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ ?
২. সহ : সহগামিতা অর্থে – তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
সহিত : সমসূত্রে অর্থে – শত্রুর সহিত সম্পর্ক চাই না।
সনে : বিবুদ্ধগামিতা অর্থে – ‘দৃশ্যনক্ষত শ্যেন বিহৃতা মুঁকে ভুজত্বা সনে।’
সঙ্গে : তুলনায় – মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।
৩. অবধি : পর্যন্ত অর্থে – সম্বৰ্য্যা অবধি অপেক্ষা করব।
৪. পরে : স্বল্প বিরতি অর্থে – এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।
পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে – শরতের পরে আসে বসন্ত।

৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে – এ তো ঘর পানে ছুটেছেন।
 ‘শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হন।’
৬. মতো : ন্যায় অর্থে – বেকুবের মতো কাজ করো না।
 মত অর্থে – এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।
৭. পক্ষে : সক্ষমতা অর্থে – রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।
 সহায় অর্থে – আসামির পক্ষে উকিল কে?
৮. মাঝে : মধ্যে অর্থে – ‘সীমার মাঝে অসীম ভূমি’।
 একদেশিক অর্থে – এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।
 ক্ষণকাল অর্থে – নিমেষ মাঝেই সব শেষ।
- মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে – ‘আছ ভূমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’
৯. কাছে : নিকটে অর্থে – আমার কাছে আর কে আসবে?
 কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে – ‘রাখাল শুধায় আসি ত্রাক্ষণের কাছে।’
১০. প্রতি : প্রত্যেক অর্থে – মণপ্রতি শীচ টাকা লাভ দেব।
 দিকে বা ওপর অর্থে – ‘নিদানুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।’
১১. হেতু : নিমিস্ত অর্থে – ‘কী হেতু এসেছ ভূমি, কহ বিস্তারিয়া।’
- জন্মে : নিমিস্ত অর্থে – ‘এ ধন-সম্পদ তোমার জন্মে।’
- সহকারে : সঙ্গে অর্থে – আগ্রহ সহকারে কইলেন।
- বশত : কারণে অর্থে – দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোন্নতিতে টিক () চিহ্ন দাও।

(১) অনুসৰ্গ সাধারণত কোথায় বসে?

ক. শব্দের পূর্বে

গ. শব্দের মধ্যে

খ. শব্দের পরে

ঘ. বাক্যের শেষে

(২) অনুসর্গ কী?

ক. শব্দ-বিভক্তি

গ. উপসর্গ

খ. ক্রিয়া-বিভক্তি

ঘ. অব্যয়

(৩) ‘শরতের পর আসে বসন্ত’। এখানে ‘পর’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. দীর্ঘ বিরতি

গ. বিরতি

খ. অল্প বিরতি

ঘ. নেকট্য

(৪) ‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।’—‘হেতু’ অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করেছে?

ক. ব্যাপার

গ. নিমিষ

খ. প্রার্থনা

ঘ. প্রসঙ্গ

(৫) এ দেশের মাঝে এক দিন সব ছিল। এখানে ‘মাঝে’—অনুসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সর্বত্র

গ. মধ্যে

খ. একদেশিক

ঘ. ব্যাপ্তি

(৬) তোমার তরে এনেছি মালা গৌথিয়া।—এখানে ‘তরে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. মত

গ. মধ্যে

খ. নিকট

ঘ. নিমিষ

(৭) ‘দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গা যুবে ভুজঙ্গা সনে।’—এখানে ‘সনে’ শব্দটি কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. বিরুদ্ধগামিতা

গ. প্রতি

খ. সঙ্গে

ঘ. হেতু

(৮) ‘বিনে স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা।’—এখানে ‘বিনে’ কী অর্থ প্রকাশ করছে?

ক. সঙ্গে

গ. ব্যতিরেকে

খ. প্রয়োজন

ঘ. আবশ্যিকতা

(৯) ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।’—এখানে ‘মাঝারে’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. বাইরে

গ. মধ্যে

খ. ব্যাপ্তি

ঘ. সঙ্গে

(১০) অনুসর্গ কী করে?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ক. বিভক্তির কাজ করে | গ. শব্দের অর্থ স্পষ্টতর করে |
| খ. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে | ঘ. বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে |

২। অনুসর্গ বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বল।

৩। অনুসর্গ এবং খাটি বাংলা শব্দ বিভক্তির পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ কর।

৪। বাংলা ভাষায় কোন কোন অনুসর্গ কারক-বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে স্থূলাক্ষরে লিখিত অনুসর্গগুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রতিটি বাক্যের ডান দিকে লেখ।

- (ক) শরতের পর আসে হেমন্ত।
- (খ) বেকুবের মতো বলেছ।
- (গ) গরিবের পক্ষে কথা বলার লোক নেই।
- (ঘ) সম্র্জ্য অবধি অপেক্ষা করব।
- (ঙ) মায়ের কাছে কথাটি শুধাব।
- (চ) ‘নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিরাট উল্লাসে।
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছাসে।
- (ছ) শুর সনে আমার আড়ি।
- (জ) মণ্প্রতি যত তজ্জ্বল হইবেক দর।
- (ঝ) ‘সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

গুরুত্বমূল অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য প্রকরণ

বাক্যের শক্ষণ ও প্রকারভেদ : ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এবং বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ।

যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তৃর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।

কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনো পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অবয় থাকা আবশ্যিক। এ ছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অস্ত্ব ভাব পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই তা বাক্য হবে।

ভাষার বিচারে বাক্যের নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকা চাই। যেমন –

- (১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসন্তি এবং (৩) যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। যেমন – ‘চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চাৱদিকে’ – এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায় : চন্দ্ৰ পৃথিবীৰ চাৱদিকে হোৱে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২. আসন্তি : মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পর পর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রহণ না হয়। বাক্যের অর্থসজ্ঞাতি রচকার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসন্তি। যেমন –

কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। সেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অভান্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করার জন্য শব্দগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে। যেমন –

কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসন্তিসম্পন্ন।

৩. যোগ্যতা : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মিলবৰ্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন – বর্ধার বৃক্ষিতে প্লাবনের সূচিটি হয়। – এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে।

কিন্তু ‘বর্ধার রৌদ্র প্লাবনের সূচিটি করে।’ – বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সূচিটি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে

(ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

শব্দ	রীতিসম্ম	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রকৃতি + প্রত্যয়জাত অর্থ
১. বাধিত	অনুগ্রহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ + ইত	বাধাপ্রাপ্ত
২. তৈল	তিল জাতীয়	তিল + ফ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, বিশেষ কোনো শস্যের রস।

(খ) দুর্বোধ্যতা : অপচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন – তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছো। (চাতুরী বা মায়া অর্থে, কিন্তু বাংলা ‘প্রপঞ্চ’ শব্দটি অপচলিত)।

(গ) উপমার ভূল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা অঙ্গকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন –

আমার হৃদয়–মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। বীজ ক্ষেতে বগন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়–ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হলো।

(ঘ) বাহুল্য–দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন –

দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। ‘আলেমগণ’ বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে ‘সব’ শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্য–দোষ সৃষ্টি করেছে।

(ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেষ্ট পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন – ‘অরণ্যে ঝোড়ন’ (অর্থ : নিষ্কৃত আবেদন)–এর পরিবর্তে যদি বলা হয়।, ‘বনে ঝুলন’ তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

(চ) গুরুচঙ্গলী দোষ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কথনে গুরুচঙ্গলী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুর্বল শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। ‘গুরুর গাঢ়ি’, ‘শবদাহ’, ‘মড়াপোড়া’ প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে ‘গুরুর শকট’, ‘শবপোড়া’, ‘মড়াদাহ’ প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচঙ্গলী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অর্থ থাকে : উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অর্থে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন –

থোকা এখন	বই পড়ছে
(উদ্দেশ্য)	(বিধেয়)

বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন –

সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুরী। – বিশেষ্যস্থানীয় পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে।
মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়। – ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ।

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

- একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে।
- উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ:	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
১. বিশেষ যোগে-	কৃত্যাত	দস্যুদল	ধরা পড়েছে।
২. সম্বন্ধ পদযোগে-	হাসিমের	ভাই	এসেছে।
৩. সমার্থক বাক্যাংশ যোগে-	যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী,	তারাই	উন্নতি করে।
৪. অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষ যোগে-	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	বড় সাহেব	থাকেন।
৫. বিশেষ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে-	যার কথা তোমরা বলে থাক, তিনি		এসেছেন।
বিধেয়ের সম্প্রসারণ:	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
১. ক্রিয়া বিশেষ যোগে-	ঘোড়া	দ্রুত	চলে।
২. ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে-	জ্ঞেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
৩. কারকাদি যোগে-	ভুবনের	ঘাটে ঘাটে	ভাসিছে।
৪. ক্রিয়া বিশেষ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে- তিনি		যে ভাবেই হোক	আসবেন।
৫. বিধেয় বিশেষ যোগে-	ইনি	আমার বিশেষ	অন্তরঙ্গ বন্ধ (হন)।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ

বাক্য তিনি প্রকার : (১) সরল বাক্য, (২) মিশ্র বা জটিল বাক্য, (৩) যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যথা – পুকুরে পদ্মফূল জন্মে। এখানে ‘পদ্মফূল’ উদ্দেশ্য এবং ‘জন্মে’ বিধেয়।

এ রূপক : বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। খোকা আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। মেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণপেক্ষ ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিদ্যালয় মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্ৰজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সঙ্গীত রচনা করেন (বিধেয়)।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরম্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা—

আশ্রিত বাক্য	প্রধান খণ্ডবাক্য
১. যে পরিশ্রম করে,	সে-ই সুখ লাভ করে।
২. সে যে অপরাধ করেছে,	তা মুখ দেখেই বুঝেছি।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য তিনি প্রকার : (ক) বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (খ) বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য, (গ) ক্রিয়া বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খণ্ডবাক্য।

ক. বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Noun clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Subordinate clause) প্রধান খঙ্গবাক্যের যে কোনো পদের আশ্রিত থেকে বিশেষ্যের কাজ করে, তাকে বিশেষস্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যথা :

—আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে। (বিশেষ স্থানীয় খঙ্গবাক্য ক্রিয়ার কর্মরূপে ব্যবহৃত)

তদুপ : তিনি বাড়ি আছেন কি না, আমি জানি না। ব্যাপারটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ফল ভালো হবে না।

(খ) বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য (Adjective clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য প্রধান খঙ্গবাক্যের অন্তর্গত কোনো বিশেষ বা সর্বনামের দোষ, গুণ এবং অবস্থা প্রকাশ করে, তাকে বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যথা :

—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। (আশ্রিত বাক্যটি ‘সেই’ সর্বনামের অবস্থা প্রকাশ করছে)।

তদুপ : ‘ঁাটি সোনার চাইতে ঁাটি, আমার দেশের মাটি’।

‘ধনধান্য পুক্কে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।’

যে সভায় অনুপস্থিত, সে বড় দুর্ভাগ।

গ) ক্রিয়া-বিশেষ স্থানীয় খঙ্গবাক্য (Adverbial clause) : যে আশ্রিত খঙ্গবাক্য ক্রিয়াপদের স্থান, কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ক্রিয়া-বিশেষ স্থানীয় আশ্রিত খঙ্গবাক্য বলে। যেমন —

‘যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।’

তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি।

যেখানে আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই দিকচক্রবাল।

৩. যৌগিক বাক্য : পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য : যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিন্বা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন —

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়সত পরিশ্ৰম কৰিব, তথাপি অন্যের দ্বারা স্থ হব না।

বাক্য রূপান্তর

অর্থের কোনোরূপ রূপান্তর না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকার বাক্যে রূপান্তর করার নামই বাক্য রূপান্তর।

ক. সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যথা :

১. সরল বাক্য : ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
২. সরল বাক্য : তার দর্শনমাত্রাই আমরা প্রস্থান করলাম।
মিশ্র বাক্য : যে-ই তার দর্শন পেলাম, সে-ই আমরা প্রস্থান করলাম।
৩. সরল বাক্য : ভিজুককে দান কর।
মিশ্র বাক্য : যে ভিজু চায়, তাকে দান কর।

খ. মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর : মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

১. মিশ্র বাক্য : যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য : নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।
২. মিশ্র বাক্য : যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন এ খণ্ড স্মীকার করব।
সরল বাক্য : আজীবন এ খণ্ড স্মীকার করব।
৩. মিশ্র বাক্য : যে সকল পশু মাস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।
সরল বাক্য : মাসভোজী পশু অত্যন্ত বলবান।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয়। এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন –

১. সরল বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাঢ়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য : তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাঢ়ি যেতে বললেন।
২. সরল বাক্য : পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত।
যৌগিক বাক্য : এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।
৩. সরল বাক্য : আমি বতু কষ্টে শিক্ষা লাভ করেছি।
যৌগিক বাক্য : আমি বতু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে

- (১) বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।
- (২) অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।
- (৩) অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।
- (৪) কোনো কোনো স্থলে একটি বাক্যকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যথা :

(১) যৌগিক বাক্য	:	সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য	:	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
(২) যৌগিক বাক্য	:	তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বৃদ্ধি হয়নি।
সরল বাক্য	:	তার বয়স হলেও বৃদ্ধি হয়নি।
(৩) যৌগিক বাক্য	:	মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ুর ন্ত্য করে।
সরল বাক্য	:	মেঘ গর্জন করলে ময়ুর ন্ত্য করে।

ঙ. যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর

যৌগিক বাক্যের অঙ্গগত পরস্পর নিরাপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে ‘যদি’ কিংবা ‘যদিও’ এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে ‘তাহলে’ (তাহা হইলে) কিংবা ‘তথাপি’ অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) যৌগিক বাক্য	:	দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
মিশ্র বাক্য	:	যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।
(২) যৌগিক বাক্য	:	তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তৎকরণ অতিশয় উচ্চ।
মিশ্র বাক্য	:	যদিও তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, তথাপি তাঁর অন্তৎকরণ অতিশয় উচ্চ।
সাপেক্ষ অব্যয়ের সাহায্যেও যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিবর্তন করা যায়। যথা :		
যৌগিক বাক্য	:	এ গ্রামে একটি দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।
মিশ্র বাক্য	:	এ গ্রামে যে দরগাহ আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

চ. মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন –

(১) মিশ্র বাক্য	:	যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য	:	সে কাল আসবে এবং আমি যাব।
(২) মিশ্র বাক্য	:	যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য	:	বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
(৩) মিশ্র বাক্য	:	যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।
যৌগিক বাক্য	:	তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা : বাক্যের বিভিন্ন অংশ পৃথক করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণালীকে বাক্য বিশ্লেষণ বলে।

ক. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

১. মহারাজ শুন্দোধনের পুত্র শাক্যসিংহ যৌবনে সৎসার ত্যাগ করেন।
২. ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা) দীন ইসলামের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছিলেন।

ওপরে লিখিত বাক্য দুটিকে (১) উদ্দেশ্য, (২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক, (৩) বিধেয়, (৪) বিধেয়ের সম্প্রসারক – এ চারটি অংশে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
(১) মহারাজ শুন্দোধনের পুত্র	শাক্যসিংহ	যৌবনে সৎসার	ত্যাগ করেন।
(২) ইসলামের প্রথম খলিফা	হজরত আবু বকর (রা)	দীন ইসলামের জন্য	দান করেছিলেন।
তাঁর যথাসর্বস্ব			

খ. মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ

মিশ্র বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রথমে প্রধান বাক্যটি প্রদর্শন করতে হয়।

২. খণ্ডবাক্য (গুলো) প্রদর্শন করে তাদের সঙ্গে প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ উল্লেখ করতে হয়।

৩. প্রধান এবং অপ্রধান খণ্ডবাক্যের মধ্যে কোনো সংযোজক পদ থাকলে তাও দেখাতে হয়। যেমন—আমি স্থির করলাম যে, এরূপ অন্ন বয়স্ক বালককে পাঠাব না। এখানে প্রধান বাক্য—(১) আমি স্থির করলাম; সংযোজক পদ—যে; বিশেষ্য—স্থানীয় খণ্ডবাক্য — (২) অন্ন বয়স্ক বালককে পাঠাব না।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক বা সাপেক্ষ অব্যয়
(১)	আমি	অন্ন বয়স্ক বালককে	স্থির করলাম	যে
(২)	(আমি) (উহ)		পাঠাব না।	এবং

গ. যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ করতে হলে

১. প্রত্যেকটি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করতে হবে।
২. কোনো সংযোজক অব্যয় থাকলে তা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন – ত্যাগ এবং জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। এখানে দুটি বাক্য আছে। যেমন –

 - (১) ত্যাগ মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে।
 - (২) জ্ঞান মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করে। বাক্য দুটির সংযোজক অব্যয় ‘এবং’।

বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়	সংযোজক অব্যয়
(১)	ত্যাগ	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	এবং
(২)	জ্ঞান	মানুষকে মুক্তির পথে	পরিচালিত করে	

বাক্য সংক্ষেপণ

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। এটি বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশেরই নামান্তর। এখানে বাক্য সংকোচনের উদাহরণ দেওয়া গেল।

বাক্য সংক্ষেপণের বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ

অকালে পক্ষ হয়েছে যা – অকালপক্ষ।

অঙ্গির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ।

অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার – অনভিজ্ঞ।

অহংকার নেই যার – নিরহংকার।

অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম।

অনুত্ত (বা পঞ্চাত্ত) জন্মেছে যে – অনুজ।

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত, আদ্যোপ্যন্ত।

আকাশে বেড়ায় যে – আকাশচারী, খেচে।

আচারে নিষ্ঠা আছে যার – আচারনিষ্ঠ।

আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা – আআকেন্দ্রিক।

আপনাকে যে পঞ্চিত মনে করে – পঞ্চিতশ্বন্য।

আল্পাহৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার – অস্তিক।

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক।
 ইতিহাস রচনা করেন যিনি – ঐতিহাসিক।
 ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেদ্বা।
 ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়।
 ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গুরু যার – আঁষটে।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে – কৃতজ্ঞ।
 উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না – অকৃতজ্ঞ।
 উপকারীর অপকার করে যে – কৃত্য।
 একই মাতার উদরে জাত যে – সহোদর।
 এক খেকে শুরু করে ক্রমাগত – একাদশমে।
 কর্ম সম্মাদনে পরিশূলী – কর্মঠ।
 কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না – অনিবার্য।
 চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত – চাক্ষুষ।
 জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্ত।
 তল সৰ্প করা যায় না যার – অতঙ্গসৰ্পী।
 দিনে যে একবার আহার করে – একাহারী।
 নষ্ট হওয়াই স্বত্বাব যার – নশ্বর।
 নদী মেখলা যে দেশের – নদীমেখলা।
 বৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে – নাবিক।
 পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক।
 ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় – ওষধি।
 বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী।
 বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন।
 মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমুর্শু।
 যা দমন করা যায় না – অদম্য।
 যা দমন করা কষ্টকর – দুর্দমনীয়।
 যা নিবারণ করা কষ্টকর – দুর্নিবার।
 যা পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব।
 যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি।

যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে – সর্বহারা, হৃতসর্বস্ব।
 যার কোনো কিছু থেকেই শয় নেই – অকুতোভয়।
 যার আকার কুস্মিত – কদাকার।
 যা বিনা যত্নে শান্ত করা গিয়েছে – অযত্নস্থ।
 যা বার বার দুলছে – দোদুল্যমান।
 যা দীনিত পাঞ্চে – দেদীপ্যমান।
 যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না এমন – অনন্যসাধারণ।
 যা পূর্বে দেখা যায়নি এমন – অদ্বৃতপূর্ব।
 যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়।
 যা কষ্টে শান্ত করা যায় – দুর্ণত।
 যা অধ্যয়ন করা হয়েছে – অধীত।
 যা জলে চরে – জলচর।
 যা স্থলে চরে – স্থলচর।
 যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর।
 যা বলা হয়নি – অনুক্ত।
 যা কখনো নষ্ট হয় না – অবিনশ্বর।
 যা মর্ম সর্প করে – মর্মসর্পী।
 যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য।
 যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ।
 যার বশ্চ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না – অজ্ঞাতকুসন্নিল।
 যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না – বর্ণচোরা।
 যা চিন্তা করা যায় না – অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য।
 যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু-বন্ধুর।
 যা সম্পন্ন করতে বয় ব্যয় হয়-ব্যয়বহুল।
 যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় – নাতিশীতোষ্ণ।
 যার বিশেষ খ্যাতি আছে – বিখ্যাত।
 যা আঘাত পায়নি – অনাহত।
 যা উদিত হচ্ছে – উদীয়মান।
 যার অন্য উপায় নেই – অনন্যেয়পায়।
 যার কোনো উপায় নেই – নিমুপায়।

যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে— বর্ধিষ্ঠু।
 যা পূর্বে শোনা যায়নি – অশুতপূর্ব।
 যে শুনেই মনে রাখতে পারে – শুতিধর।
 যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে – উদ্বাস্তু।
 যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় – স্বয়ংবরা।
 যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফল ধরে না – বনস্পতি।
 যে রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ে মরে – হাতড়ে।
 যে নারীর সন্তান বাঁচে না – মৃত্বৎসা।
 যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা।
 যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে – পরগাছা।
 যে পুরুষ বিয়ে করেছে – কৃতদার।
 যে মেরের বিয়ে হয়নি – অনূঢ়া।
 যে ক্রমাগত রোদন করছে – রোবুদ্যমান।
 যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না বা দেখে না– অপরিগামদশী।
 যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃত্যকারী।
 যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক (বা বিস্বাদ) নেই – অবিস্বাদিত।
 যে বন হিস্ত জঙ্গতে পরিপূর্ণ – শ্বাপদসংকূল।
 যিনি বকৃতা দানে পাটু – বাগী।
 যে সকল অত্যাচারই সহে যায় – সর্বসহা।
 যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে – বীরপ্রসূ।
 যে নারীর কোনো সন্তান হয় না – বৃক্ষ্যা।
 যে নারী জীবনে একমাত্র সন্তান প্রসব করেছে – কাকবৃক্ষ্যা।
 যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর – সুদর্শন।
 যে রব শুনে এসেছে – রবাহৃত।
 লাভ করার ইচ্ছা – শিঙ্গা।
 শুভ ক্ষণে জন্ম যাব – ক্ষণজন্মা।
 সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা – প্রভৃদ্যগমন।
 সকলের জন্য প্রযোজ্য – সর্বজনীন।
 হনন করার ইচ্ছা – জিঘাঃসা।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি উত্তরের সর্বোত্তমটিতে টিক (✓) টিহ দাও :

(১) ভাষার মূল উপকরণ কী ?

ক. ধ্বনি

গ. বাক্য

খ. শব্দ

ঘ. বর্ণ

(২) বাক্যে এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কী বলে ?

ক. আসন্তি

গ. আকাঙ্ক্ষা

খ. যোগ্যতা

ঘ. আস্তি

(৩) 'শব্দপোড়া' শব্দটিতে কী দোষ দেখা যায় ?

ক. গুরুচঙ্গলী

গ. আকাঙ্ক্ষার ভুল প্রয়োগ

খ. উপমা প্রয়োগে ভুল

ঘ. দুর্বোধ্যতা

(৪) কোনটি বাগধারার শব্দ পরিবর্তনজনিত ভুলের উদাহরণ ?

ক. ঘোড়ার ডিম

গ. গৌরীসেনের টাকা

খ. গোড়ায় গলদ

ঘ. ঘোটকের ডিম্ব

(৫) কোন বাক্যাংশটি গুরুচঙ্গলী দোষযুক্ত ?

ক. ঘোড়ার গাঢ়ি

গ. শবদাহ

খ. ঘোটকের গাঢ়ি

ঘ. মড়াপোড়া

(৬) উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

ক. উপকার-স্বীকারী

গ. কৃতয়

খ. অকৃতজ্ঞ

ঘ. কৃতজ্ঞ

(৭) নষ্ট হওয়া স্বত্ত্বাব যাই - এক কথায় কী হবে ?

ক. অবিনশ্বর

গ. নষ্টস্বত্ত্বাব

খ. নশ্বর

ঘ. বিনষ্ট

(৮) যা পূর্বে দেখা যায়নি - এক কথায় কী হবে ?

ক. অদ্যুষ্ট

গ. অপূর্ব

খ. দ্যুষ্টপূর্ব

ঘ. অদ্যুষ্টপূর্ব

- ২। বাক্য বলতে কী বোঝ? কোনো একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেখ।
- ৩। ‘শব্দের যোগ্যতা বিচার সীতিমত কঠিন কাজ, কেবল শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে অনেক বিষয় জড়িত থাকে।’ –এ উক্তিটির সমর্থনে তোমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ কর।
- ৪। কী কী উপায়ে বিধেয়ের সম্প্রসারণ হতে পারে? স্বরচিত বাক্যে উপায়সমূহের উদাহরণ দাও।
- ৫। সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণ দাও :
- (ক) মিশ্রবাক্য, (খ) আশ্রিত খন্ডবাক্য, (গ) বিশেষণ স্থানীয় খন্ডবাক্য, (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খন্ডবাক্য
- ৬। মৌগিক বাক্য ও সরল বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দাও।
- ৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলোকে নির্দেশিত বক্তব্যানুযুক্ত বাক্যে বৃপ্তান্ত কর
- (ক) সত্য কথা বল নি, সুতরাং বিপদে পড়েছ। (সরল বাক্য)
- (খ) অপরাধ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না। (মিশ্র বাক্য)
- (গ) যদিও তাঁর টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না। (মৌগিক বাক্য)
- (ঘ) যখন দুর্দিন আসে তখন দুঃখও আসে। (মৌগিক বাক্য)
- (ঙ) যে ভিক্ষা করতে এসেছে, তাকে ভিক্ষা দাও। (সরল বাক্য)
- (চ) তাকে দেখা মাত্রাই আমরা চলে গেলাম। (মিশ্র বাক্য)
- ৮। নিম্নলিখিত বাক্য তিনটি বিশেষণ কর :
- (ক) যাঁরা সত্যিকার কর্মী, তাঁরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হন।
- (খ) মানব-সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।
- (গ) পথিক বিবেচনা করলেন যে, পথচারী মহি঳াটি ঝাড়-বৃক্ষের মধ্যে বিপদে পড়েছেন।
- ৯। বাক্য সংক্ষেপণ বলতে কী বোঝ? কী কী উপায়ে বাক্যাংশের সংক্ষেপণ হতে পারে? উদাহরণসহ বিশদ আলোচনা কর।
- ১০। ঠিক উভয়টিতে ঠিক (✓) চিহ্ন দাও :
- (ক) আকাশে চরে বেড়ায় যে : আকাশচারী/চিল/খেচর।
- (খ) যে উপকারীর অপকার করে : অপকারক/কৃত্য/অকৃত্য।
- (গ) যা দমন করা যায় না : দুর্দম/দুর্দমনীয়/ অদম্য।
- (ঘ) যা দীপ্তি পাছে : সন্দীপন/দীপ্তিমান/দেদীপ্যমান।

- (ঙ) যা বলা হয়নি : অকথিত/অনুকৃত/অবাচ্য।
 (চ) যার কোনো উপায় নেই : নাচার/অনুপায়/নিরূপায়।
 (ছ) হনন করার ইচ্ছা : হননেছে/জিঘাংসা/জিজ্ঞাসা।

১১। এক শব্দে পরিণত কর এবং এই শব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :

- (ক) সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত।
 (খ) লাভ করার ইচ্ছা।
 (গ) যে ক্রমাগত কাঁদছে।
 (ঘ) যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই।
 (ঙ) যা বলার যোগ্য নয়।
 (চ) যার স্বাভাবিক বর্ণ ধরা যায় না।
 (ছ) যার আকার কুৎসিত।
 (জ) যে গাছ অন্য গাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচে।
 (ঝ) যা আঘাত পায়নি।
 (এঝ) যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে।

বিশেষ শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

- (ক) হাত আসা — কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
- (খ) হাত গুটান — হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)
- (গ) হাত করা — সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়তে আনা)
- (ঘ) হাত ছাড়া — টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচ্ছৃঙ্খল)
- (ঙ) হাত থাকা — এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)

দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে স্থানিক প্রয়োগও বলে।

‘হাত’ শব্দের স্থানিক প্রয়োগ

- (ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : এ টাকা কটিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।
- (খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন।
- (গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারস্থ) : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে।
- (ঘ) হাতে কলমে (স্বস্তে, কার্যকর ভাবে) : হাতে—কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

২. মাথা

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| (ক) মাথা ধরা — | রোগ বিশেষ | (খ) গীয়ের মাথা — | মোড়ুল। |
| (গ) মাথা ব্যথা — | আগ্রহ | (ঘ) মাথা খাওয়া — | শপথ করা। |
| (ঙ) মাথা দেওয়া — | দায়িত্ব গ্রহণ | (চ) মাথা ঘামানো — | ভাবনা করা। |
| (ছ) মাথাপিছু — | জনপ্রতি | | |

মাথা শব্দের স্থানিক প্রয়োগ

বাক্য গঠন

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| রাস্তার মাথায় | — মিলন স্থলে। | রাস্তার মাথায় তার সঙ্গে দেখা। |
| মাথা গরম করা | — রাগান্বিত হওয়া। | রাগের মাথায় কথাটা বলেছি। |
| রাগের মাথায় | — হঠাতে ক্রোধবশত। | মাথা গরম করে আর কী হবে? |
| মাথা হেঁট করা | — লজ্জায় মাথা নিচু করা। | মাথা হেঁট হবে কেন? |
| মাথা উঁচু করে চলা | — গর্বভরে চলা। | মাথা উঁচু করেই চলতে চাই। |

বিশেষ শব্দের প্রয়োগভেদে অর্থ পার্থক্য

১. হাত

- (ক) হাত আসা — কাজ করতে করতেই কাজে হাত আসবে। (দক্ষতা)
- (খ) হাত গুটান — হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন? (কার্যে বিরতি)
- (গ) হাত করা — সাহেবকে হাত করতে পারলেই কাজ হবে। (আয়তে আনা)
- (ঘ) হাত ছাড়া — টাকাগুলো হাত ছাড়া করো না। (হস্তচ্ছৃঙ্খল)
- (ঙ) হাত থাকা — এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। (প্রভাব)

দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা গঠনে বিভিন্ন পদের ব্যবহারকে স্থানিক প্রয়োগও বলে।

‘হাত’ শব্দের স্থানিক প্রয়োগ

- (ক) হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) : এ টাকা কটিই ছিল আমার হাতের পাঁচ।
- (খ) হাতে হাতে (অবিলম্বে) : হাতে হাতে এ কাজের ফল পাবেন।
- (গ) হাতে খড়ি (বিদ্যারস্থ) : এ মাসেই খোকার হাতে খড়ি হবে।
- (ঘ) হাতে কলমে (স্বস্তে, কার্যকর ভাবে) : হাতে—কলমে শিক্ষা কেতাবি শিক্ষার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

২. মাথা

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|------------|
| (ক) মাথা ধরা — | রোগ বিশেষ | (খ) গীয়ের মাথা — | মোড়ুল। |
| (গ) মাথা ব্যথা — | আগ্রহ | (ঘ) মাথা খাওয়া — | শপথ করা। |
| (ঙ) মাথা দেওয়া — | দায়িত্ব গ্রহণ | (চ) মাথা ঘামানো — | ভাবনা করা। |
| (ছ) মাথাপিছু — | জনপ্রতি | | |

মাথা শব্দের স্থানিক প্রয়োগ

বাক্য গঠন

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| রাস্তার মাথায় | — মিলন স্থলে। | রাস্তার মাথায় তার সঙ্গে দেখা। |
| মাথা গরম করা | — রাগান্বিত হওয়া। | রাগের মাথায় কথাটা বলেছি। |
| রাগের মাথায় | — হঠাতে ক্রোধবশত। | মাথা গরম করে আর কী হবে? |
| মাথা হেঁট করা | — লজ্জায় মাথা নিচু করা। | মাথা হেঁট হবে কেন? |
| মাথা উঁচু করে চলা | — গর্বভরে চলা। | মাথা উঁচু করেই চলতে চাই। |

বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

১. কাঁচা

কাঁচা আম	—	অপরিপন্থ আম।	কাঁচা খাতা	—	খসড়া।
কাঁচা কথা	—	গুরুত্বহীন কথা।	কাঁচা ইট	—	অদগ্ধ ইট।
কাঁচা ঘূম	—	অল্প ফ্রেঞ্চের ঘূম।	কাঁচা চুল	—	কালো চুল।
কাঁচা বয়স	—	অপরিণত বয়স।	কাঁচা সোনা	—	নির্খাদ সৰ্ব।

বাক্য গঠন : কাঁচা সোনার মতো তার গায়ের রং।

কাঁচা (আনাড়ি) লোকই কাঁচা (অনিপুণভাবে) কাজ করে থাকে।

বাক্যে ‘পাকা’ বিশেষণ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

পাকা কথা (শেষ সিদ্ধান্তসূচক)	চাই।
পাকা বন্দোবস্ত (স্থায়ী)	করে এসেছি।
এ হচ্ছে পাকা রৌধূনির (দক্ষ) রান্না।	
ইচড়ে পাকা (অকালে পরিপন্থ)	হেলেদের কথা অসহ্য।
একেবারে পাকা হাতের (দক্ষ লেখকের)	লেখা।
আমি কি তোমার পাকা ধানে মই দিয়েছি (হক নষ্ট করা) যে, আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ?	

‘করা’ ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

মনে করলাম এবার তীর্থে যাব। (সংকল্প করা)	
সে ফুটবল খেলায় নাম করেছে। (যশস্বী হওয়া)	
টাকা করে নাম কিনতে চাও? (খ্যাতি লাভের চেষ্টা করা)	
চাকরি পাওয়ার কোনো জো করে উঠতে পারিনি। (সুযোগ পাওয়া)	

‘ধরা’ ক্রিয়াপদের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ

কান ধরা	—	কর্ণ মর্দন করা।	মনে ধরা	—	পছন্দ হওয়া।
দোষ ধরা	—	অপরাধ গণনা করা।	আগুন ধরা	—	আগুন লাগা।
পথ ধরা	—	উপায় দেখা।	ম্যাও ধরা	—	দায়িত্ব নেওয়া।
হাতে-পায়ে ধরা	—	অনুরোধ করা।	গৌ ধরা	—	একঙ্গীয়ে করা।
গলা ধরা	—	কষ্ট বৃন্দ হওয়া। (কথা কথ হয়ে যাওয়া)			

দ্রষ্টব্য : শব্দাত্মক ও পদাত্মক বাঙ্গালীর অর্থের পার্থক্য ঘটে। যেমন-

{ গো সওয়া	-	অভ্যস্ত হওয়া	{ গো লাগা	-	মনোযোগ দেওয়া।
গায়ে সওয়া	-	দেহে সহ্য হওয়া।	গায়ে লাগা	-	অনুভূত হওয়া।
{ পায়ে পড়া	-	ক্ষমা প্রার্থনা করা।	{ হাত আসা	-	অভ্যস্থ হওয়া।
পায়ে পড়া	-	খোশামুদ্দে।	হাতে আসা	-	আয়স্ত হওয়া।
{ রোগ ধরা	-	রোগ নির্ণয়।			
রোগ ধরা	-	রোগাক্রান্ত হওয়া।			

বাঙ্গালীর ব্যবহার

অকাল কুশাঙ্ক (অপদার্থ, অকেজে)	-	অকাল কুশাঙ্ক ছেলেটার ওপর এ কাজের দায়িত্ব দিও না।
অঙ্কা পাওয়া (মারা যাওয়া)	-	অনেকে রোগভোগের পর শয়তানটা শেষ পর্যন্ত অঙ্কা পেয়েছে।
অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান)	-	ডাক্তান্তি মামলার আসামি হওয়ায় করিম গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
অগাধ জলের মাছ (সূচত্ব ব্যক্তি)	-	সরল মনে হলেও শোকটা আসলে অগাধ জলের মাছ।
অর্ধচন্দ্ৰ (গলা ধাক্কা)	-	শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্ৰ দিয়ে বিদায় করে দাও।
অল্পের ষষ্ঠি } অল্পের নড়ি } (একমাত্র অবলম্বন)	(একমাত্র অবলম্বন)	- বিধবার একমাত্র সন্তান তার অল্পের ষষ্ঠি/অল্পের নড়ি।
অগ্নিশৰ্মা (নিরতিশয় ক্রুদ্ধ)	-	তিনি ক্রোধে অগ্নিশৰ্মা হলেন।
অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা)	-	জাতিকে এ অগ্নিপরীক্ষায় উন্নীৰ্ণ হতেই হবে, তব পেলে চলবে না।
অস্থকারে তিল মারা (আস্দাজে কাজ করা)	-	অস্থকারে তিল মেরে সব কাজ ঠিকভাবে করা যায় না।
অকূল পাথার (ভীষণ বিপদ)	-	অকূল পাথারে আল্লাহই একমাত্র সহায়।
অনুরোধে টেকি গেলা (অনুরোধে দুরুহ কাজ সম্পন্ন করতে সম্ভৱ জ্ঞাপন)	-	অনুরোধে টেকি গেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি এ কাজ করতে পারব না।
অদৃষ্টের পরিহাস (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা)	-	অদৃষ্টের পরিহাসে রাজাও ডিখারি হয়।
অভিবিদ্যা ভয়করী (সামান্য বিদ্যার অহংকার)	-	কিছুই জানে না, আবার দেমাক কত – অভিবিদ্যা ভয়করী আৱ কি।
অনধিকার চৰ্চা (সীমার বাইরে পদক্ষেপ)	-	কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি অনধিকার চৰ্চা কৰি না।
অরণ্যে রোদন (নিষ্কল আবেদন)	-	কৃপণের নিকট চাঁদা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র।
অহিনকূল সম্বন্ধ (ভীষণ শত্রুতা)	-	দুভাইয়ের মধ্যে অহিনকূল সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে।

- অন্ধকার দেখা (দিশেহারা হয়ে পড়া)**
- এ বিপদে আমি যে সব অন্ধকার দেখছি।
- অমাবস্যার টাঁদ (দুর্গত বস্তু)**
- তোমার দেখা পাওয়াই ভার, অমাবস্যার টাঁদ হয়ে পড়েছ।
- আকাশ কুসুম (অসম্ভব করন)**
- মূর্খরাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।
- আকাশ পাতাল (প্রচুর ব্যবধান)**
- ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।
- আকেল সেলামি (নির্বৃত্তিতার দণ্ড)**
- বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে চড়ে আকেল সেলামি দিতে হলো।
- আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাতে বড়লোক)**
- যুদ্ধের বাজারে দেদার টাকা পয়সা কামাই করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
- আকাশের টাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্গত বস্তু প্রাপ্তি)**
- হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাপ-মা যেন আকাশের টাঁদ হাতে পেলেন।
- আদায় কাঁচকলায় (শত্রুতা)**
- তার সঙ্গে আমার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক, সে আমার দুশ্মন।
- আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা)**
- কাজটি শেষ করার জন্য সে আদা জল খেয়ে লেগেছে।
- আকেল গুড়ুম (হতবৃত্তি, স্তন্ত্বিত)**
- ইচ্ছে পাকা ছেলেটার কথা শুনে আমার আকেল গুড়ুম।
- আমড়া কাঠের টেকি (অপদার্থ)**
- ও হচ্ছে ধনীর দুলাল, আমড়া কাঠের টেকি, ওকে দিয়ে কিছুই হবে না।
- আকাশ ভেঙ্গে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া)**
- ব্যাক ফেল করেছে শুনে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ু।
- আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, ধিধা করা)**
- আমতা আমতা না করে স্পষ্ট কথায় দোষ স্থীকার কর।
- আটকপালে (হতভাগ্য)**
- ছেলেটা এতিম, আটকপালে।
- আঠার মাসে বছর (দীর্ঘস্থূত্রতা)**
- তোমার তো আঠার মাসে বছর, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে পার না।
- আলালের ঘরের দুলাল (ঘঠি আদরে বড় লোকের নষ্ট পুত্র)**
- বড়লোকের ঘরে দু-একজন আলালের ঘরের দুলাল মিলবেই।
- আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসন করা)**
- চাঁচাকারারা ধনী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।
- আয়াচে গঞ্জ (আজগুবি কেছা)**
- টাঁদে যাওয়ার কথাটা একসময় ছিল আয়াচে গঞ্জ।
- ইন্দুর কপালে (নিতান্ত মন্দ ভাগ্য)**
- আমার মতো ইন্দুর কপালে লোকের দাম এক কানাকড়িও না।
- ইচ্ছে পাকা (অকালপক্ষ)**
- অতবড় মানুষটার সাথে তর্ক করছে, কী ইচ্ছে পাকা ছেলে বাবা।
- ইতর বিশেষ (পর্যবেক্ষণ)**
- সৃষ্টিকর্তার নিকট সব মানুষই সমান, ইতর বিশেষ নেই।
- উন্নম মধ্যম (প্রহার, পিটুনি)**
- গৃহস্থ চোরটাকে উন্নম মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দিল।
- উড়নচক্ষী (অমিতব্যযী)**
- এমন উড়নচক্ষী হলে দুদিনে টাকাকড়ি সব শেষ হবে।
- উন্নয় সংকট**
- ‘শাখের করাত’ দেখ।

উলুবনে মুক্ত ছড়ানো (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান)	— তাকে সদৃশদেশ দান, উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতোই নিষ্কল ।
উড়োচিঠি (বেনামি পত্র)	— ডাকাতৰা জমিদার বাড়িতে উড়োচিঠি দিয়ে ডাকাতি করেছিল ।
উড়ে এসে জুড়ে বসা (অনধিকারীর অধিকার)	— লোকটাৰ মাতব্বৰি দেখলে গা জুলে যায় । ও এখনকাৰ লোক নয়, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ।
এককূৰে মাথা মুড়ানো (একই স্বত্বাবেৰ)	— সকলেই এককূৰে মাথা মুড়িয়েছে দেখছি, পৱীক্ষায় সবাই ফেল করেছে ।
একচোখা (পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট)	— একচোখা শোকেৰ কাছে সুবিচার পাওয়া যায় না ।
এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবাৰই আসে না)	— আমাকে ফাঁকি দিলে, মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না ।
এলোপাতাড়ি (বিশ্বজ্ঞলা)	— এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে শত্রুদলেৰ ক্ষতি কৰতে পাৱে না ।
এসপার ওসপার (মীমাংসা)	— চুপ কৰে থেকে লাভ কী, এসপার ওসপার একটা কৰে ফেল ।
একাদশে বৃহস্পতি (সৌভাগ্যেৰ বিষয়)	— এখন তাৰ একাদশে বৃহস্পতি, ধূলোমুঠোও সোনামুঠো হচ্ছে ।
এলাহি কাঙ (বিৱাট আয়োজন)	— বড় বাড়িতে বিয়ে, সেতো এক এলাহি কাঙ হবে ।
কল্পুৱ বলদ (একটানা খাটুনি)	— কল্পুৱ বলদেৰ মতো সৎসারেৰ চাকায় ঘুৱে মৱাহি ।
কথাৰ কথা (গুৱাত্বহীন কথা)	— কাৰও মনে আঘাত দেওয়াৰ জন্য একথা বলিনি, এটা একটা কথাৰ কথা ।
কপাল ফেৱা (সৌভাগ্য লাভ)	— লটারিৰ টিকেট কিনে সে তাৰ কপাল ফেৱাতে চায় ।
কত ধানে কত চাল (হিসাব কৰে চলা)	— নিজেকে তো আৱ উপাৰ্জন কৰতে হয় না, কত ধানে কত চাল হয় বুবাবে কেমন কৰে ।
কড়ায় গড়ায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি)	— সে কড়ায় গড়ায় তাৰ পাওনা বুৰো নিল ।
কান খাড়া কৰা (মনোযোগী হওয়া)	— আমি কী বলি তা শোনাৰ জন্য সে কান খাড়া কৰে রাইল ।
কাঁচা পয়সা (নগদ উপাৰ্জন)	— কাঁচা পয়সা পাও কি না, তাই খৰচ কৰতে বাধে না ।
কৈঠালেৰ আমসন্তু (অসম্ভব বস্তু)	— ঐ হাড়কিপ্টে কৰবে দান, কৈঠালেৰ আমসন্তু আৱ কি ।
কৃপমঞ্চুক (ঘৰকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পদ)	— তুমি তো কৃপমঞ্চুক, ‘ঘৰে হৈতে আঞ্চিনা বিদেশ’ ।
কেতাদুৱস্ত (পরিপাটি)	— কথাৰ্ত্তা, পোশাকপৰিচ্ছদে কেতাদুৱস্ত হলেও সে অন্তঃসারশূন্য ।

- কাঠের পুতুল (নির্জীব, অসম) – রাজা কাঠের পুতুলের মতো সিংহাসনে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীই দেশ শাসন করতেন।
- কথায় চিঢ়ে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) – কাজটি করতে হলে নগদ কিছু তালো, শুধু কথায় চিঢ়ে ভেজে না।
- কান পাতলা (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ) – কান পাতলা লোকের অধীনে কাজ করা কঠিন।
- কাছা টিলা (অসাবধান) – কাছা টিলা লোককে কোনো বড় দায়িত্ব দিতে নেই।
- কূলকাঠের আগুন (তীব্র ঝঁপ্লা) – তোমার কথার খোচায় আমার সারা দেহে কূলকাঠের আগুন ঝঁপ্লছে।
- কেঁচো খুড়তে সাপ (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি) – ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোবে।
- কেউকেটা (সামান্য) – ও একেবারে কেউকেটা লোক নয়, তার সঙ্গে লাগতে যেও না।
- কেঁচে গড়ুস (পুনরায় আবর্ত্তন) – সবটাই ভুল হয়েছে, আবার কেঁচে গড়ুস করতে হবে দেখছি।
- কৈ মাছের প্রাণ (যা সহজে মরে না) – লোকটা এত অত্যাচারেও মরেনি, কৈ মাছের প্রাণ দেখছি।
- খয়ের খী (চাঁচুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খী, তিনি যা বলেন তুমি তাই বল।
- খন্দ প্রলয় (ভূমুল কাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার) – সামান্য ঘটনা থেকে এমন খন্দ প্রলয় হবে তাবিনি।
- গড়তলিকা প্রবাহ (অল্প অনুকরণ) – গড়তলিকা প্রবাহে যারা গা ভাসিয়ে দেয়, আমি তাদের দলে নেই।
- গদাই লস্করি চাল (অতি ধীর গতি, আলসেমি) – এমন গদাই লস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে।
- গণেশ উটানো (উঠে যাওয়া, ফেল মারা) – কর্মচারীদের চুরির ফলে দোকানটা গণেশ উন্টিয়েছে।
- গলগ্রহ (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা) – কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী কষ্ট, তা আমার বিশ্বাস জানা আছে।
- গৌয়ার গোকিদ (নির্বোধ অথচ হঠকারী) – সে যেমন জেনি তেমনি রাগী, তার মতো গৌয়ার গোকিদকে নিয়ে পথ চলা যায় না।
- গোল্লায় যাওয়া (নষ্ট হওয়া, অধঃপাতে যাওয়া) – কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেছে।
- গোবর গণেশ (মূর্খ) – না জানে লেখাপড়া, না আছে বুদ্ধি – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ।
- গাছে ভুলে মই কাঢ়া (আশা দিয়ে আশ্বাস ভজা করা) – আমাকে এগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছ, একেই বলে গাছে ভুলে মই কাঢ়া।
- গায়ে ঝুঁ দিয়ে বেড়ানো (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা) – গায়ে ঝুঁ দিয়ে বেড়ালে সংসার চলবে কেমন করে?
- গৌফ খেজুরে (নিতান্ত অলস) – গৌফ খেজুরে লোক দিয়ে কোনো কাজই হয় না।

- গোড়ায় গলদ (শুরুতে ভুল) – অজ্ঞ মিলবে কেমন করে? গোড়াতেই তো গলদ।
- গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) – আশা করেছিলাম মামার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।
- ঘর ভাঙ্গনো (সংসার বিনষ্ট করা) – তোমার মতো ঘর ভাঙ্গনো বৌ আর দেখিনি।
- ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধি) – টাকার লোভে ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিও না।
- ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) – মাসে তিন হাজার টাকা মাইনে পেয়ে গাড়ি কিনতে চাও, একেই
বলে গরিবের ঘোড়ারোগ।
- ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা) – অফিসের বড় সাহেবকে না জানিয়ে ছোট সাহেবকে
বলা, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো।
- চাঁদের হাট (আনন্দের প্রাচুর্য) – ধনেজনে চৌধুরী সাহেবের সংসার যেন চাঁদের হাট।
- চিনির বলদ (ভারবাহী তবে ফল লাভের অঙ্গীদার নয়) – সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে মরাছি, কিছুই
পাই না।
- চোখের বালি (চক্ষুশূল) – বখাটে ছেলেটা সকলের চোখের বালি।
- চোখের পর্দা (লজ্জা) – তোমার দেখছি চোখের পর্দা নেই; কেমন করে এ কাজ করলে?
- ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – নিলামের মাল, তাই ছকড়া নকড়ায় বিক্রি হয়ে গেল।
- ছাপোষা (অত্যন্ত গরিব) – আমার মতো ছাপোষা লোকের কোনো শখ থাকতে নেই।
- ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা) – পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করল না?
- ছেলের হাতের মোয়া (সহজলভ্য বস্তু) – রত্নহার ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।
- জগাধিচূড়ি পাকানো (গোলমাল বাধানো) – ব্যাপারটা জগাধিচূড়ি পাকিয়ে সে সরে পড়ু।
- জিলাপির পীঢ়াচ (কুটিলতা) – ভালোমানুষ মনে হলেও তার তেতরে রয়েছে জিলাপির পীঢ়া।
- বোপ বুঁকে কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা) – বোপ বুঁকে কোপ মারতে পেরেছে বলেই সে কৃতকার্য হয়েছে।
- টনক নড়া (চেতন্যেদায় হওয়া/বুঁকে উঠা) – ব্যবসায় ক্ষতি হতেই তার টনক নড়ু।
- ঠাট্ট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা) – অভাবে পড়লেও তিনি ঠাট্ট বজায় রেখে চলেছেন।
- ঠোঁটকাটা (বেহায়া) – তোমার মতো ঠোঁট কাটা ছেলে আর দেখিনি, মুখের উপর এ
কথা বললে।
- ডুমুরের ঝুল – ‘অমাবস্যার চাঁদ’ দেখ।

- ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন রাখার চেষ্টা) – ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে লাভ কী, ব্যাপারটা খুলে বল।
- ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – ‘খয়ের খা’ দেখ।
- তালকানা (বেতাল হওয়া) – ঢোকে চশমা, আর চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আছ্ছা তালকানা লোক।
- তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী বস্তু) – ঝুনকো বক্ষুত্ত স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।
- তামার বিষ (অর্ধের কু প্রভাব) – হঠাতে বড় লোক কি না, তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছ।
- থ বনে যাওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) – তোমার কাউন্ড দেখে আমি তো থ বনে গেলাম।
- দা–কুমড়া – ‘অহিনকুল’ দ্রষ্টব্য।
- দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক) – সাহেবের সাথে তোমার যখন এত দহরম মহরম, তখন কাজটা করিয়ে দাও তাই।
- দুমুখো সাপ (দুজনকে দূরকম কথা বলে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া) – লোকটা একটা দুমুখো সাপ; আমাদের দুজনকে দূরকম কথা বলে দুজনের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করেছে।
- দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – সুদিনে যে দুধের মাছি, দুর্দিনে তার সাক্ষাত মেলে না।
- ধরাকে সরা জ্ঞান করা (সকলকে তুচ্ছ ভাবা) – বড়লোক হয়েছ বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করো না।
- ধরি মাছ না ঝুই পানি (কৌশলে কার্যোন্ধার) – এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা হবে ধরি মাছ না ঝুই পানি।
- ননীর পুতুল (শ্রমবিমুখ)
- নয়চ্ছয় (অপচয়)
- নেই আঁকড়া (একঙ্গীয়ে)
- পটল তোলা (অক্তা পাওয়া)
- পালের গোদা (দলগতি)
- পুকুরচুরি (বড় রকমের চুরি)
- ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাঞ্জি)
- ফোড়ন দেওয়া (চিপনি কাটা)
- বক ধার্মিক/বিড়াল তপস্বী (ভক্ত সাধু)
- বর্ণচোরা (কপট ব্যক্তি)
- বালির বাধ (অস্থায়ী বস্তু)
- বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘূষ গ্রহণ)
- ছেলেটি একেবারে ননীর পুতুল, একটু পরিশ্রমেই ইঁপিয়ে ওঠে।
 - সে বাড়ি বিক্রির টাকাগুলো নয়চ্ছয় করে ফেলল।
 - এমন নেই আঁকড়া ছেলে আর তো দেখিনি বাবা যা বলবে তাই!
 - শয়তানটা পটল তুলেছে, এবার গাঁয়ের লোকের হাড় জুড়াবে।
 - পুলিশ পালের গোদাকে ধরতে পারেনি, সাধারণ মানুষের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে।
 - কিছু কর্মচারী পুকুরচুরি করে প্রতিষ্ঠানে শাস্তিতি জ্বালিয়েছে।
 - সবখানে ফপর দালালি চলে না, আয়গা বুঁকে কাজ করতে হয়।
 - কথায় কথায় ফোড়ন দিলে কাজ করা দায় হয়ে উঠবে।
 - মুখে ধর্মের কথা বললেও লোকটা আসলে বক ধার্মিক।
 - লোকটা বর্ণচোরা, তার আসল রূপ ধরা যায় না।
 - ‘বড়ুর পি঱িতি যেন বালির বাধ।’
 - এ অফিসের কিছু কর্মচারী বাঁ হাতের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।

- বাঘের দুধ/চোখ (দুঃসাধ্য বস্তু) — টাকায় বাঘের দুধ মেলে।
- বিসমিল্লায় গলদ
- বুন্দির টেকি (নিনেট মূর্খ)
- ব্যাঙের আধুলি (সামান্য সম্পদ)
- ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ঘটনা)
- ভরাতুবি (সর্বনাশ)
- ভূতের বেগোর (অথবা শ্রম)
- ভিজে বিড়াল (কপটাচারী)
- ভূষভির কাক (দীর্ঘজীবী)
- মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ)
- মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন)
- মন না মতি (অস্থির মানব মন)
- মাছের মায়ের পুত্রশোক (কপট বেদনাবোধ)
- মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ)
- যক্ষের ধন (কৃপণের কড়ি)
- রাঘব বোয়াল (সর্বাণী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি)
- রাবণের চিতা (চির অশান্তি)
- রাশভারি (গাঢ়ীর প্রকৃতির)
- রুই-কাতলা (পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি)
- লেফাফা দুরস্ত (বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেন যিনি) — এই লেফাফা দুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দকশূন্য?
- শীঁখের করাত (উভয় সংকট)
- ‘গোড়ায় গলদ’ দ্রষ্টব্য।
- ‘ইঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুন্দির টেকি।’
- এই সামান্য কটা টাকা ব্যাঙের আধুলি আর কি।
- জেল খাটা আসামিকে দেখাচ্ছ জেলের ভয়— ব্যাঙের আবার সর্দি!
- আমি কারো ভরাতুবি করিনি যে সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছে।
- জীবনভর ভূতের বেগোর খেটে গেলাম, লাভ কিছুই হলো না।
- সমাজে ভিজে বেড়ালদের চেনা সহজ নয়।
- স্ত্রী, পুরু, কন্যা— সবার মৃত্যুর পরও বৃদ্ধ ভূষভির কাকের মতো বেঁচে আছে।
- এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে?
- যেমন বর, তেমনি কলে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।
- মানুষের মন তো বদলেই থাকে; কথায় বলে— ‘মন না মতি’।
- নিজের পুত্রের মৃত্যুতে একফৌটা চোখের পানি পড়ল না— অথচ অন্যের জন্য কাঁদছে, এ যে মাছের মায়ের পুত্রশোক।
- শুনতে মধুর হলোও তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো অন্তরকে বিন্দু করে।
- যক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাকড়ি আগলে আছে, এক পয়সাও দান করে না।
- সমাজপতিরা রাঘব বোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।
- ‘রাবণের চিতাসম ছবিছে হৃদয় মম।’
- আমাদের বড় সাহেব খুব রাশভারি লোক, তাঁর সাথে বুবেসুবে কথা বলো।
- দেশের সুযোগ সুবিধা রুই-কাতলারাই বেশি ভোগ করে।

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| শাপে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাত) | — আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা—একেই
বলে শাপে বর। |
| সোনায় সোহাগা | — ‘মণি কাঢ়ল যোগ’ দ্রষ্টব্য। |
| সাক্ষী গোপাল (নিষ্ঠিক্ষয় দর্শক) | — তোমাদের এই পারিবারিক কলহে আমার সাক্ষী গোপাল হওয়া
ছাড়া উপায় নেই। |
| হাটে ইঁড়ি ভাঙ্গা (গোপন কথা প্রকাশ করা) | — আমাকে থাটিও না বলছি, তা হলে আমি হাটে ইঁড়ি ভেঙে দেব। |
| হাতটান (চুরির অভ্যাস) | — দামি জিনিসগুলি সাবধানে রেখ, ছেলেটার হাতটান অভ্যাস আছে। |
| হাড় হাতাতে (হতভাগ্য) | — সব হারিয়ে ছেলেটি একেবারে হাড় হাতাতে এর কিছু হবে না। |
| হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা) | — ব্যবসায় অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু হালে পানি পেলাম না। |

সমার্থক শব্দ

যেসব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে, তাদের সমার্থক বা একার্থক শব্দ বলে। রচনার মাধ্যম সৃষ্টির জন্য অনেক সময় একটা অর্থকেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা প্রয়োজন হয়। কবিতায় এর প্রয়োগ বেশি। এখানে কতগুলো সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হলো :

অম্বকার	— আঁধার, তমসা, তিমির।	পৃথিবী	— অবনী, ধরা, ধরণী, ধরিত্বী, বসুন্ধরা, ভূ, মেদিনী।
আকাশ	— অম্বর, গগন, নতৎ, ব্যোম।	পর্বত	— অচল, অদ্রি, গিরি, পাহাড়, ভূধর, শৈল।
আগুন	— অগ্নি, অনল, পাবক, বহু, হৃতাশন।	পিতা	— আবো, জনক, বাবা।
ঈশ্বর	— আল্লাহ, খোদা, জগদীশ্বর, ধাতা, বিধাতা, ভগবান, সূর্যকর্তা, মৃষ্টা।	পুত্র	— ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত।
কান	— কর্ণ, শ্রবণ।	মাতা	— গর্ভধারিণী, প্রসূতি, মা, জননী।
চুল	— অলক, কুস্তল, কেশ, চিকুর।	কোকিল	— পরভৃত, পিক।
চোখ	— অক্ষি, চক্ষু, নয়ন, নেত্র, লোচন।	গরু	— গো, গাড়ী, ধেনু।
জল	— অম্বু, জীবন, নীর, পানি, সঙ্গী।	চাঁদ	— চন্দ্ৰ, নিশাকর, বিশু, শশধর, শশাঙ্ক, সুধাশু, হিমাশু।
তীর	— কূল, তট, সৈকত।	রাজা	— নৃপতি, নরপতি, ভূপতি।
দিন	— দিবস, দিবা।	সূর্য	— আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্ত্ত্ব, রবি, সবিতা।
দেবতা	— অমর, দেব, সূর।	বর্গ	— দেবলোক, দৃঃলোক, বেহেশত।
দেহ	— গাত্র, গা, তনু, শরীর।		
ধন	— অর্ধ, বিন্দু, বিভব, সম্মদ।		

নদী	- তটিনী, স্নোতস্বতী, স্নোতস্বিনী।	সাপ	- অহি, আশীবিষ, নাগ, ফণী, ভুজঙ্গা,
নারী	- অবলা, কামিনী, মহিলা, স্বীলোক, রমণী।	সর্প।	
মৃত্যু	- ইন্দেকাল, ইহলীলা-সংবরণ, ইহলোক ত্যাগ, চিরবিদায়, জান্মাতবাসী হওয়া। দেহত্যাগ, পঞ্চত্প্রাপ্তি, পরলোকগমন, লোকান্তরগমন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ, স্মর্ণাত।	সমুদ্র	- অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পারাবার, বাসিধি, রত্নাকর, সাগর, সিন্ধু।
		হাতি	- কর, বাহু, ভুজ, হস্ত।

বাক্যে প্রয়োগ

- * ‘কী যাতনা বিষে, বুবিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দথশেনি যারে।’
- * ‘গগনে উদিল রবি লোহিত বরং।’
- * দিবসে আলস্যে নিদ্রা অতি দূষণীয়।
- * অবলা সবলা আজ নহে তো দুর্বলা।
- * প্রচন্ড মার্জন তাপে গলিছে তুষারপিণ্ড।

বিভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দের নানা প্রকার অর্থ থাকলে তাকে বিভিন্নার্থক শব্দ বলে। উদাহরণ-

- ১। অঙ্গ— (১) সংখ্যা — টাকার অঙ্গ কত হবে?
- (২) আঁক — অঙ্গকটা কম।
- (৩) চিহ্ন — পদাঙ্গক (পদচিহ্ন) অনসুরণ কর।
- (৪) কেল — শিশুকল্যাণিকে অঙ্গে নিয়ে জননী আদর করছেন।
- (৫) নাটকের প্রধান পরিচেদ — এই নাটকের ষষ্ঠ অঙ্গের প্রথম দৃশ্যটি খুব করুণ।
- ২। অচল— (১) গতিহীন — শরীর অচল হয়ে পড়েছে।
- (২) একনিষ্ঠ — ইশ্বরে অচল ভক্তি হোক।
- (৩) মেকি, অব্যবহার্য — এ অচল টাকা কে নেবে?
- (৪) অপ্রচলিত — হাজার টাকার এই নোটটি অচল।
- (৫) নির্বাহ করা কঠিন — অর্থের অভাবে সহসার অচল হয়ে গেছে।
- (৬) পর্যবেক্ষণ — ‘উচল বলিয়া অচলে বাড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।’

- ৩। অন্তর— (১) মন
 (২) অন্য
 (৩) ব্যবধান, পার্থক্য
 (৪) আত্মীয়
- ‘অন্তর মম বিকশিত কর।’
 — তিনি দেশান্তরে গিয়েছেন।
 — এখান থেকে একঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে।
 — ‘অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে।’
- ৪। কূট— (১) কুটিল
 (২) জাটিল
 (৩) কপট, জাল
 (৪) পর্বতশৃঙ্গ
- তার কূট বুন্ধির সঙ্গে পারবে কেন?
 — এটা কূট প্রশ্ন, উন্তর দেওয়া কঠিন।
 — কূট সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে সে এসে ধরা পড়েছে।
 — পর্বতকূট আরোহণ করা দুর্ভু।
- ৫। গুণ— (১) ধর্ম
 (২) ক্রিয়া
 (৩) উৎকর্ষ
 (৪) উপকরণ
 (৫) দড়ি
- মন্দব্যের গুণ জানতে হয়।
 — শুধুধে গুণ করেছে।
 — তুমি তো নিজের গুণকীর্তন করছ।
 — শিক্ষার গুণ অনেক।
 — মাঝিরা নৌকার গুণ টেনে এসেছে।
- ৬। ধর্ম— (১) সংকাজ, পুণ্যকাজ
 (২) সুনীতি
 (৩) সম্প্রদায় বিশেষের উপাসনাপদ্ধতি ইত্যাদি— প্রত্যেক ধর্মই মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে।
 (৪) স্বভাব
- অহিংসা পরাম ধর্ম।
 — এটা ধর্মসংগত কাজ।
 — মানুষ ও পশুর ধর্ম পৃথক।
- ৭। পক্ষ— (১) দল
 (২) মাসার্ধ
 (৩) টাদের ক্ষয় বা বৃদ্ধি কাল
 (৪) পাখির ডানা
 (৫) বিয়ে সংখ্যা
- তুমি কোন পক্ষে?
 — দুই পক্ষ নিয়ে এক মাস।
 — এখন শুরুপক্ষ।
 — যাদের পক্ষ আছে তাদের পাখি বলে।
 — ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

শব্দের পূর্বে সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দূর, ন, না, নি, নির প্রায়ই না-বাচক বা নিয়েধবোধক অর্থ প্রকাশ করে। তাই শব্দের বিরোধার্থক শব্দ তৈরিতে এই উপসর্গগুলো কিছুটা সাহায্য করে। তবে গঠনগত দিক থেকে শব্দের বিপরীতার্থক শব্দগুলো প্রায়ই মূল শব্দের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। উদাহরণ :

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক
কাজ	অকাজ	সম্ভয়	ব্যয়
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত, অনুন্নত
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতন্ত	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
কেজো	অকেজো	যশ	অপযশ
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুষ্কৃত
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ
জানী	অজ্ঞান	সুলভ	দুর্গভ
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দুঃশীল
নথুর	অবিলথুর	আসল	নকল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক
শাস্তি	অশাস্তি	লায়েক	নালায়েক
শিষ্ট	অশিষ্ট	শুঁত	নিশুঁত
শুভ	অশুভ	ঘোজ	নিঘোজ
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা	বিরত	নিরত
অন্ত	অনন্ত	অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গাম	আশা	নিয়াশা
অতিবৃক্ষি	অনাবৃক্ষি	অধমর্ণ	উন্নমর্ণ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	অর্থ	অনর্থ
আচার	অনাচার	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র
আতীয়	অনাতীয়	প্রবল	দুর্বল
আদর	অনাদর	রোগ	নীরোগ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	সচেষ্ট	নিশেষ্ট
আবিল	অনাবিল	সদয়	নির্দয়
আস্থা	অনাস্থা	সম্বল	নিঃসম্বল
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	সরস	নীরস
ইন্ট	অনিন্ট	সাকার	নিরাকার
উপস্থিত	অনুপস্থিত		

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক
আকর্ষণ	বিরক্রম	অজ্ঞ	বিজ্ঞ
পথ	বিপথ	অনুরক্ত	বিরক্ত
বাদী	বিবাদী	অনুরাগ	বিরাগ
যুক্ত	বিযুক্ত	ডোবা	ভাসা
সফল	বিফল	তিরস্কার	পূরস্কার
সুশ্রী	বিশ্রী	উচ্চ	নিচ
চৃতি	বিচৃতি	উথান	পতন
ঠিক	বেঠিক	উদয়	অস্ত
তাল	বেতাল	উন্নতি	অবনতি
হাল	বেহাল	উর্ধ্ব	অধ
ইঁশ	বেইঁশ	এলোমেলো	গোছানো
অগ্র	পশ্চাত	ওঠা	নামা
অচল	সচল	ওস্তাদ	সাগরেদ
অনুকূল	প্রতিকূল	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
অন্তর	বাহির	কোমল	কর্কশ
অধম	উন্নত	ক্রয়	বিক্রয়
উৎসাহ	নিরুৎসাহ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
অল্প	অধিক	খাটি	ভেজাল
দোষী	নির্দোষ	খাতক	মহাজন
আকুল	প্রসারণ	খুচরা	পাইকারি
আগে	পিছে	খেলা	বক্ষ
আপদ	নিরাপদ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আপন	পর	গুরু	লঘু
আদান	প্রদান	গৃহী	সন্ম্যাসী
আদি	অন্ত	গ্রহণ	বর্জন
আবর্তিব	তিরোভাব	ঘাটতি	বাঢ়তি
আমদানি	রপ্তানি	ঘাত	প্রতিঘাত
আয়	ব্যয়	চোর	সাধু
		চোখা	তৌতা
		ছাত্র	অছাত্র
		জন্ম	মৃত্যু
		জয়	পরাজয়
		জড়	চেতন
		ভোঁতা	ধারালো

শব্দ	বিপরীতার্থক	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আসল	নকল	উপকার	অপকার
ইতর	তদ্র	মান	অগমান
ইদানীং	তদানীং	ইহলোক	পরলোক
লয়	গুরু	ইহা	উহা
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	মিলন	বিরহ
তেজী	নিম্নতেজ		
দাতা	গ্রহীতা	শত্ৰু	মিত্র
দিন	রাত	শৈত্র	বিলম্ব
দীর্ঘ	ক্রম	সত্য	মিথ্যা
দুষ্ট	শিষ্ট	সমষ্টি	ব্যাপ্তি
দূর	নিকট	সার্থক	ব্যৰ্থ
দেওয়া	নেওয়া	সুন্দর	কুসুমিত
দেনা	পাওনা	সৃষ্টি	ধৰন
ধনী	নির্ধন, গরিব	স্থির	চঞ্চল
নতুন	পুরাতন	স্মৃতি	বিন্মৃতি
নরম	শক্ত	স্বকীয়	পরাকীয়
নিন্দিত	জাহাত	স্বতন্ত্র	পরাতন্ত্র
নিষ্পা	প্রশংসা	স্বৰ্গ	নরক
বৰ্ধন	মুক্তি	স্বাধীন	পরাধীন
বৰ্দু	শত্ৰু	হৱণ	প্ৰণ
বৱ	বৌ	হাৰ	জিত
বৰ্ধমান	ক্ষীয়মান	হাঙ্কা	ভাৱি
বড়	ছোট	হাসি	কাহা
বাচল	স্বজ্ঞায়ী	হ্রাস	বৃদ্ধি
জীবন	মৱণ	জোয়াৱ	ভাটা
বেহেশত্	দোজখ	মুখ্য	গৌণ
বোকা	চালাক	টাটকা	বাসি
ব্যৰ্থ	সার্থক	মৃদু	প্ৰবল
তয়	সাহস	ঠকা	জেতা
ভিতৰ	বাহিৱ	রাজা	প্ৰজা
ভীতু	সাহসী	ঠাণ্ডা	গৱম
ভীৱু	নিৰ্ভীক	বুগ্ধ	সুস্থ
ভৃত	ভবিষ্যৎ	জাগৱিত	নিন্দিত
উন্নৱ	দক্ষিণ	পূৰ্ব	পশ্চিম

বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ

- ◆ যুদ্ধে জয়—পরাজয় নির্ধারিত হবে।
- ◆ ব্যবসায়ে সাত—স্ফতি আছেই।
- ◆ জীবনে হাসি—কান্না পর্যায়ক্রমে আসে।
- ◆ সাগরে জোয়ার—ভাটা পানির হাস—বৃন্দি ঘটে।
- ◆ হালকা আর ভারি যন্ত্রগুলো ধোয়ামোছ্য কর।
- ◆ ‘কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?’
- ◆ এ জগৎ হরণ—পূরণের মেলা।
- ◆ খেলায় হার—জিত থাকবেই।
- ◆ পরাধীন হয়ে সুখভোগের চেয়ে স্বাধীন হয়ে দুঃখ ভোগ করাও ভালো।
- ◆ ছেলেটি বড়ই চঢ়ল, কিন্তু মেয়েটি কেমন ধীরস্থির।
- ◆ সবলের সদস্য অত্যাচার দুর্বল আর কতদিন সইবে?
- ◆ সাহস দিয়ে তয়কে জয় কর।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উভয় দেওয়া হলো। ঠিক উভয়টিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) ‘কার্যে বিরতি’ অর্থে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজ্য?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. হাত করা | গ. হাত গুটান |
| খ. হাত থাকা | ঘ. হাত আসা |

(২) ‘পছন্দ হওয়া’ অর্থে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ কোনটি?

- | | |
|------------|--------------|
| ক. শৌধরা | গ. ম্যাও ধরা |
| খ. মনে ধরা | ঘ. পথ ধরা |

(৩) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বেহায়া’?

- | | |
|------------------|-------------|
| ক. চিনির বলদ | গ. কান কাটা |
| খ. জিলাপির প্যাচ | ঘ. ঠোট কাটা |

(৪) ‘সর্বনাশ’ বোঝাতে কোন বাগ্ধারাটি প্রযোজ্ঞ?

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. ডরাডুবি | গ. পুকুর ছুরি |
| খ. বালির বাঁধ | ঘ. মগের মুকুক |

(৫) কোন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘সম্মান বাঁচানো’?

- | | |
|-------------|------------|
| ক. মুখ ছেটা | গ. মুখরা |
| খ. মুখ করা | ঘ. মুখ ধরা |

(৬) কেন বাগ্ধারাটির অর্থ ‘বিরাট আয়োজন?’

ক. কপাল ফেরা

গ. আধকপালে

খ. কড়ায় গড়ায়

ঘ. এলাহিকান্ড

(৭) ‘এসপার ওসপার’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. এদিক অথবা ওদিক

গ. এই পাড়ে অথবা ওই পাড়ে

খ. মীমাংসা

ঘ. এ রকম অথবা ওই রকম

(৮) ‘গোবর গণেশ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. গোবরের মতো আবর্জনা

গ. চালাক

খ. বোকা

ঘ. মূর্খ

(৯) ‘গোড়ায় গলদ’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. বেশি ভুল

গ. শুরুতে ভুল

খ. ভুল জিনিস

ঘ. অল্প ভুল

(১০) ‘গোল্লায় যাওয়া’ বাগ্ধারাটির অর্থ কী?

ক. নষ্ট হওয়া

গ. অসৎ কাজ করা

খ. খারাপ কাজে যাওয়া

ঘ. দোষের কাজ করা

২। বাংলা শব্দের ব্যবহারে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলতে কী বোঝায়?

৩। শব্দের আভিধানিক অর্থের সঙ্গে তার ব্যবহারিক অর্থের যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, তা উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

৪। বাগ্ধারা বা বাকরীতি বলতে কী বোঝা? ‘মুখ’ অথবা ‘হাত’ শব্দের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

৫। বিশেষস্থানীয় ও বিশেষস্থানীয় বাক্যাংশের প্রয়োগ দেখিয়ে চারটি করে বাক্য গঠন কর।

৬। নিম্নলিখিত রীতিসিদ্ধ বাক্যাংশগুলোর অর্থ পাশাপাশি লিখে দাও :

পাকা হাতের লেখা— | গায়ে বাতাস লাগা—

মাথা কাটা যাওয়া— | গা ঢেলে দেওয়া—

হাত গুটিয়ে বসা— | হাত দেওয়া—

হাতে পায়ে ধরা— | বুকে লাগা—

(৭) অর্থের পার্থক্য দেখাও

{ গা লাগা	{ নাম কাটা	{ ডাক দেওয়া
গায়ে লাগা	নামে কাটা	ডাকে দেওয়া

{ হাত আসা	{ মন করা	{ মাথা দেওয়া
হাতে আসা	মনে করা	মাথায় দেওয়া।

৮। ডানপাশে শব্দ দেওয়া আছে। তার ওপর ভিস্টি করে বাগ্ধারা যোগে বাঁ পাশের শূন্যস্থান পূরণ কর।

- (ক) লোকটার চোখের নেই। (লজ্জা)
- (খ) ভাইয়ের সঙ্গে সম্মতি। (ভীষণ গরমিল)
- (গ) এত শোকতাপের পরেও যে বেঁচে আছি তার কারণ আমার তো। (যা সহজে মরে না)
- (ঘ) লোককে বড় কাজের দায়িত্ব দিতে নেই। (অসাবধান)
- (ঙ) পরের টাকা হাতে পেলেই অনেক করে। (নষ্ট করা)
- (চ) এমন লোক কমই দেখা যায়। (নির্বিজ্ঞ)
- (ছ) তোমার কান্দকারখানা দেখে আমি তো বনে গেছি। (স্তুতি হওয়া)
- (জ) বাইরে ধর্মের কথা বলে বেড়ালেও লোকটা আসলে। (ভক্ত)
- (ঝ) ‘আমি তরা তরী করি�.....’ (সর্বনাশ)
- (ঝঝ) সমাজপতিরাই হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে। (ক্ষমতাশালী ব্যক্তি)
- (ট) কে যেন আমার কলমটার করেছে। (অপহরণ)

৯। উভয় সারির সামঞ্জস্য বিধান কর।

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (১) হাড় হাতাতে | (১) অযথা শ্রম |
| (২) ভূতের বেগার | (২) একসীয়ে |
| (৩) বালির বাঁধ | (৩) ছদ্মস্থায়ী |
| (৪) নেই আঁকড়া | (৪) অস্থায়ী বস্তু |
| (৫) তাসের ঘর | (৫) আশায় নৈরাশ্য |
| (৬) গুড়ে বালি | (৬) হতভাগ্য |

১০। নিম্নলিখিত বাগ্ধারাসমূহ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর।

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (১) অমাবস্যার চান | (১) ফেঁচো খুড়তে সাপ |
| (২) আকাশ কুসুম | (১০) গজলিকা প্রবাহ |
| (৩) আষাঢ়ে গঞ্জ | (১১) তাসের ঘর |
| (৪) গোড়ায় গলদ | (১২) নয় ছয় |
| (৫) টাঁদের হাট | (১৩) বালির বাঁধ |
| (৬) চিনির বলদ | (১৪) রাশতারি |
| (৭) ডুমুরের ফুল | (১৫) ঝুই কাতলা |
| (৮) কলুর বলদ | (১৬) হাতটান |

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাচ্য এবং বাচ্য পরিবর্তন

১. রবীন্দ্রনাথ ‘গীতাঞ্জলি’ লিখেছেন।
২. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ‘গীতাঞ্জলি’ লিখিত হয়েছে।
৩. আমার খোওয়া হলো না।

ওপরের প্রথম বাক্যে কর্তৃর, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের, তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে।

বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় ‘বাচ্য’।

বাচ্য প্রধানত তিনি প্রকার : (১) কর্তৃবাচ্য (২) কর্মবাচ্য ও (৩) ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য : যে বাক্যে কর্তৃর অর্থ-প্রাধান্য রাখিত হয় এবং ক্রিয়াপদ কর্তৃর অনুসারী হয়, তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন— ছাত্ররা অঙ্ক করছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সর্বদাই কর্তৃর অনুসারী হয়।

২. কর্তৃবাচ্যে কর্তৃয় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়া, যষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যথা— শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান। রোগী পথ্য সেবন করে।

কর্মবাচ্য : যে বাক্যে কর্মের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন—
শিকারি কর্তৃক ব্যাপ্তি নিহত হয়েছে।

১. কর্মবাচ্যে কর্মে প্রথমা, কর্তৃয় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদ কর্মের অনুসারী হয়। যথা— আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়। চোরটা ধরা পড়েছে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যথা— আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।

ভাববাচ্য : যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তৃয় যষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন—

(ক) আমার (কর্তৃয় যষ্ঠী) খোওয়া হলো না।	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)
(খ) আমাকে (কর্তৃয় দ্বিতীয়া) এখন যেতে হবে।	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)
(গ) তোমার দ্বারা (কর্তৃয় তৃতীয়া) এ কাজ হবে না।	(নাম পুরুষের ক্রিয়া)

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্ম দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন-

এ পথে চলা যায় না।

এবার ট্রেনে ওঠা যাক।

কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূল ক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সহযোগ ও বিভিন্ন অর্থে ভাববাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন- এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা চলে না। এ রাস্তা আমার চেনা নেই।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় তৃতীয়া (২) কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং (৩) ক্রিয়া কর্মের অনুসারী হয়।

জাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে সেই বাক্যের কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য

(ক) বিদানকে সকলেই আদর করে।

(খ) খোদাতায়ালা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।

(গ) মুবারক পুস্তক পাঠ করছে।

কর্মবাচ্য

(ক) বিদান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

(খ) বিশ্বজগৎ খোদাতায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।

(গ) মুবারক কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় যষ্টী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং (২) ক্রিয়া নাম পুরুষের হয়। যেমন-

কর্তৃবাচ্য

(ক) আমি যাব না।

(খ) তুমিই ঢাকা যাবে।

(গ) তোমরা কখন এলে?

ভাববাচ্য

(ক) আমার যাওয়া হবে না।

(খ) তোমাকেই ঢাকা যেতে হবে।

(গ) তোমাদের কখন আসা হলো?

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিম্নম : কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে-

(১) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয়া বা শুন্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন-

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) দস্যদল কর্তৃক গৃহটি সৃষ্টি হয়েছে।	(ক) দস্যদল গৃহটি সৃষ্টি করেছে।
(খ) হালাকু খী কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।	(খ) হালাকু খী বাগদাদ ধ্বস করেন।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

নিম্নম : ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করতে হলে-

(১) কর্তায় প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং (২) ক্রিয়া কর্তার অনুসারী হয়। যেমন-

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
(ক) তোমাকে ইটতে হবে।	(ক) তুমি ইটবে।
(খ) এবার একটি গান করা হোক।	(খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
(গ) তার যেন আসা হয়।	(গ) সে যেন আসে।

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয় হয়ে বাক্য গঠন করে, তাকে কর্মকর্তৃবাচ্যের বাক্য বলা হয়। যেমন-

কাজটা তালো দেখায় না।
ঁশি বাজে এ মধুর সঙ্গনে।
সুন্তি কাপড় অনেক দিন টেকে।

অনুশীলনী

১। ঠিক উন্নতিতে টিক (✓) টিহ দাও।

(১) কর্মবাচ্যে কর্তার কোন বিভক্তি হয়?

ক. প্রথমা	গ. দ্বিতীয়া
-----------	--------------

খ. তৃতীয়া	ঘ. ষষ্ঠী
------------	----------

(২) ভাববাচ্যের কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?

ক. ষষ্ঠী	গ. প্রথমা
----------	-----------

খ. দ্বিতীয়া	ঘ. ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া
--------------	-----------------------

- (৩) কর্তৃবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?
 ক. দ্বিতীয়া গ. শূন্য
 খ. ষষ্ঠী ঘ. দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী বা শূন্য
- (৪) কর্মবাচ্যে কর্মে কোন বিভক্তি হয়?
 ক. প্রথমা গ. তৃতীয়া
 খ. দ্বিতীয়া ঘ. কখনো প্রথমা, কখনো দ্বিতীয়া
- (৫) দোষী ছাত্রটিকে জরিমানা করা হয়েছে। – এখানে ‘ছাত্রটিকে’ কোন কারকে কোন বিভক্তি?
 ক. কর্তায় দ্বিতীয়া গ. করণে দ্বিতীয়া
 খ. কর্মে দ্বিতীয়া ঘ. অধিকরণে দ্বিতীয়া
- (৬) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কী হলে কর্মবাচ্য হয় না?
 ক. সমাপিকা গ. সকর্মক
 খ. অসমাপিকা ঘ. অকর্মক
- (৭) ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তরিত করলে কর্তায় কোন বিভক্তি হয়?
 ক. দ্বিতীয়া গ. তৃতীয়া
 খ. প্রথমা ঘ. ষষ্ঠী
- (৮) ‘করিম পুস্তক পাঠ করছে।’ বাক্যটিকে কর্মবাচ্যে পরিণত করলে হবে–
 ক. পুস্তক করিম কর্তৃক পাঠ হচ্ছে। গ. পুস্তক কর্তৃক করিম পাঠিত হচ্ছে।
 খ. করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠিত হচ্ছে। ঘ. করিম কর্তৃক পুস্তক পাঠ করছে।
- (৯) তুমি কখন এলে? – বাক্যটিকে ভাববাচ্যে পরিণত করলে কোনটি হবে?
 ক. তোমার দ্বারা কখন আসা হলো? গ. তুমি দ্বারা কখন আসা হলো?
 খ. তুমি কখন আসা হলো? ঘ. তোমার কখন আসা হলো?
- ২। ‘বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকেই বাচ্য বলা হয়।’ – এ উক্তিটির সমর্থনে বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিগুলি উদাহরণ দাও।
- ৩। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের মৌলিক পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেখ।
- ৪। বাক্যে উদাহরণ দাও।
 ক) ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হতে পারে।
 খ) কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।
 গ) কর্তৃবাচ্যের তৎসম মিশ্রক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে ক্রিয়াজাত বিশেষণ (Participle) – রূপে ব্যবহৃত হয়।

৫। কর্মকর্তৃবাচ্য বলতে কী বোঝ? উদাহরণযোগে বিশদ আলোচনা কর।

৬। বাচ্যান্তর কর।

(ক) কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য

ক) আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।

খ) মহাকবি ফেরদৌসী শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।

গ) শিকারি বাঘ মেরেছে।

ঘ) আমি বইটি পড়েছি।

(খ) কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

ক) কাফেলা দস্যুদল দ্বারা আক্রান্ত হলো।

খ) স্থপতি ইসা বুমির তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।

গ) বেদব্যাস কর্তৃক মহাভারত রচিত হয়েছিল।

ঘ) পিতা কর্তৃক পুত্র বিভাগিত হয়েছে।

৭। কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে এবং ভাববাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তন কর।

ক) আমি একাই যাব।

খ) এবার একথানা গান হোক।

গ) আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।

৮। বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুন্ধ করে লেখ।

ক) পিতা কর্তৃক আমি একটি কলম দান করা হইয়াছি।

খ) আজি নিষ্পুন রাতে কে বাঁশি বাজে।

গ) তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।

ঘ) ছাত্রগণ তোমাদিগ কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শুনা হউক।

ঙ) শসন করা তাকেই সাজে, সোহাগ করে যে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উক্তি পরিবর্তন

কোনো কথাকের বাক কর্মের নামই উক্তি। উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি।

যে বাকেয় বক্তার কথা অবিকল উন্মুক্ত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। যথা – তিনি বললেন, “বইটা আমার দরকার।”

যে বাকেয় বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে বৃপ্তান্তরিতভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। যথা :

তিনি বললেন যে বইটা তাঁর দরকার।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

১. প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উন্মুক্ত চিহ্নের (“ ”) অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উন্মুক্ত চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উন্মুক্ত চিহ্ন স্থানে ‘যে’ এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাকেয়ের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : খোকা বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।”

পরোক্ষ উক্তি : খোকা বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

২. বাকেয়ের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, “আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।”

পরোক্ষ উক্তি : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তির কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন-

প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “কাল তোমাদের ছুটি থাকবে।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাকেয়ের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন সংযোগ করতে হয়।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন	এখানে	সেখানে
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন	এখন	তখন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন		
আজ	সেদিন	ওখানে	ঐখানে		

ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : ছেলে লিখেছিল, “শহরে খুব গরম পড়েছে।”

পরোক্ষ উক্তি : ছেলে লিখেছিল যে, শহরে খুব গরম পড়েছিল।

অথবা, ছেলে লিখেছিল শহরে খুব গরম পড়েছে।

৩) প্রত্যক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : করিম বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।

৪) প্রত্যক্ষ উক্তি : মনসুর বলল, “আমি ঢাকা যাব।”

পরোক্ষ উক্তি : মনসুর বলল যে, সে ঢাকা যাবে।

প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্ত্বের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন-

৫) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার।”

পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।

৬) প্রত্যক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন, “চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।”

পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চূম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৭। প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খন্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-

প্রশ্নবোধক বাক্য

১) প্রত্যক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন, “তোমরা কি ছুটি চাও?”

পরোক্ষ উক্তি : আমরা ছুটি চাই কি না, শিক্ষক তা জিজ্ঞাসা করলেন।

২) প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা বললেন, “কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?”

পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে, বাবা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য

৩) প্রত্যক্ষ উক্তি : হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।”

পরোক্ষ উক্তি : হামিদ তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।

৪) প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, “দয়া করে ভেতরে আসুন।”

পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন।

আবেগসূচক বাক্য

৫) প্রত্যক্ষ উক্তি : লোকটি বলল, “বাঃ! পাখিটি তো চমৎকার।”

পরোক্ষ উক্তি : লোকটি আনন্দের সাথে বলল যে, পাখিটি চমৎকার।

৬) প্রত্যক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দৃঢ়খের সাথে বলল, “শীতে আমরা কঠই না কষ্ট পাচ্ছি।”

পরোক্ষ উক্তি : ভিখারিনী দৃঢ়খের সাথে বলল যে, তারা শীতে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি পশ্চের চারটি উভয় দেওয়া হয়েছে। সর্বোন্মতিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(১) খোকা তোমাকে বলল, “আমার বাবা বাড়ি নেই।” এর পরোক্ষ উক্তি হবে-

- ক. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি নেই।
- খ. খোকা তোমাকে বলল যে, তার বাবা বাড়ি ছিলেন না।
- গ. খোকা তোমাকে বলল যে তোমার বাবা বাড়ি নেই।
- ঘ. খোকা তোমাকে বলল যে, আমার বাবা বাড়ি ছিলেন না।

(২) রহমান আমাকে বলল, “আমি এক্সুণি আসছি।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রহমান আমাকে বলল যে আমি এক্সুণি যাচ্ছি।
- খ. রহমান আমাকে বলল যে সে এক্সুণি আসছে।
- গ. রহমান আমাকে বলল যে, তুমি এক্সুণি যাচ্ছ।
- ঘ. রহমান আমাকে বলল যে সে এক্সুণি যাচ্ছ।

(৩) হামিদ বলল, “তোমরা আগামীকাল এসো।” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. হামিদ তাদের পরদিন আসতে বলল।
- খ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন আগামীকাল আসে।
- গ. হামিদ বলল যে তোমরা পরদিন এসো।
- ঘ. হামিদ তাদের বলল যে তারা যেন পরদিন আসে।

(৪) করিম তোমাকে বলল, “আমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।” – পরোক্ষ উক্তিতে কী হবে?

- ক. করিম তোমাকে বলল যে সে গতকাল ঢাকা গিয়েছিল।
- খ. করিম তোমাকে বলল যে সে আজ ঢাকা গিয়েছিল।
- গ. করিম তোমাকে বলল যে, তুমি গতকাল ঢাকা গিয়েছিলে।
- ঘ. করিম তোমাকে বলল যে সে আগেরদিন ঢাকা গিয়েছিল।

(৫) রেবা আমাকে বলল, “ভাই, তুমি কবে এখানে আসবে?” – পরোক্ষ উক্তিতে হবে-

- ক. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে এখানে আসব।
- খ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে জানতে চাইল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- গ. রেবা আমাকে ভাই সম্বোধন করে বলল যে আমি কবে সেখানে যাব।
- ঘ. রেবা আমাকে বলল, তুমি কবে সেখানে আসবে।

- ২। উক্তি বলতে কী বোঝা? উক্তি কয় প্রকার ও কী কী?
- ৩। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তিত করতে হলে নিম্নলিখিত বিশেষ স্থলে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা পাশাপাশি লিখে শুন্যস্থান পূরণ কর।
- (ক) প্রত্যক্ষ উক্তির..... উচ্চে যায় এবং প্রথম উদ্ধৃত চিহ্ন স্থানে সংযোজক অব্যয়টি বসাতে হয়।
 - (খ) প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম পদ পরোক্ষ উক্তিতে বাকের..... রক্ষা করে পরিবর্তন করতে হয়।
 - (গ) প্রত্যক্ষ উক্তির স্থানবাটক ও কালবাটক শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে..... হয়।
 - (ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের হলে পরোক্ষ উক্তিতে তা.....
..... কালের কিন্তু..... কালেরও হতে পারে।
- ৪। সংক্ষেপে জবাব দাও : প্রত্যক্ষ উক্তির কোন কোন স্থলে পরোক্ষ উক্তিতে কোনো পরিবর্তন হয় না?
- ৫। নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ উক্তিগুলো পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন কর।
- (ক) সে বলল, “তা কি হয়? তোমাকে এখন যেতে দিছে কে? দয়া করে আমার সঙ্গে চল।”
 - (খ) সেনাপতি বললেন, “মহারাজ আমরা থাকতে আপনি কেন যুদ্ধে যাবেন? আজই শত্রুদের বন্দি করে আনব। অনুগ্রহ করে আপনি আমদের যেতে অনুমতি দিন।”
 - (গ) শিক্ষক বললেন, “পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।”
 - (ঘ) মা বললেন, “সুমন, দেরি না করে চলে এসো। পড়তে বসো। মন দিয়ে পড়ো। কাল তোমার পরীক্ষা মনে নেই?”
 - (ঙ) নিম্নুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, “পাখি মরিয়াছে।” ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, কী কথা শুনি।” ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটির শিক্ষা পূর্ণা হইয়াছে।” রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর জাহায়?” ভাগিনা বলিল, “আরে রাম।” “আর কি উড়ে?” “না।” “দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?” “না।” রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আন দেখি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যতি বা ছেদচিহ্নের শিখন কৌশল

বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হৰ্ষ, বিশাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যেসব সাহকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা ছেদচিহ্ন।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো:

যতিচিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি-কাল-পরিমাণ
কমা	,	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন।
সেমিফোলন	:	১ বলার দ্বিগুণ সময়।
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)		এক সেকেন্ড।
প্রশ্নবোধক চিহ্ন	?	ঐ
বিষয় ও সম্বোধন চিহ্ন	!	ঐ
ফোলন	:	ঐ
ড্যাস	-	ঐ
কোলন ড্যাস	:-	ঐ
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই।
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	,	থামার প্রয়োজন নেই।
উন্ধরণ চিহ্ন	" "	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে।
ব্র্যাকেট (বস্তনী-চিহ্ন)	()	থামার প্রয়োজন নেই।
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই।
	[]	থামার প্রয়োজন নেই।

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}

- ক) বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বত্ব বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন— সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।

- খ) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন— সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুক্ষ।
- গ) সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন— রশিদ, এসিকে এসো।
- ঘ) জটিল বাক্যের অঙ্গীকৃত প্রত্যেক খণ্ডবাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন— কাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পূর্বপরিচিত।
- ঙ) উচ্চরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ডবাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন— সাহেব বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
- চ) মাসের তারিখ লিখতে বাই ও মাসের পর ‘কমা’ বসবে। যেমন— ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯৯ সন।
- ছ) বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন— ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০০০।
- জ) নামের পরে ডিপ্রিস্টক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমন— ডেটর মুহাম্মদ এনামুল হক, এম.এ. পি-এইচ.ডি।

২. সেমিকোলন (;)

কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমিকোলন বসে। যথা— সৎসারের মায়াজালে আবন্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুষ্টেদ্য?

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ()

বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যথা— শীতকালে এ দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

বাক্যে কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন— তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

৫. বিষয় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

হৃদয়বেগে প্রকাশ করতে হলে এ সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন—

আহা! কী চমৎকার দৃশ্য।

জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধন স্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার করা হয়।

৬. কোলন (:)

একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সভায় সাব্যস্ত হলো : একমাস পরে নতুন সভাপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৭। ড্যাস চিহ্ন (-)

যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তোমরা দরিদ্রের উপকার কর— এতে তোমাদের সম্মান যাবে না—বাড়বে।

উদাহরণ বা দৃষ্টিলক্ষ প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যেমন—পদ পাঁচ প্রকারঃ—

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেনের ব্যবহার হয়। যেমন— এ আমাদের শ্রদ্ধা—অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি—উপহার।

৯. ইলেক (') বা লোগ চিহ্ন

কোনো বর্ণ বিশেষের লোগ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য (') লোগচিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—

মাথার ‘পরে জ্বলছে রবি’ (‘পরে=ওপরে)

পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’রা? (কা’রা=কাহারা)

১০. উল্দ্বৱ্বণ চিহ্ন (‘ ’)

কন্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যথা—শিক্ষক বললেন, “গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকাপ্ল হয়েছে।”

১১. ব্র্যাকেট বা বক্ষনী চিহ্ন (), { }, ||

এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বক্ষনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন— ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিয়মিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

(ক) ধাতু বোঝাতে (/) চিহ্ন : $\sqrt{\text{স্থা}} = \text{স্থা ধাতু}$ ।

(খ) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন: জাঁদরেল < জেনারেল।

(গ) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন: গজ্জা > গাঙ।

(ঘ) সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্ন : নর ও নারী = নরনারী।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি উত্তরের মধ্যে সর্বোন্নমিটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

(i) বাক্যে কমা (,) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ক. $\frac{1}{2}$ সেকেন্ড | গ. এক সেকেন্ড |
| খ. $\frac{3}{8}$ সেকেন্ড | ঘ. এক বলতে যে সময় লাগে |

(ii) বাক্যে সেমিকোলন (;) থাকলে কতক্ষণ থামতে হয়?

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ক. ১ বলতে যে সময় লাগে | গ. ১ সেকেন্ড |
| খ. $1\frac{1}{2}$ বলার দ্বিগুণ সময় | ঘ. $2\frac{1}{2}$ সেকেন্ড |

(iii) বাক্যের শেষে দাঁড়ির পর কতক্ষণ থেমে পরের বাক্য পড়তে হয়?

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ক. ১ সেকেন্ড | গ. ২ সেকেন্ড |
| খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড | ঘ. সেকেন্ড |

(iv) হাইফেন (-)-এরপর কতক্ষণ থামতে হয়?

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ক. ১ সেকেন্ড | গ. ২ সেকেন্ড |
| খ. $1\frac{1}{2}$ সেকেন্ড | ঘ. থামার প্রয়োজন নেই। |

(v) সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

- | | |
|-------------|--------------------|
| ক. সেমিকোলন | গ. দাঁড়ি |
| খ. কমা | ঘ. কোনো চিহ্নই নয় |

(vi) ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

- | | |
|------|------|
| ক. < | গ. ✓ |
| খ. - | ঘ. > |

(vii) পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

- | | |
|------|------|
| ক. > | গ. ✓ |
| খ. < | ঘ. : |

(viii) পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে কোন চিহ্ন বসে?

- | | |
|------|------|
| ক. ✓ | গ. > |
| খ. : | ঘ. < |

- ২। যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন বলতে কী বোঝ ? বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের আবশ্যিকতা কী ? সংক্ষেপে আলোচনা কর ।
- ৩। আমরা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে কী কী ছেদচিহ্নের ব্যবহার করে থাকি ? প্রত্যেকটি চিহ্নের নাম, রূপ এবং তজ্জনিত বিভাগের কাল-পরিমাণ নির্দেশ কর ।
- ৪। স্বরচিত বাক্যে ব্যবহার দেখাও :
- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (ক) বিদ্য চিহ্ন ও সম্বোধন চিহ্ন | (গ) ড্যাস চিহ্ন ও হাইফেন চিহ্ন |
| (খ) উল্টরণ চিহ্ন ও লোপ চিহ্ন | (ঘ) ধাতুর চিহ্ন ও সমানবাচক চিহ্ন । |
- ৫। সংক্ষেপে জবাব দাও :
- (ক) কোলন ও কোলন-ড্যাস চিহ্ন ব্যবহারের পার্থক্য কী ?
- (খ) সম্দেহ বা ব্যঙ্গ বোঝাতে তুমি কোন প্রকারের যতিচিহ্নের ব্যবহার করবে ?
- (গ) কোন কোন ক্ষেত্রে কমা চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় ?
- ৬। নিম্নলিখিত অনুজ্ঞেদটিতে যতিচিহ্ন বসিয়ে আবার লেখ ।
- প্রভাত হলো সোহরাব ময়দানে এসে হাঁকলেন ইরানশাহ কায়কাউস আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি ইরান শাহ
চুপ কেন উন্মত তবে কি ইরানী ফৌজে এমন পাহলোয়ান নেই যে আমার সঙ্গে অন্ত পরীক্ষা করতে পারে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

স্বরভঙ্গি ও বাগ্নভঙ্গি

১. অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগে বাংলাদেশে বিজয় সিংহ নামে খুব সাহসী এক রাজপুত্র ছিলেন।
২. প্রকৃতি কী সুন্দর সাজেই না সেজেছে!
৩. তাজ্জব ব্যাপার!
৪. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
৫. ‘আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।’
৬. ‘দীর্ঘজীবী হও।’
৭. ‘সবারে বাস রে ভালো।’
৮. উঠে কস।

ওপরের প্রথম বাক্যটি বিবৃতিমূলক; দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য দুটি বিঅয়সূচক; চতুর্থ বাক্যটি প্রশ্নসূচক; পঞ্চম বাক্যটি প্রার্থনামূলক; ষষ্ঠ বাক্যটি আশীর্বাদবোধক; সপ্তম বাক্যটি অনুরোধমূলক; অষ্টম বাক্যটি আদেশসূচক।

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আবেগ-উচ্ছ্঵াস, অনুরোধ-প্রার্থনা, আদেশ-মিনতি, শাসন-তিরস্কার কর্তৃব্যের নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ জোর দিয়ে কথা বলা, কর্তৃব্যের ওঠা-নামা, কাঁপন, টেনে টেনে শব্দ উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা বাক্যের বিশেষ বিশেষ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন ভঙ্গিতে কর্তৃধ্বনি উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, তা নানা প্রকার ভাব ও অর্থ সৃষ্টি করে। এই ধ্বনি-তরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গকে স্বরভঙ্গি বলে। এই স্বরভঙ্গিই বাগ্নভঙ্গির ভিত্তি।

স্বরভঙ্গির দ্বারা যে শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি ও উচ্চারিত হয়, তাকে সিদ্ধিত আকারে এবং উচ্চারিত অবস্থায় বাগ্নভঙ্গি বলা যেতে পারে।

বাক্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত হতে পারে।

১. বিবৃতিমূলক বাক্য (Assertive sentence) : সাধারণভাবে হ্যাঁ বা না বাচক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকার হতে পারে : হ্যাঁবাচক বাক্য (Affirmative sentence) এবং না বাচক বাক্য (Negative sentence)।

উদাহরণ-হ্যাঁ বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে। আমি বলতে চাই।

না বাচক বাক্য : সে ঢাকা যাবে না। আমি বলতে চাই না।

২. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative sentence) : এ ধরনের বাক্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যথা :

কোথায় যাচ্ছ? কী পড়ছ? কেন এসেছ? যাবে নাকি?

৩. বিঅয়সূচক বাক্য (Exclamatory sentence) : যে বাক্যে আশ্র্যজনক কিছু বোঝায় তাকে বিঅয়সূচক বাক্য বলে। যথা :

তাজব ব্যাপার! সমুদ্রের সে কী ভীষণ গর্জন, ঢেউগুলো পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু— আমি তো ভয়ে মরি! হুরারে, আমরা জিতেছি!

৪. ইচ্ছসূচক বাক্য (Optative sentence) : এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়। যথা :

তোমার মজল হোক। ঈশ্বর তোমাকে জয়ি করুন। পরীক্ষায় সফল হও। দীর্ঘজীবী হও।

৫. আদেশ বাচক বাক্য (Imperative sentence) : এ ধরনের বাক্যে আদেশ করা হয়। যথা :

শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিকক্ষে এলে উঠে দাঁড়াবে। চুপটি করে বস। উঠে দাঁড়াও। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।

স্বরভঙ্গি তথা বাগভঙ্গির সাহায্যে ক্রোধ, আদর, আনন্দ, দৃঢ়ত্ব, বিরক্তি, বিঅয়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। যথা :

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------------|
| ১. সাধারণ বিবৃতিতে | : | সে আজ যাবে। |
| ২. জিজ্ঞাসায় | : | সে আজ যাবে? |
| ৩. বিঅয় প্রকাশে | : | সে আজ যাবে! |
| ৪. ক্রোধ প্রকাশে | : | আমি তোমাকে দেখে নেব। |
| ৫. আদর বোঝাতে | : | বড় শুকিয়ে গেছিস রে। |
| ৬. আনন্দ প্রকাশে | : | বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে! |
| ৭. দৃঢ়ত্ব প্রকাশে | : | আহা, গাছ থেকে পড়ে পা ভেঙ্গেছে! |
| ৮. বিরক্তি প্রকাশে | : | আঃ, ভালো লাগছে না, এখন এখান থেকে যাও তো। |
| ৯. ভীতি প্রদর্শনে | : | যাবি কি না বল? |
| ১০. লজ্জা প্রকাশে | : | ছিঃ ছিঃ, তার সঙ্গে পারলে না। |
| ১১. ধিকার দিতে | : | ছিঃ, তোমার এই কাজ! |
| ১২. ঘৃণা প্রকাশে | : | তুমি এত নীচ! |
| ১৩. অনুরোধ প্রকাশে | : | কাজটি করে দাও না ভাই। |
| ১৪. প্রার্থনা | : | ঈশ্বর তোমার মজল করুন। |

ছেদ ও বিরাতিসূচক চিহ্নগুলো বাগভঙ্গির লিখিত আকার প্রকাশে সাহায্য করে। দাঁড়ি, কমা, প্রশ্নবোধক ও বিঅয়সূচক চিহ্ন বাক্যের ভাব ও অর্থবোধের জন্য উপকারক।

অনুশীলনী

১। চারটি উভয়ের সর্বোত্তমটিতে টিক (✓) টিক দাও :

(১) কোনটি আদেশসূচক বাক্য ?

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ক. তোমাকে বসতে বলেছি। | গ. তুমি কি বসবে ? |
| খ. এখানে এস। | ঘ. বসলে খুশি হব |

(২) “সে কি যাবে” – এটি কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. আদেশসূচক | গ. বিবৃতিমূলক |
| খ. বিক্রয়সূচক | ঘ. প্রশ্নসূচক |

(৩) “আমি তোমাকে মেহ করি।” এটি কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. প্রশ্নসূচক | গ. বিক্রয়সূচক |
| খ. বিবৃতিমূলক | ঘ. আদেশমূলক ? |

(৪) কোনটি প্রশ্নসূচক বাক্য ?

- | | |
|----------------------|------------------|
| ক. কী খেলাই খেললে | গ. আমি খেলব না |
| খ. তুমি অবশ্যই খেলবে | ঘ. তুমি কি খেলেছ |

(৫) “তোমাকে আজই যেতে হবে।” এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|------------------|---------------|
| ক. বিক্রয়সূচক | গ. আদেশসূচক |
| খ. প্রার্থনামূলক | ঘ. বিবৃতিমূলক |

(৬) “কী সাধাতিক ব্যাপার।” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. বিবৃতিমূলক | গ. প্রশ্নমূলক |
| খ. বিক্রয়সূচক | ঘ. অনুরোধবাচক |

(৭) “কোথায় যাচ্ছ?” – এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. বিক্রয়সূচক | গ. প্রশ্নমূলক |
| খ. বিবৃতিমূলক | ঘ. অনুরোধমূলক |

(৮) “এখানে এসো।”– এটা কী ধরনের বাক্য ?

- | | |
|-----------------|---------------|
| ক. অনুরোধজ্ঞাপক | গ. বিবৃতিমূলক |
| খ. আদেশমূলক | ঘ. বিশয়সূচক |

(৯) বাগ্ভঙ্গি কী ?

- | | |
|---------------|-------------------------|
| ক. শব্দভঙ্গি | গ. নানা ভঙ্গিতে উচ্চারণ |
| খ. বাক্যভঙ্গি | ঘ. মুখভঙ্গি |

(১০) কোনটি বিশয়সূচক বাক্য ?

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ক. কী করবে ? | গ. সকলের মজাল হোক। |
| খ. জয়ী হও। | ঘ. কী সুন্দর ফুল। |
| ২। স্বরভঙ্গি কাকে বলে ? | |
| ৩। বাগ্ভঙ্গি বলতে কী বোঝ ? | |
| ৪। বাগ্ভঙ্গি অনুযায়ী কয় প্রকার বাক্য গঠন সম্ভব ? | |
| ৫। বাগ্ভঙ্গির সাহায্যে কী কী ধরনের বাক্য গঠন করা যায় ? | |
| ৬। আদেশমূলক বাক্য কাকে বলে ? উদাহরণ দাও। | |
| ৭। বিস্ময়সূচক বাক্য বলতে কী বোঝ ? এ ধরনের দুটি বাক্যের উদাহরণ দাও। | |
| ৮। বিবৃতিমূলক বাক্য কাকে বলে ? এ ধরনের বাক্য কয় প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ। | |
| ৯। প্রার্থনামূলক বাক্য কাকে বলে উদাহরণসহ লেখ। | |
| ১০। ক্রোধ প্রকাশক এবং আনন্দবাচক বাক্যের উদাহরণ দাও। | |

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাক্যে পদ সংস্থাপনার ক্রম (Syntax)

বাক্যের অঙ্গভুক্ত পদগুলো উপযুক্ত স্থানে বসানোই পদ সংস্থাপনার ক্রম। একে কেউ কেউ পদক্রম বলে থাকেন।

নিয়মাবলি

১. সাধারণ বাক্যের প্রথমে সম্প্রসারকসহ উদ্দেশ্য (বা কর্তা) এবং বাক্যের শেষে সম্প্রসারকসহ বিধেয় (বা ক্রিয়াপদ) বসবে। যেমন –

মনোযোগী	ছাত্রাই	রীতিমত	পড়াশোনা করে।
(সম্প্রসারক)	কর্তৃপদ	(সম্প্রসারক)	(ক্রিয়াপদ)

কিন্তু বাক্যকে শক্তিশালী করার জন্য এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। যেমন –

লোকটি ছিল অত্যন্ত চতুর।

২. সম্বল্প পদ বিশেষের পূর্বে বসবে। যেমন – “ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।”

অর্থ সজ্ঞাতি রচ্চার জন্য বা ছন্দের অনুরোধে সম্বল্প পদ পরেও বসতে পারে। যেমন –

“হে আদি জননী সিল্পু, বসুর্ধুরা সন্তান তোমার।”

৩. কারক-বিভক্তিযুক্ত পদ বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বিশেষণের আগে বসে। যেমন –

লোকটি ব্যবহারে খুবই ভদ্র। রাজশাহীর আম খেতে চমৎকার।

৪. বিধেয় বিশেষণ সর্বদাই বিশেষের পরে বসে। যথা : লোকটি যে জানী তাতে সন্দেহ নেই।

৫. বাক্যের প্রথমে কর্তা, পরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়াপদ বসে। যেমন – আমি ‘শাহনামা’ পড়েছি।

(ক) কবিতায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – ‘লহ নমস্কার, সুন্দর আমার।’

(খ) বাক্যে জোর দিতে গেলেও নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন – জানি, তোমার মুরোদ কতটুকু।

৬. বহুপদময় বিশেষণ অবশ্যই বিশেষের পূর্বে বসে। যেমন – তোমার দাঁত বের-করা হাসি দেখলে সবারই পিণ্ঠ জ্বলে যায়।

বাক্যে ‘না’ বা ‘নে’ অব্যয়ের ব্যবহার

(ক) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা – আমি যাব না। আমি তাত খাই নে, ঝুঁটি খাই।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। যথা – না চাইতে দানের কোনো মর্যাদা নেই।

- (গ) বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে বিশেষণের পূর্বে বসে। যেমন – না ভালো, না মন্দ।
 (ঘ) ‘যদি’ দিয়ে বাক্য আরম্ভ করলে ‘না’ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে বসে। মেয়ন : তুমি যদি আজ না যাও, তা হলে খুবই ক্ষতি হবে।

‘না’ (নঞ্চ ব্যৱহাৰ) অন্য অর্থে

- ক. বিকল্পার্থে : জিজ্ঞাসাবাচক বাক্যে – তুমি বাড়ি যাবে, না আমি যাব?
 খ. অনুরোধ বা আদেশ অর্থে (নির্বৰ্থকভাবে বাক্যের শেষে) : একটা গান গাও না ভাই।

অনুশীলনী

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া হলো। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

(i) বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|----------------------|
| ক. প্রথমে | গ. উদ্দেশ্যের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. অব্যয় পদের পর |

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষণের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষ্যের পর |

(iii) বাক্যে বিশেষ-বিশেষণ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|--------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষণের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষ্যের পর |

(iv) বাক্যে বচ্ছপনময় বিশেষণ কোথায় বসে?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ক. প্রথমে | গ. সর্বনামের পূর্বে |
| খ. বিশেষ্যের পূর্বে | ঘ. শেষে |

(v) ‘না’ শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে?

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ক. সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে | গ. অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে |
| খ. সমাপিকা ক্রিয়ার পরে | ঘ. বিশেষণের পরে |

(vi) বাকেয় কারক-বিভক্তিমুক্ত পদ কোথায় বসে?

- | | |
|-----------|-------------------|
| ক. প্রথমে | গ. বিশেষের পূর্বে |
| খ. শেষে | ঘ. বিশেষণের আগে |

(vii) সম্মত পদ বাকেয় কোথায় বসে?

- | | |
|--------------------|------------------|
| ক. বিশেষের পূর্বে | গ. বিশেষের পরে |
| খ. বিশেষণের পূর্বে | ঘ. বিশেষণের পরে। |

২। বাকেয় পদ সংস্থাপনের ক্রম বলতে কী বোঝা? এর উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেখ।

৩। বাকেয় পদ সংস্থাপনের ক্রম বিষয়ে পাঁচটি নিয়ম আলোচনা কর।

৪। ‘না’ অব্যয়টি যদি নওঁ ব্যৱৃত্ত অন্য অর্থে বাকেয় প্রযুক্ত হয়, তবে সেটি কী কী অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে?
উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। বাকেয় উদাহরণ দাও :

- (ক) বাকেয় জোর দিতে গেলে ক্রিয়াপদ বাকেয়ের প্রথমেও ব্যবহৃত হতে পারে।
 খ) স্থান ও কালের অর্থ বিশদভাবে বোঝানোই অধিকরণ কারকের উদ্দেশ্য, কাজেই বাকেয় অধিকরণ
কারকের অবস্থানে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

সমাঙ্গ

২০১৬
শিক্ষাবর্ষ
৯-১০ ব্যাক্রমণ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা এহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কারও মনে কষ্ট দিও না



২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

www.swapno.in

সুবিধা :